পৃথিবী থেকে চাঁদে

সমরজিৎ কর

মৌসুমী প্রকাশনী
১৫/২এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশকাল ঃ
অগ্রহায়ণ-১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
শ্রীদেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১৫/২এ কলেজ রো
কলিকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
শ্রীযুগলকিশোর রায়
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ
শ্রীপ্রণব শূর

দাম ঃ বারো টাকা

'পৃথিবী থেকে চাঁদে' মূলতঃ চন্দ্র অভিযানের পর্যায়ক্রমিক এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর রূপকথা উপকথার চাঁদ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মনে জল্পনার অন্ত ছিল না। উত্তরকালে পদার্থবিদ্যার বহু যুগান্তকারী আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পুরনো ধারাটাই যেন পালটে যেতে লাগল। সৃষ্টি হল ভৌত-জ্যোতির্বিদ্যা। বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রের সঙ্গে পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী চাঁদও এবার রীতিমত কৌতূহল সৃষ্টি করল সকলের মনে। আর সে কৌতূহল যত বাড়তে লাগল, এই উপগ্রহটিও যেন বিজ্ঞানীদের কাছে আরও রহস্যময় বলে মনে হতে লাগল।

এরই মাঝে নতুন দিগন্ত তুলে ধরলেন সোভিয়েত বিজ্ঞানী জিওলকভসকি তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'একসপ্লোরেশন অব স্পেস বাই রকেট ডিভাইসেস'-এ। ১৯২০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'এ মেথড অব রিচিং একসট্রিম অলটিচুডস'। রচয়িতা মার্কিন দেশের রকেট বিজ্ঞানের জনক ডঃ গডার্ড। সুরু হল আধুনিক রকেট বিজ্ঞানের আদি পর্ব। আর এই রকেটের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চাঁদকে নতুন করে জানার কৌতূহলও গেল বেড়ে।

বইটির পরিকল্পনায় দুটি জিনিসের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে সবচাইতে বেশি। এক, বিগত শতাব্দী থেকে সুরু করে মানুষের চাঁদে পদার্পণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চাঁদ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারনা। দুই, ১৯৫৮র পর ১৯৬৯ পর্যন্ত, অর্থাৎ আধুনিক মহাকাশ যাত্রার সুরু থেকে পরবর্তী এগার বৎসর সময়ে কিভাবে ধাপে ধাপে মানুষ চাঁদে অবতরণ করার পথকে সুগম করে তুলল তার ঘটনাবহুল বর্ণনা। আমার মনে হয়েছে মানুষের গল্প কথার ইতিহাসেও নভচরদের শ্বাসরুদ্ধকারী অ্যাডভেঞ্চারের নজির আর একটিও আছে কিনা সন্দেহ।

প্রসঙ্গক্রমে রকেট বিজ্ঞানের ক্রমোবিকাশের কথা আমি আলোচনা করেছি। সেই সঙ্গে মহাকাশ বিজ্ঞানের উত্তরফল স্বরূপ আমরা সাধারণ মানুষ কি পেলাম তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এ ব্যাপারটিকে আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান বলে মনে হয়েছে এই কারণে যে, এর সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থ আজ জড়িয়ে রয়েছে।

প্রখ্যাত রকেট-বিজ্ঞানী ডঃ ওয়ারনহার ফন ব্রাউন বইটির মুখবন্ধ লিখে দিয়ে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় V_2 রকেটকে ক্ষেপনাস্ত্ররূপে ব্যবহার করার বিরোধিতা করায় একদা তাঁকে হিটলারের রোষের সামনে পড়তে হয়েছিল। বর্তমানে মার্কিন দেশের আধুনিক মহাকাশ গবেষণার তিনি অন্যতম রূপকার।

আরও দুটি নাম আমাকে উল্লেখ করতেই হয়: সাহিত্যিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ এবং শ্রীরমাপদ চৌধুরী। বিষয়বস্তু নির্বাচনে এঁরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞতা এঁদের কাছে আমি প্রকাশ করতে পারি না। কারণ এঁরা দুজনেই আমাকে স্নেহ করেন।

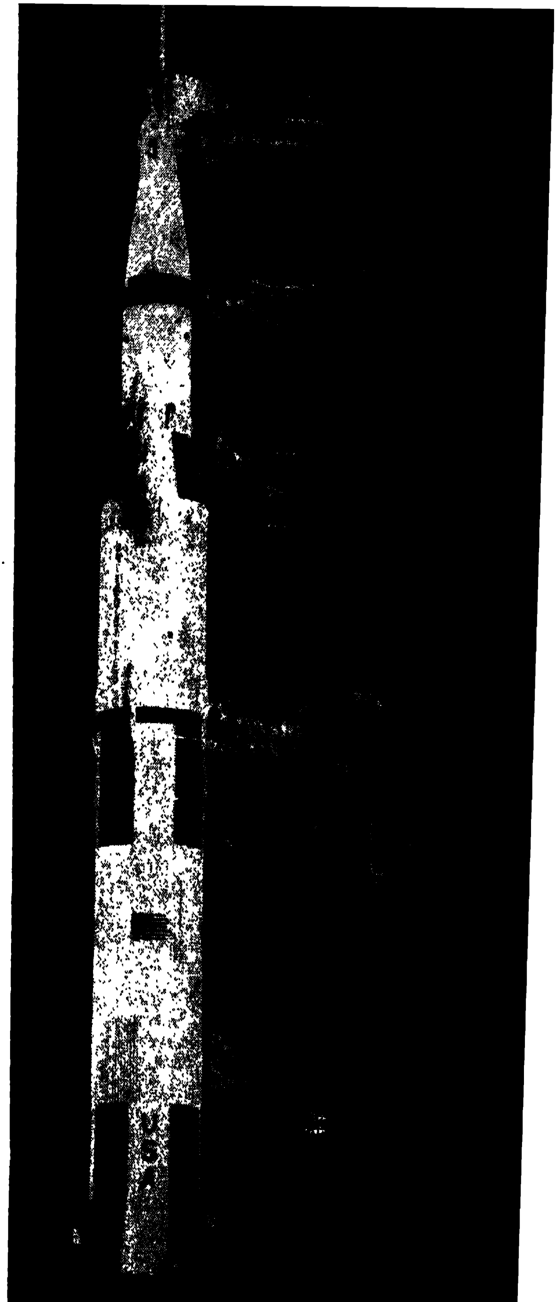
এই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলকাতার মার্কিন তথ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, সোভিয়েত দেশের তথ্য সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, 'নাসা' এবং বৃটিশ কাউনসিলের পাঠাগারের কর্তৃপক্ষদের। এঁদের সাহায্য না পেলে অনেক খুঁটিনাটি তথ্যই হয়ত যোগান সম্ভব হত না।

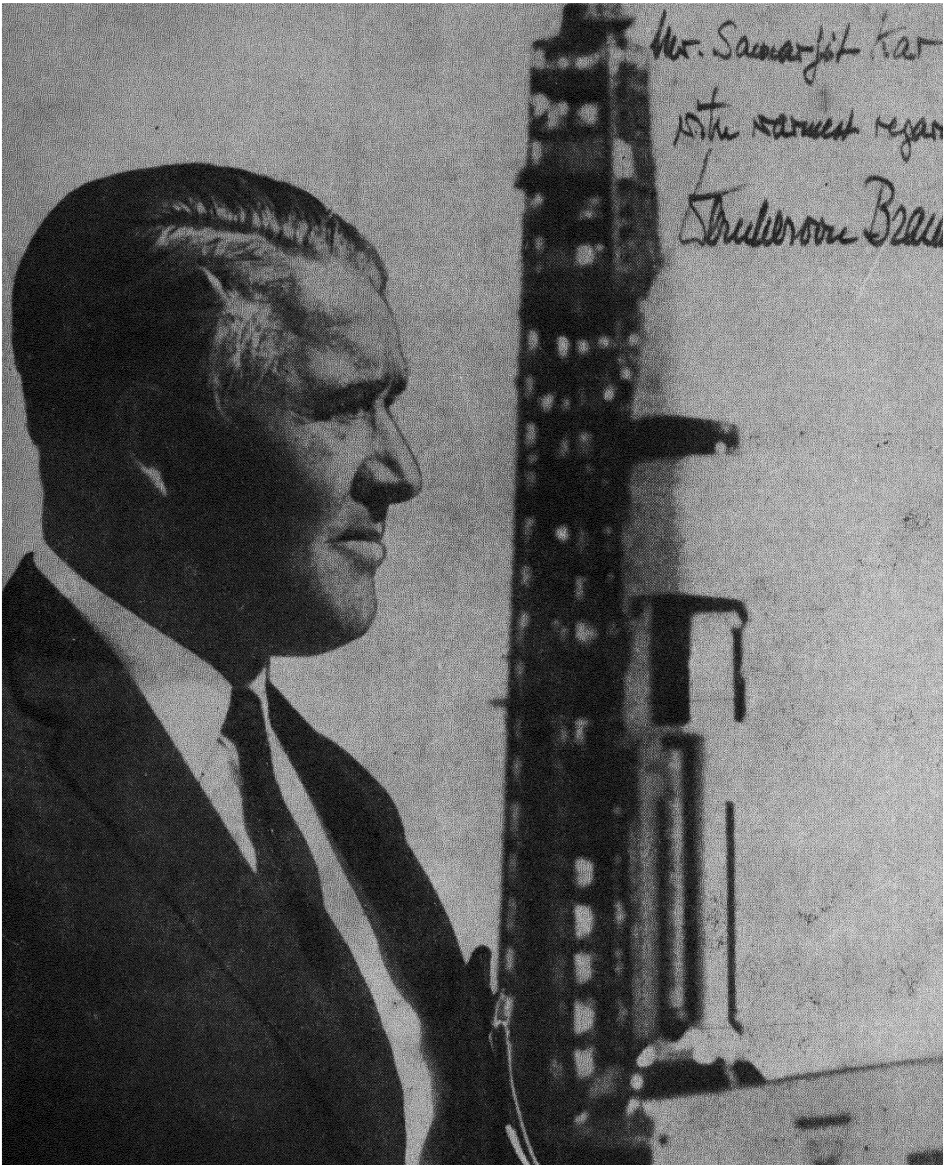
বইটির বিষয়বস্তু সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার চিত্তগ্রাহী হলে তবেই আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

জানকুনি
নভেম্বর ১৪, ১৯৬০

সমরজিৎ কর

রাতের অন্ধকারে অ্যাপলো-১১





বিশ্বখ্যাত V-2র রকেট বিজ্ঞানী ডঃ ওয়ারনহার ফন ব্রাউন

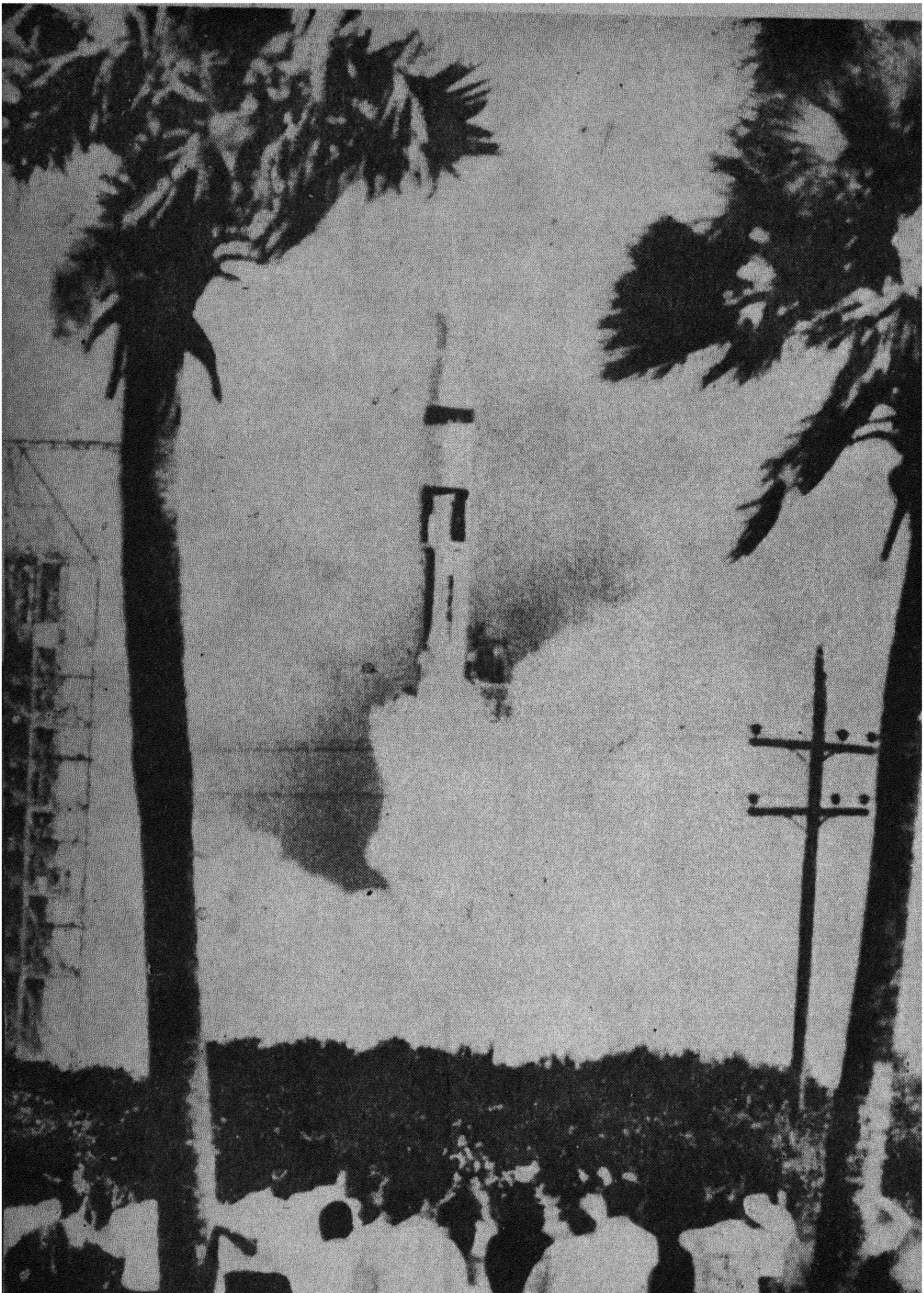
Dr. Wernher von Braun, Director
George C. Marshall Space Flight Center
National Aeronautics and Space Administration
Marshall Space Flight Center, Alabama 35812
April 1969

**Foreword to a book on space exploration by Mr. Samarjit Kar to be published in the Bengali language
Calcutta, India**

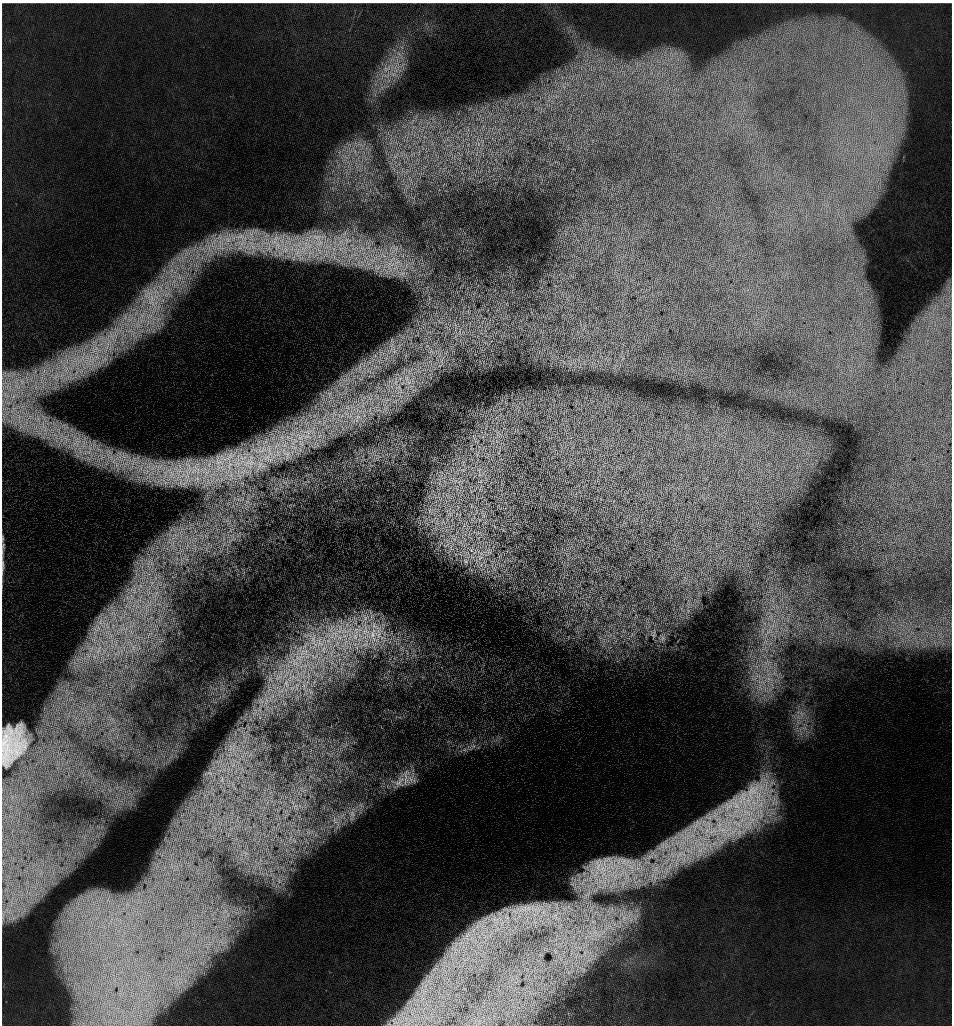
It is a great pleasure and satisfaction for me to know that men in all parts of our globe are sharing a growing interest in the challenges of space exploration and the utilization of space technology. Unmanned satellites and space probes and the pioneering flights of astronauts into earth and lunar orbit have opened a vast new frontier. They manifest man's endeavors to explore the world in which he lives and his continuous quest to expand his activities and horizons. They open and establish new ways and means of global communications, weather forecasting and earth resources management. They provide a unique look at our earth, this grand oasis in space, and a new understanding of the brotherhood and common destiny of all men.

I sincerely hope people everywhere will open their minds and hearts to realize and appreciate the great promises and obligations of this new era, the age of space.

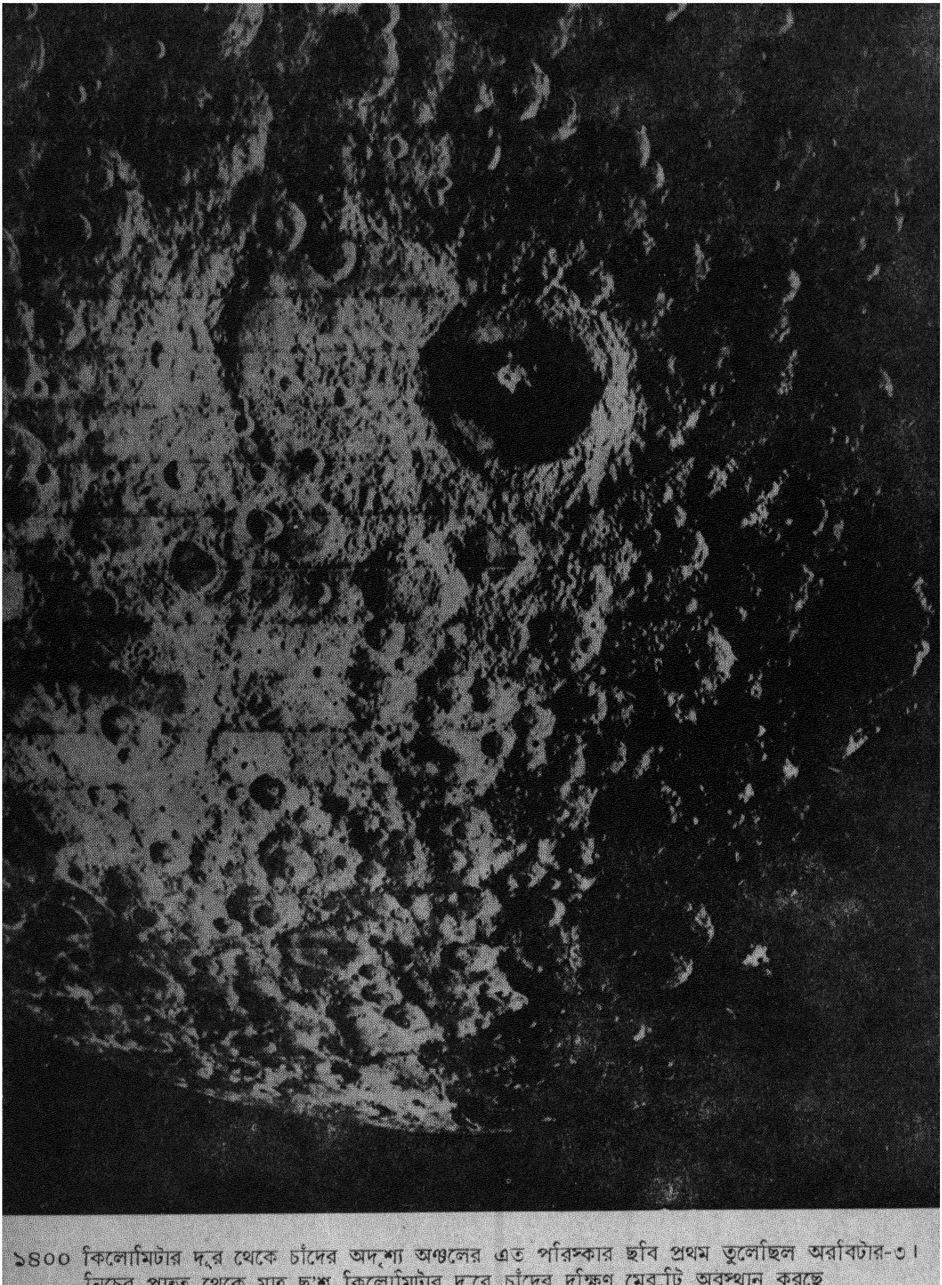
Wernher von Braun



অ্যাপলো-৭এর যাত্রা সুরু হল



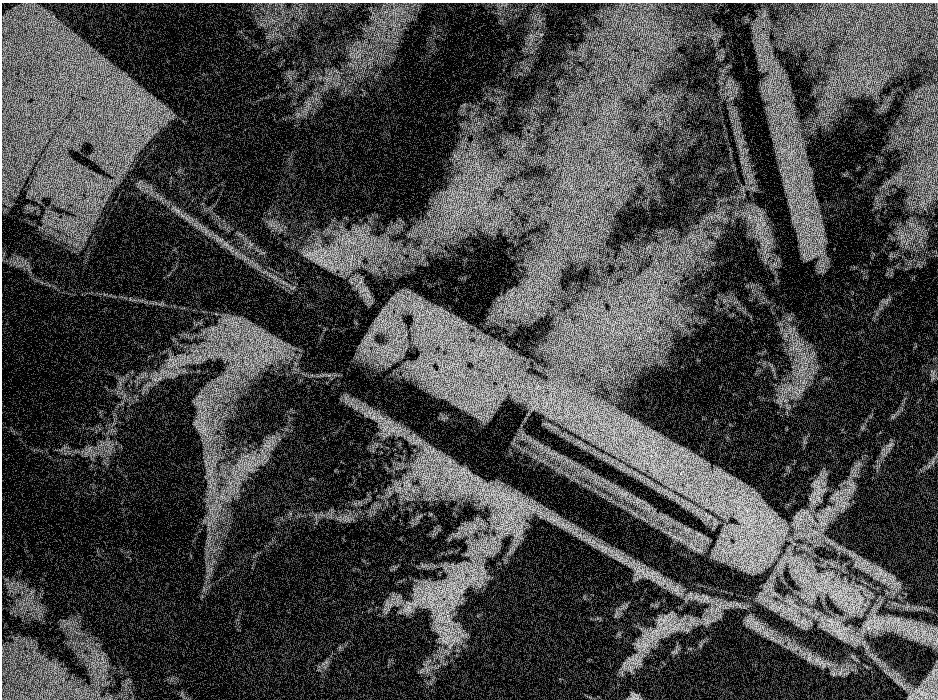
মহাকাশযান থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে অসীম শূন্যতার মধ্যে বিচরণ করে প্রথম ইতিহাস সৃষ্টি করলেন লিওনভ



১৪০০ কিলোমিটার দূর থেকে চাঁদের অদৃশ্য অঞ্চলের এত পরিস্কার ছবি প্রথম তুলেছিল অরবিটার-৩। নিচের প্রান্ত থেকে মাত্র ছ'শ কিলোমিটার দূরে চাঁদের দক্ষিণ মেরুটি অবস্থান করছে

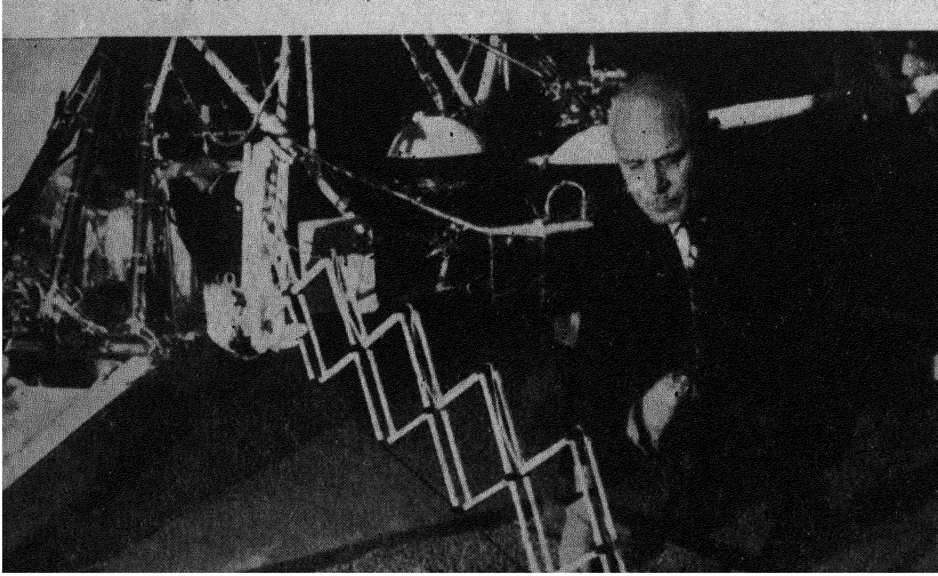


বাঁ দিক থেকে প্রথম সারি : কমোরভ, গ্যাগারিন, ভ্যলেন্তিনা, নিকোলায়েভ, কনসতানতিন, পাভেল
পেছনের সারি : লিওনভ, টিটভ, ভালেরি বোরিস, পাভেল পপোভিচ



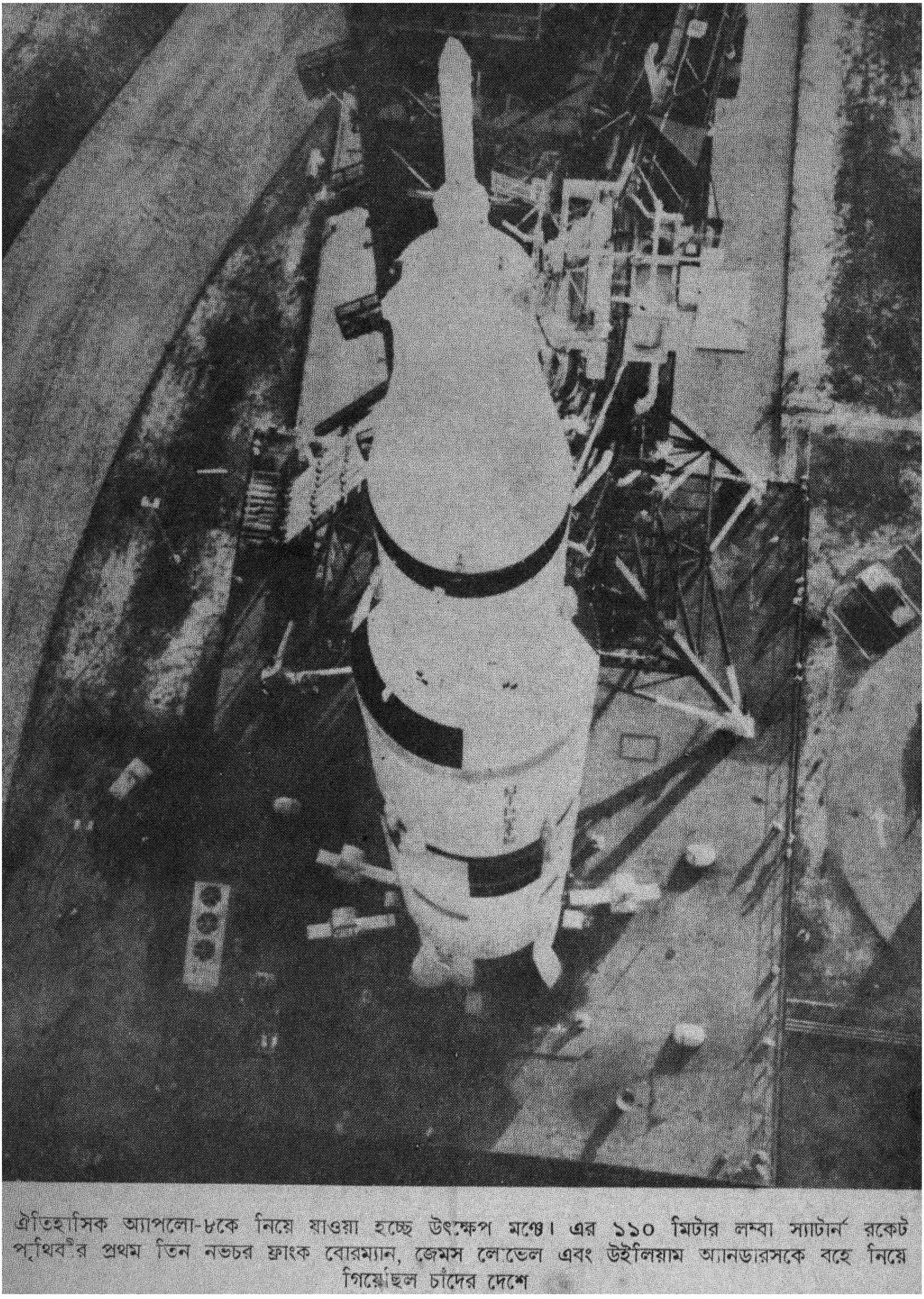
উপরে : জেমিনি-১০ দ্বিতীয় অ্যাজেনাটির সঙ্গে জোড় বেঁধেছে, অদূরে প্রথম অ্যাজেনা

নিচে : গবেষণাগারে সারভেয়ার-৩এর মাটি খোঁড়ার কাজ পরীক্ষা করা হচ্ছে

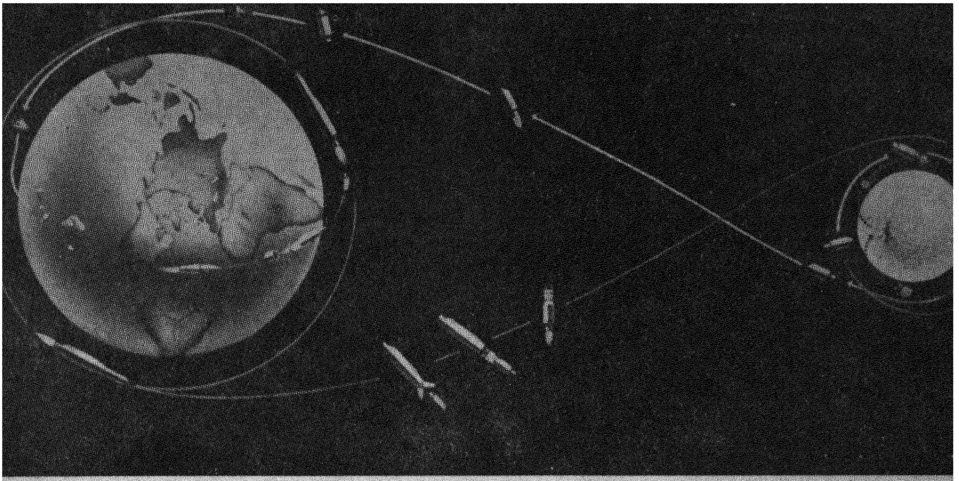




ডিসেম্বর ২৪, ১৯৬৮ চাঁদের ৭৪০ কিলোমিটার দূর থেকে অর্ধ আলোকিত পৃথিবীর এই ছবিটি প্র
তোলেন অ্যাপলো-৮এর নভচররা

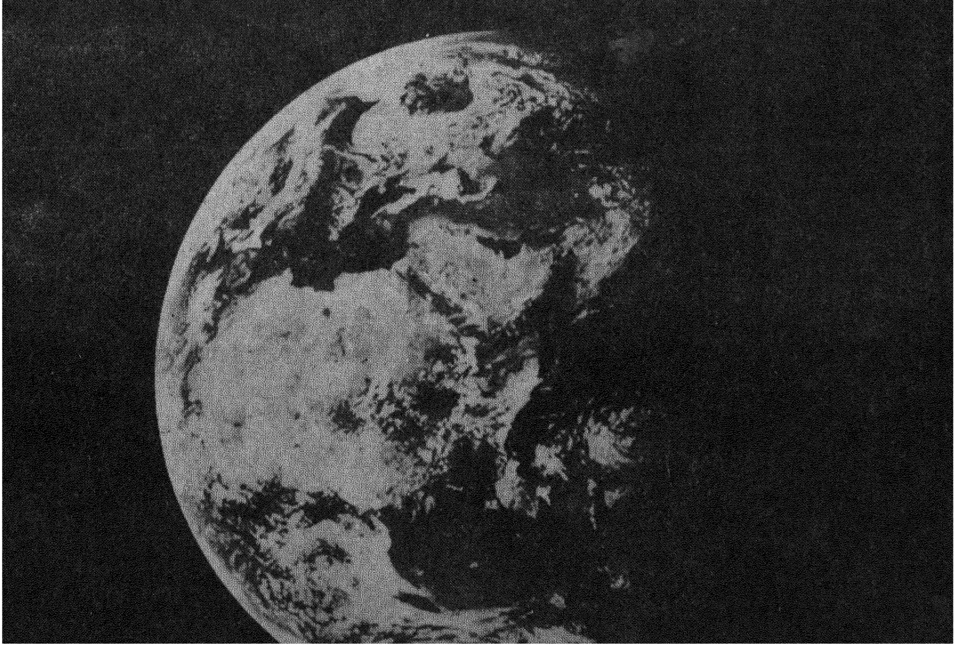


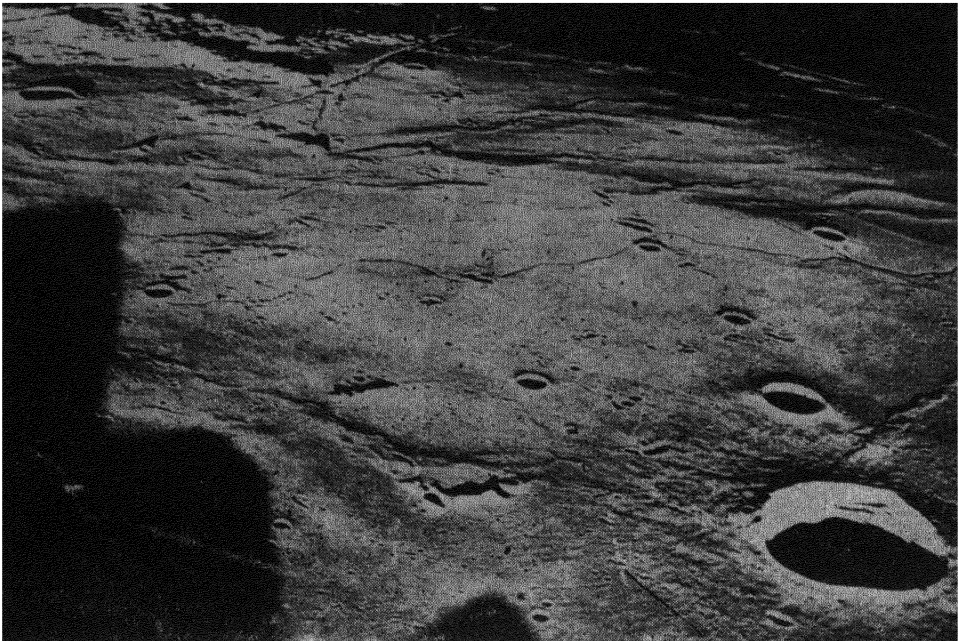
ঐতিহাসিক অ্যাপলো-৮কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে উৎক্ষেপ মঞ্চে। এর ১১০ মিটার লম্বা স্যাটার্ন রকেট পৃথিবীর প্রথম তিন নভচর ফ্রাংক বোরম্যান, জেমস লেভেল এবং উইলিয়াম অ্যানডারসকে বহে নিয়ে গিয়েছিল চাঁদের দেশে



উপরে : অ্যাপলো-১১র পরিক্রমণ পথ

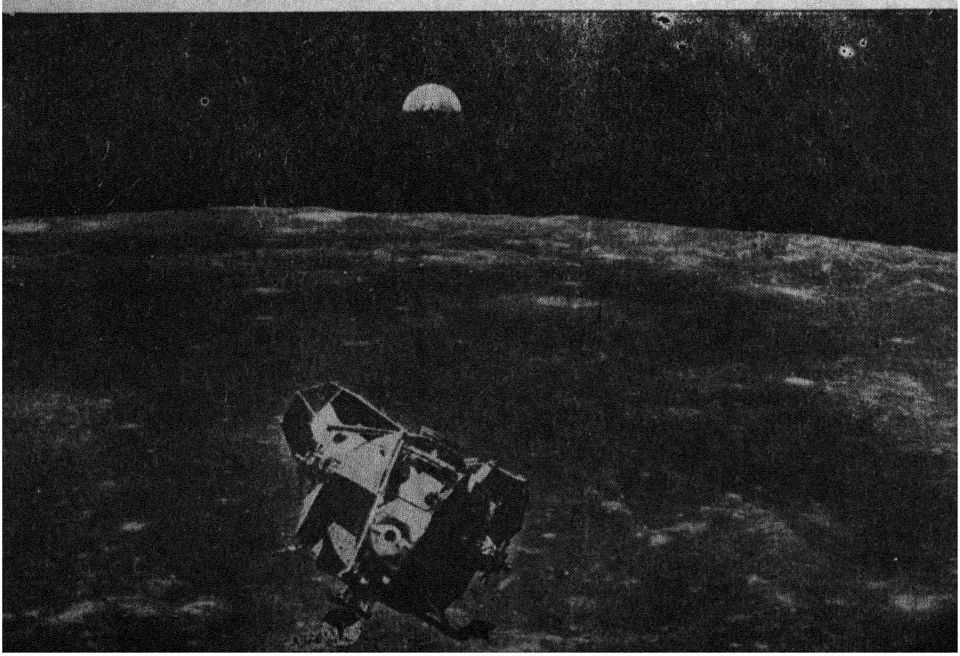
নিচে : অ্যাপলো-১১র নভচররা পৃথিবীর এই ছবিটি তোলেন ১৭০০০০ কিলোমিটার দূর থেকে





উপরে : কলামবিয়া থেকে ঈগলের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তোলা চাঁদের পিঠের ছবি

নিচে : চাঁদ থেকে ফিরে আসছে চাঁদের ভেলা, দূরে আকাশে অর্ধ আলোকিত পৃথিবী। কলামবিয়া থেকে ছবিটি তোলেন কলিনস



প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়ে গেল একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়ে। জুলাই ১৪, ১৯৬০। যাত্রার তখন প্রায় আটাশ ঘণ্টা বাকি। হিউসটন থেকে খবর এল, দ্বিধার কারণ নেই। সব ঠিকঠাক চলছে। ওঁরা তিনজন বেশ ফুর্তিতেই রয়েছেন। মেজাজ শরিফ। দৈহিক অবস্থা অদ্ভুত রকমের প্রাঞ্জল।

হিউসটনের প্রতিটি বিজ্ঞানী সচকিত। হাজার হাজার কুশলীর মুখের ওপর উৎকণ্ঠা এবং আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। শত শতাব্দীর মানব ইতিহাসের এক দারুন সন্ধিমুহূর্তের সাফল্য আজ তাঁদের ওপর নির্ভর করছে। হিউসটন ম্যানস স্পেশ ফ্লাইট সেণ্টার তখন পৃথিবীর প্রতিটি সংবাদ পত্রের শিরোনাম। মার্কিন মানুষের মহাকাশ বিচরণের চাবিকাঠি পড়ে রয়েছে এখানে। সেখানে আজকের শ্রেষ্ঠ সংবাদঃ মানুষের চন্দ্রযাত্রা। নায়ক, নিল আরমস্ট্রং, মাইকেল কলিনস, এডুইন অলডরিন। আর মাত্র আটাশ ঘণ্টা! তারপরই পৃথিবীর এই তিন মানব শিশু জ্যোতির্জগতের এক ভূমণ্ডল থেকে আর এক ভূমণ্ডলের উদ্দেশে যাত্রা করবেন। রচিত হবে মানব ইতিহাসের দুঃসাহসিকতম অভিযানের কথা। হিউসটনের বিজ্ঞানীরা হাজারো যন্ত্রপাতির সম্মুখে যেন মূক হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁদের লক্ষ্য টেলিভিশন পর্দার ওপর, কমপিউটার বা যন্ত্রগণকের মাইলের পর মাইল লম্বা কাগজের ফালির ওপর লেখা সংকেত বার্তার ওপর, আর

সারি সারি সাজান লাল, নীল, হলুদ রঙের আলোর নিশানার ওপর। হিউসটন আজ সব কিছুর হৃৎপিণ্ড।

ওদিকে কেপ কেনেডি, ফ্লোরিডা। জাতীয় সড়ক ধরে পিঁপড়ের সারির মত ছুটে আসছে হাজার হাজার মোটর গাড়ী। লক্ষ মানুষের কৌতুহল শুধু একই দিকে ধেয়ে চলেছে। তার নাম কেপ কেনেডি। ফ্লোরিডার পুলিশ থেকে সুরু করে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকদের সেই অগণিত মানুষের সমুদ্রকে নিয়ম মাফিক রুখতে গিয়ে হিমসিম খাবার মত অবস্থা। ইতিমধ্যে শেষবারের মত সাংবাদিক বৈঠক হয়ে গেল। এঁদের মধ্যে ছিলেন বেতার ভাষ্যকার, টেলিভিশন সংস্থার প্রতিনিধি, দেশী এবং বিদেশী মিলিয়ে কয়েক'শ সাংবাদিক। বৈঠক বসল মূল কেন্দ্র থেকে প্রায় পনের কিলোমিটার দূরে। উদ্দেশ্য পুরোপুরি নিরাপত্তা ব্যবস্থাটি বজায় রাখা।

মার্কিন দেশের বৈদেশিক প্রচার সংস্থা ভয়েস অব আমেরিকা তখন দিবারাত্র একটানা সংবাদ পরিবেশন সুরু করে দিয়েছে। আতলান্তিকের পূব পাড়ে গোটা ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ল্যাটিন, আমেরিকা, এশিয়ার কোন কোন অংশে সরাসরি টেলিভিশন বার্তা পাঠানর সমস্ত ব্যবস্থা শেষ। বি. বি. সি এবং আরও কয়েকটি সংস্থা আর মাত্র আটাশ ঘণ্টা পর যা ঘটতে চলেছে তার ধারাবিবরণী আঞ্চলিক ভাষায় প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন। কারণ, কৌতুহল আজ শুধু একা মার্কিন দেশের নয়। সারা পৃথিবীর সুদূর গ্রামাঞ্চলেরও প্রতিটি মানুষের কাছে আজ মস্ত প্রশ্ন: সত্যি সত্যিই কি মানুষ চাঁদে যেতে পারবে? সত্যি সত্যিই কি সে পারবে পৃথিবী থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরের সেই দ্বিতীয় পৃথিবীটিকে স্পর্শ করতে?

আর মাত্র আটাশ ঘণ্টা। মাটির পৃথিবীও যেন রুদ্ধশ্বাসে স্তব্ধ! কেপ কেনেডির বুকে নিস্তব্ধ উৎক্ষেপক মঞ্চ কমপ্লেকস ৩৯-এ।

তার ওপর দাঁড়িয়ে মানব ইতিহাসের এক বিরাট জিজ্ঞাসা অ্যাপলো-১১! মূল মহাকাশ যান লম্বায় বিরাশি ফুট। তার নিচে দু'শ একাশি ফুট লম্বা ত্রি স্তর রকেট স্যাটার্ন-৫। অর্থাৎ পুরো অ্যাপলো-১১ লম্বায় শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে তিন'শ তেষট্টি ফুট। ওজন চৌষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার দুশ আশি পাউণ্ড। প্রথম স্তরে পাঁচটি এফ-১ ইঞ্জিন, দ্বিতীয় স্তরে পাঁচটি জে-২ ইঞ্জিন, তৃতীয় স্তরে মাত্র একটি জে-২ ইঞ্জিন।

অবশেষে হিউসটন থেকে নির্দেশ এল : ফাইনাল কাউণ্ট ডাউন প্লিজ! দিস ইজ ম্যানস স্পেস ফ্লাইট সেণ্টার, হিউসটন।

মুহূর্তে কেঁপে উঠল কেপ কেনেডির নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ঘড়ির কাঁটা। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের মত কেঁপে কেঁপে সেই কাঁটা এগিয়ে যেতে লাগল। আর সেই সঙ্গে সুরু হয়ে গেল প্রস্তুতির শেষ পর্ব।

সময় সকাল ছ'টা বেজে দু মিনিট ইস্টারন ডে লাইট সেভিং টাইম। জুলাই ১৫। মহাকাশ যান এবং চাঁদে অবতরণ করার ভেলাটিকে শেষবারের মত পরীক্ষা করে নেওয়ার কাজ সুরু হল। সেই সঙ্গে চাঁদের ভেলায় হিলিয়াম পুরে নেওয়ার কাজও। পরদিন অর্থাৎ ১৬ই জুলাই, ঠিক রাত একটার মধ্যে রকেটের নিরাপত্তা এবং আনুষঙ্গিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে প্রথম স্তর রকেটটির মধ্যে পুরে নেওয়া হয়েছে দু লক্ষ বারো হাজার আট শ ছেচল্লিশ গ্যালন কেরোসিন তেল। যাত্রার ঠিক আটঘণ্টা পনের মিনিট আগে সুরু হল তরল অকসিজেন এবং তরল হাইড্রোজেন পূর্ণ করার কাজ। এই কাজটির প্রতি মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝকি। সামান্যতম ক্রুটী দারুন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক নিমেষে সমস্ত কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে। প্রায় চার ঘণ্টা সাঁয়ত্রিশ মিনিট লাগল সব চাইতে বিপজ্জনক এই কাজটি শেষ করতে। আর সেই সময়ে প্রথম স্তরের মধ্যে বোঝাই করা হল তিন লক্ষ ছেচল্লিশ

হাজার তিন শ বাহাত্তর গ্যালন তরল অকসিজেন। দ্বিতীয় স্তরে পঁচাশি হাজার ন শ তিয়াত্তর গ্যালন তরল অকসিজেন এবং দু লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশ পঞ্চান্ন গ্যালন তরল হাইড্রোজেন। তৃতীয় স্তরে কুড়ি হাজার এক শ সাত গ্যালন তরল অকসিজেন এবং সাতাত্তর হাজার ছ শ আশি গ্যালন তরল হাইড্রোজেন।

ভোর চারটে বেজে পনের মিনিটের সময় নভচরদের কক্ষে সংকেত বার্তা বেজে উঠল। আরমস্ট্রং, অলডরিন এবং কলিনসকে জানান হল: প্রস্তুত হয়ে নিন।

অদ্ভুত সংযতভাব এবং অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস তখন তাঁদের সারা মুখে। মৃদু হেসে যেন সামান্য ব্যাপার এমন একটি ভাব নিয়েই তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন ডাক্তারের সম্মুখে। হাল্কা রসিকতার সঙ্গে ডাক্তার শেষবারের মত খুঁটিয়ে দেখে নিলেন তাঁদের সমস্ত খুঁটিনাটি দৈহিক অবস্থা। ভালই লাগছিল নভচরদের, বিশেষ করে গতকাল প্রেসিডেন্ট নিকসন তাঁদের যে শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন তার ভেতর যেন তাঁরা অনুভব করেছেন শুধু আমেরিকা নয়, সে শুভেচ্ছা সারা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের, নিকসন তারবার্তায় বলেছেন: মানবিকতার যা কিছু শুভ, তোমাদের কর্মযজ্ঞে এবং পৃথিবীতে প্রত্যাগমন মুহূর্তে তা পাথেয় হয়ে রইবে, এটাই কামনা করি।

সত্যিই সমস্ত কিছুর মধ্যেই এক অদ্ভুত অনুভূতি বিরাজ করছে। সে অনুভূতি লৌকিক, স্থূল বস্তুগত বা সাধারণ যান্ত্রিক সাফল্যের নয়। এ যেন এক ঐশ্বারিক বিধান। একটা অধ্যাত্মিক চেতনা।

প্রাতরাশ শেষ হল পাঁচটা বত্রিশ-এ। তারপরই তাঁরা মহাকাশ পোশাক পরে নিলেন এবং ছ'টা পঁচিশ মিনিটে বিশেষ একটি গাড়ীতে যাত্রা করলেন কমপ্লেকস ৩৯-এর উদ্দেশে। আর যাত্রার প্রায় দুই ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পূর্বে এসে উপস্থিত হলেন অ্যাপলো-১১-র কক্ষে।

সাতটা বেজে বিয়াল্লিশ মিনিট। এবার সরাসরি নভচরদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন হিউসটনের মিসন কনট্রোল সেনটার। নির্দেশ এল, 'যন্ত্রপাতিগুলি ভাল করে দেখে নিন।' অধিনায়ক আরমস্ট্রং, অলডরিন এবং কলিনস সেই মত কাজ স্থরু করলেন। রকেটের জ্বালানি ঠিক মত প্রবাহিত হয়ে মোটর চালনা যাতে অব্যাহত রাখতে পারে, কোন রকম তুর্ঘটনার ইঙ্গিত পেলে তার সংকেত মুহূর্তের মধ্যে ধরে ফেলার ব্যাপার, আরও অনেক কিছুই তাঁরা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে নিলেন। ইতিমধ্যে মহাকাশ যানের শক্তি সরবরাহর ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করা হয়েছে। তিনজন নভচর তখন নিজ নিজ আসনে বসে। জীবনের সমস্ত অনুভূতি যেন স্তব্ধ! এ পৃথিবীর সমস্ত স্মৃতি তখন বিস্মৃতি। যেন এ মাটির সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কই নেই। কোন দিন ছিল না। দৃষ্টি পাথরের মত জমাট হয়ে রয়েছে কমাণ্ড সিগন্যালের ওপর। কানের ওপর চেপে বসা হেডফোন শুধু একমাত্র স্নায়ুতন্ত্র যা তিনশ তেষট্টি ফুট নিচের পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে চলেছে।

ওদিকে কমপ্লেকস ৩৯-এর কয়েক কিলোমিটার দূরে লক্ষ মানুষের জমাট। তাদের কারুর হাতে দূরবীক্ষণ, কারুর বা টেলি-ক্যামেরা। এন. বি. সি, এ. বি. সি, প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতী-সম্পন্ন টেলিভিসন সংস্থার ক্যামেরা চারদিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ান রয়েছে। নানাভাবে ছবি তুলে চলেছেন তাঁরা। সেই সঙ্গে ভাষ্য-কারদের কণ্ঠে বিরতিহীন ধারাবিবরণী। সেই ধারাবিবরণী মুহূর্তের মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে সারা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেকসিকো, ল্যাটিন, আমেরিকা, ইউরোপ এবং হাজারো অঞ্চলে। কোটি কোটি মানুষের ভীড় টেলিভিসনের সামনে। নীরব নিস্তব্ধ এঁরা। এঁরা প্রত্যক্ষ করছেন তুঃসাহসিক এক মুহূর্তের অজ্ঞাত যাত্রা।

এঁদের কৌতূহলের আরও একটি কারণ ছিল। মাত্র কয়েক

ঘণ্টা আগে হঠাৎ যেন একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন ভল্গা নদীর মানুষ। দীর্ঘকাল নীরবতা পালন করে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত তাঁরা আকাশে তুললেন লুনা-১৫। খবর এল, লুনা-১৫ মহাকাশ যানটি বেশ সাবলীল গতিতে চাঁদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারটা নিয়ে যতটা না মাথা ঘামালেন তার চাইতে হাজারো গুণ বেশি কৌতুহল দেখা গেল জনসাধারণের মধ্যে। অমার্কিনীদের কারুর কারুর কাছে মনে হল, রাশিয়ানরা তাহলে ছাড়ল না দেখছি। নির্ঘাৎ এ একটি চাল। ঘাপটি মেরে বসে থাকার পর একটি মোক্ষম মার লাগাতে চলেছে তারা।

কিছুই অসম্ভব নয়। ১৯৫৭তে যখন তাঁরা স্পুতনিক-১ কে আকাশে পাঠান তখনও প্রায় অতর্কিত ভাবেই সমস্ত কিছু করা হয়েছিল। গ্যাগারিনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। আসলে যুগান্তকারী পরিকল্পনাগুলি কখনই তাঁরা আগে থেকে ফাঁস করেননি। চান্দ্র-প্রতিযোগিতায় তাঁরা যে নীরব থাকবেন সেটা না ভাবাই ভাল।

কিন্তু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুললেন জডরেল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ ডঃ বারনারড লোভেল। লুনা-১৫ সম্পর্কে তিনি নিয়মিত এমন সব কথা প্রচার করতে সুরু করলেন তাতে অনেকেরই ধারণা হল মার্কিন দেশের আগেই সোভিয়েত দেশ চাঁদে মানুষ পাঠাবে। অথচ সোভিয়েত দেশ থেকে শুধু জানান হল, লুনা-১৫তে কোন মানব আরোহী নেই। এটিকে চাঁদের বুকে ধীরে নামিয়ে দিয়ে সেখানকার কিছুটা মাটি সংগ্রহ করে আনাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল খেলার মাঠের উত্তেজনার মত। খেলোয়াড়রা যত না ভাবলেন তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি ভাবনা যেন দর্শকদের।

তবু এর সমস্ত কিছুই উপেক্ষা করে কেপ কেনেডির উৎক্ষেপক মঞ্চ কমপ্লেকস ৩৯-এর কাজ যথাযথ চলতে লাগল। যাত্রা মুহূর্ত

জ্ঞাপনকারী ঘড়ির কাঁটা যখন নটা বেজে সাতাশ মিনিটের ঘরে গিয়ে পৌঁছল, অতিকায় স্যাটার্ন-৫ কে সরাসরি আকাশের দিকে মাথা উঁচু করিয়ে যে কাঠামটি দাঁড়িয়ে ছিল তা আস্তে করে সরে গেল। আর যাত্রার ঠিক তিন মিনিট দশ সেকেণ্ড যখন বাকি রকেটের স্বনিয়ন্ত্রিত আগুন ধরানর যন্ত্রটি প্রস্তুত হয়ে নিল।

সরব হল এবার তিন নভচরের হেডফোন। ওঁরা পরস্পরের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। এক অদ্ভুত নির্বিকল্প হাসি।

কমাণ্ড কনট্রোল থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর: টেন, নাইন, এইট,...। আরমস্ট্রং, কলিনস এবং অলডরিন দেখলেন, সম্মুখের আলোটা মুহূর্তে রঙ পালটালো। অর্থাৎ রকেটে আগুন ধরান হল।... সেভেন, সিকস, ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু! পাঁচটি এফ-১ ইঞ্জিন চালু হয়ে গেছে। পরিষ্কার মৃদু কম্পন।... ওয়ান, জিরো!

হেডফোনে শব্দ হল: গো!

দুলে উঠল অ্যাপলো-১১। আর পরমুহূর্তেই ছিয়াত্তর লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আট শ চুরাশি পাউণ্ডের একটি প্রচণ্ড ধাক্কা তাকে ঠেলে তুলল মহাকাশের লক্ষ্য পথে!

বুধবার, জুলাই ১৬, ১৯৬৯। ইসটার্ন ডে লাইট সেভিং টাইম ঠিক সকাল ন'টা বেজে বত্রিশ মিনিট। গ্রিনিচ মিন টাইম দুপুর একটা বেজে বত্রিশ মিনিট। ভারতীয় সময় সন্ধে সাতটা বেজে দু মিনিট চান্দ্র-ভূমির প্রথম তিন অভিযাত্রী মাইকেল কলিনস, এডুইন অলডরিন এবং নিল আরমস্ট্রং পৃথিবীর মাটি ত্যাগ করলেন।

এত যে আড়ম্বর এত যে উত্তেজনা, তবু বলব এবার কারুর মনে যে কিছু সংশয় ছিল সে কথা বলা চলে না। এর আগে মানুষ পৃথিবীর বুক থেকে ঊর্দ্ধাকাশে বিচরণ করেছে। সেভিয়েত নভচর নিওনভ বা মার্কিন নভচর হোয়াইট-এর মহাকাশে যান থেকে

বাইরে এসে একেবারে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ানর ব্যাপারটা মানুষের দুঃসাহসিকতার যেন শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। বরং বলা চলে এবারকার অভিযানের মূল নায়ক যেন স্বয়ং চাঁদই। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং কল্প কাহিনীকার যে চাঁদকে নিয়ে নানা রহস্যের জাল বুনে এসেছেন, তার বাস্তব পরিচয় এবার পাওয়া যাবে। সকলের কৌতূহল সম্ভবতঃ একারণেই। নইলে আজ থেকে তিন মাস আগে যখন অ্যাপলো-৮ এর নভচররা চাঁদের দিকে যাত্রা করেছিলেন, সবচাইতে বেশি অনিশ্চয়তা দ্বিধা এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল সেদিনই। কারণ সেই প্রথম মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ফুঁড়ে চাঁদের দেশে পাড়ি দেবে। এর আগে মহাজাগতিক রশ্মি বা উল্কাচূর্ণের আঘাত সম্পর্কে যেটুকু সংশয় ছিল, মানুষের মহাকাশে দীর্ঘ অনুশীলনের অভিজ্ঞতা থেকে সে সংশয় অনেকটা বিদূরিত হয়েছে। মহাকাশের বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে মানুষ যে টিকে থাকতে পারে সেটাও প্রমাণিত হয়েছে অনেক আগেই।

কিন্তু এবার? অ্যাপলো-৮ এর অভিযাত্রীরা এই প্রথম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করবেন ভাবতেও যেন শিউরে উঠতে হয়। এটাই ছিল সেদিনের বড় প্রশ্ন। মাত্র সাত মাস আগেও কেউ বিশ্বাস করতে চায় নি, এ কাজটি নিতান্ত সহজ হবে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করার পর চাঁদের কাছে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসা মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব হবে!

তাই কেউ কেউ ভাবলেন, চাঁদে মানুষ যাক ঈশ্বর হয়ত এটা চান না।

তবু অ্যাপলোর কাজ থেমে রইল না। কিছুটা বিলম্বিত হলেও ১৯৬৮র ১১-ই অক্টোবর আকাশে তোলা হল অ্যাপলো-৭। এবার-কার নভচর সিরা, ইজল এবং কানিংহাম। ২২শে অক্টোবর পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় এগার দিন এঁরা মহাকাশে বিচরণ করে চন্দ্র যাত্রার

প্রথম পর্ব শেষ করলেন। তবে হ্যাঁ, ঊর্দ্ধাকাশে খুব বেশি দূরে এঁরা যান নি। অতএব তাক লাগানর মত তেমন কিছু এঁদের কাজের মধ্যে ধরা পড়ে নি।

কিন্তু সত্যি সত্যিই সকলে শিউরে উঠলেন, যখন 'নাসা' প্রচার করলেন অ্যাপলো-৮ এর কথা। বলা হল অ্যাপলো-৮ তিন জন নভচরকে নিয়ে চাঁদের একেবারে সত্তর মাইল এলাকার মধ্যে গিয়ে পর্যবেক্ষণ চালাবে। নভচররা সেখান থেকে চাঁদের পিঠের ছবি তুলবেন এবং সেই সঙ্গে চাঁদে নামার সম্ভাব্য ব্যবস্থার ব্যাপারেও পরীক্ষা চালাবেন।

পৃথিবীর প্রতিটি কৌতুহলী মানুষের মনে সেই প্রথম দেখা দিয়েছিল একটি বিরাট জিজ্ঞাসা। তাহলে সত্যি সত্যিই কি মানুষ চাঁদে যাবে? তার পক্ষে কি সম্ভব হবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করা? যদি করেও সে কি আর কখনও ফিরে আসতে পারবে এই পৃথিবীতে? সম্ভবতঃ সেদিন সবচাইতে বেশি রোমাঞ্চ সৃষ্টি করেছিলেন অ্যাপলো-৮ এর নভচররা।

তবু মনে হয় এই তো সেদিন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রখ্যাত রুশ বৈজ্ঞানিক এবং আধুনিক মহাকাশ যাত্রার জনক ডঃ জিওলকভসকি মন্তব্য করেছিলেনঃ পৃথিবীর এই সীমায়িত গণ্ডীকে আশ্রয় করে মানুষ কোন দিনই সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না। আরও আলো, আরও ব্যাপকতার সন্ধানে একদিন সে এর বায়ুস্তরের শেষ সীমা অতিক্রম করে চলে যাবে বহুদূরে। প্রথমে সন্তর্পণে। তারপর পুরো সৌর-জগতটাই নিজের প্রয়োজনে সে জয় করে নেবে।

আর সেই সন্তর্পণ পদক্ষেপটাকেই যেন মনে হল রীতিমত বলিষ্ঠ পদচারণা যখন হিউসটনের মহকাশ গবেষণা কেন্দ্র ঘোষণা করলেন, অ্যাপলো-৮ এর তিন মহাকাশচারী এবার চাঁদের কাছে গিয়ে চাঁদকে উঁকি মেরে দেখবেন। সম্ভবতঃ চান্দ্রযাত্রার সেটাই বৃহত্তম চমক।

পরিস্কার যেন মনে পড়ছে।……

ডিসেম্বর ১৬, ১৯৬০। হিউসটন, টেকসাস। মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে বসে ফ্রানক বোরম্যান, জেমস এ. লোভেল এবং উইলিয়াম এ. এনডারস। ২১শে ডিসেম্বরের ঐতিহাসিক অ্যাপলো-৮ মহাযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় বুঝে নিচ্ছিলেন তাঁরা। সময় যত এগিয়ে আসছে, এই কাজটিও সেই সঙ্গে বেড়ে চলেছে। তাঁদের ঘিরে বিশেষজ্ঞদের মনে নিত্য নতুন দুর্ভাবনার অন্ত নেই। উপস্থিত হয়েছেন ডাক্তার, উপস্থিত হয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার। সেই সঙ্গে মনোবিজ্ঞানী, আবহাওয়াতত্ত্ববিদ, মহাকাশ বিজ্ঞানী, আরও অনেকে। দিনের পর দিন মানুষ যে স্বপ্নটিকে বাস্তবে রূপ দিতে চেয়েছিল, আজ তাঁরা তারই সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। তিনজন নভচর নীরবে শুনে যাচ্ছিলেন, ওঁরা যা বলছিলেন। উত্তর দিচ্ছিলেন, ওঁরা যা জিজ্ঞেস করছিলেন। দেখছিলেন, ওঁদের যা দেখতে বলা হচ্ছিল।

রোমাঞ্চ প্রতিমুহূর্তে, উত্তেজনা প্রতি পদে। পৃথিবীর তিনটি মানুষ এবার সত্যি সত্যিই ছুটে চলেছে পৃথিবী থেকে দূরে, তার মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে, তেজস্ক্রিয় ভ্যান-অ্যালেন বলয় ফুঁড়ে আর এক গ্রহজগতের সান্নিধ্যে। মুখের ওপর আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় ছাপটি স্পষ্ট হয়ে রইলেও অনিশ্চয়তার একটি সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁদের তিন-জনকেই যে কিছুটা আচ্ছন্ন করে তোলে নি, সে কথা বলা চলে না। তবু অদ্ভুত সংযমের পরিচয় মিলল এবার।

পরীক্ষা শেষ হল আরও একবার!

জনৈক সাংবাদিক এসে প্রশ্ন করলেন অভিযাত্রীদের নেতা বোর-ম্যানকে: ফ্রানক, যাত্রার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যখন ঘোষণা করা হবে, দশ, নয়, আট…এক, শূন্য!—তখন তোমার মনের দশাটি কেমন হতে পারে ঠিক এই মুহূর্তে সেটা কল্পনা করতে পার কি?

অতর্কিত প্রশ্ন! তবু চকিতে বোরম্যানের মুখের ওপর ফুটে

উঠল আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় ছাপ। বললেন, পারি। তখন আমরা পাথরের স্তব্ধতা নিয়ে বসে আছি পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড অ্যাপলোর ডগায়। নিচে পনের লক্ষ পাউণ্ড জ্বালানি। যখন নয় সেকেণ্ড বাকি, তখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি ইঞ্জিনকে চালু করা হল। হ্যাঁ, এবার গর্জন শোনা যাচ্ছে। জোরে। আরও জোরে। তারপরই আমরা আস্তে নড়ে উঠলাম। গতি যেন বাড়ছে। প্রথমে ধীরে। তারপরই—!

জিম, এই অভিযান থেকে তুমি নতুন কি প্রত্যাশা করছ? অর্থাৎ আমি জানতে চাই, চাঁদে গিয়ে লাভ কি হবে? এবার প্রশ্ন করা হল লোভেলকে।

ঠিক এই মুহূর্তে চাঁদের রাজ্যটি কেমন, তা জানা। তাহলে আমাদের বাসভূমি এই গ্রহটি, যার নাম পৃথিবী তার অনেক রহস্যই আমরা উদ্ঘাটন করতে পারব। সরাসরি জবাব দিলেন লোভেল।

অবশেষে ২১শে ডিসেম্বর। ভারতীয় সময় বিকেল তিনটে বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। বোরম্যান, লোভেল এবং এনডারস কেপ কেনেডিতে পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহাকাশ যানের ক্যাবিনে এসে স্থির হয়ে বসলেন। অদূরে ঝাঁকে ঝাঁকে টেলিভিশন ক্যামেরার ভিড়। বেতার প্রতিবেদকের। তাদের মাথার ওপর হেডফোন। মুখের সামনে মাইক্রোফোন। অনর্গল ধারা বিবরণী দিয়ে চলেছে দূরদূরান্তের মানুষের উদ্দেশে। আতলানতি-কের ওপারে। বি. বি. সি সেই ধারা বিবরণী পনেরটি ভাষায় প্রচার করতে সুরু করেছে সারা ইউরোপ জুড়ে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে মসকোর সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে হট লাইনের মাধ্যমে। আর কেপ কেনেডির প্রক্ষেপকভূমির শক্ত মাটি আঁকড়ে যেখানে অতিকায় স্যাটার্ন-৫ রকেটটি দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে তারই অদূরে হাজারো যন্ত্রপাতির সামনে বসে কুশলীরা।

অতিক্রান্ত হল দীর্ঘ দুই ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট। বিজ্ঞানীদের সামনে অদ্ভুত লাল-নীল আলোগুলি জ্বলে নিভে জানাল শেষ সংকেত।

মুহূর্তে শোনা গেল গ্রাউণ্ড স্টেশনের কর্মাধ্যক্ষের কণ্ঠস্বর: নয়, আট, সাত···দুই, এক, শূন্য! তারপরই প্রচণ্ড গর্জন! স্যাটার্ন—৫ এর নিচে লাগান প্রচণ্ড শক্তিশালী পাঁচটি এফ-১ ইঞ্জিনের গর্জন চারপাশের আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। পরক্ষণেই প্রতিটি ইঞ্জিন পনের লক্ষ পাউণ্ড বলে ঠেলে তুলল পৃথিবীর সেদিনের সব চাইতে শক্তিশালী রকেটকে মহাকাশের দিকে। নিয়ে চলল পৃথিবীর প্রথম তিনজন নভচরকে চাঁদের দেশে। যুগ যুগ ধরে যাকে ঘিরে লক্ষ কবি অযুত কবিতার স্বপ্নজাল রচনা করেছে, হাজারো মানুষের নিযুত রূপকথা ঘুমপাড়ানি গান গেয়েছে শত কোটি শিশুর শিয়রে, অন্ধকারে চোখের মশাল জ্বেলে প্রহরা গুনেছে শত সহস্র বিজ্ঞানী, সেখানে। রূপকথা উপকথার চাঁদকে নিয়ে শুরু হল ইতিহাসের বাস্তবতা রচনা।

এবং শেষ পর্যন্ত এল অ্যাপলো-১১ এর সাফল্য। অ্যাপলো-৮ এর মধ্যে ছিল একটি সন্তর্পন ভাব। রীতিমত চমক। মানুষের চন্দ্রে অবতরণ সে তুলনায় যেন এক অবসম্ভাবী ঘটনা। যেন পরীক্ষার ফলটা জানাই ছিল। শুধু গেজেটে নামটা দেখে একটু হাঁফ ছাড়া।

কিন্তু তার শেষ কোথায়?

প্রশ্ন উঠেছে হাজারো। মহাকাশ অভিযান কেন? দারিদ্র্য এবং দুর্দশায় পৃথিবী যখন জর্জরিত তখন বিপুল অর্থ এবং সামর্থ্যকে এভাবে ব্যায় করা কি একটি প্রচণ্ড অপচয় নয়? দীর্ঘদিন ধরে রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ এবং আরও নানান ব্যাপার নিয়ে কাজ চালান হচ্ছে। তাতে সত্যিকারের লাভ কি?

মুখ্যত অজানাকে জানা।

কিন্তু এ পর্যন্ত তার পরোক্ষ ফল যা পাওয়া গেছে আজ থেকে পনের বছর আগেও মানুষ তা কল্পনা করতে পারে নি। আজকের আকাশে নিয়ত বিচরণ করে চলেছে রাশিয়া এবং আমেরিকার প্রচুর সংখ্যক কৃত্রিম উপগ্রহ। এদের কেউ প্রতি-মুহূর্তে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের সংবাদ জানিয়ে আমাদের সাহায্য করছে। এর ফলে অনেক আগে থেকেই পৃথিবীর কোন স্থানের আবহাওয়া কেমন হবে আমরা জানতে পারি। সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ কসমস-১৩৫ কতটা পরিমাণ ধূলির আবরণ পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে তার হিসেব যুগিয়েছে। কয়েক বছর আগে মেকসি-কোতে যে প্রবল ঘূর্ণীঝড় হয়ে গেল সে সংবাদ বহু আগেই টাইরসের সাহায্যে জানা সম্ভব হয়েছিল। ফলে বিপন্ন অঞ্চলের মানুষ এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার ব্যবস্থা বহু আগে থেকেই নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এ ধরনের প্রচেষ্টার ফলে অত দুরপাল্লার বিমানপথকে অনেকাংশে বিপদের হাত থেকে বাঁচান সম্ভব হয়েছে।

দেশদেশান্তরের সংবাদ আদান প্রদান করার ব্যাপারেও আজ কাজে লাগান হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে। সেবার জাপানে অনুষ্ঠিত ওলিমপিক খেলা টেলিভিশনের মাধ্যমে দূরাঞ্চলে প্রচার করা সম্ভব হয়েছিল এদেরই সাহায্যে। বর্তমানে এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের টেলিফোন বা বেতার ব্যবস্থায় এত বেশি চাপ পড়ছে যে, কৃত্রিম উপগ্রহ ছাড়া খুব কম সময়ে বহু দূরের বার্তা সংগ্রহ একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও মহাকাশ গবেষণা করতে গিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা জটিল ব্যাধির ওষুধ, বিচিত্র রঙ এবং হাজারো নতুন সামগ্রী যা বহুভাবে আমরা কাজে লাগাচ্ছি।

মহাকাশযান থেকে তথ্যাবলী সংগ্রহের জন্যে চাই বিদ্যুৎ শক্তি।

প্রথমদিকে বিজ্ঞানীদের কাছে এটা একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু পরে তার সমাধান পাওয়া গেল সিলিকন-সৌর কোষের মধ্যে। বালির মধ্যে থাকে সিলিকন। সেই সিলিকনকে নিষ্কাশিত করে তার ওপর বোরনের প্রলেপ লাগিয়ে তৈরি করা হল অত্যন্ত হাল্কা এক ধরনের তড়িৎকোষ। এর মধ্যে জল নেই। কোন এসিড নেই। এক খণ্ড বিশুদ্ধ সিলিকনকে শুধু সূর্যের আলোর দিকে মেলে ধরা। সঙ্গে সঙ্গে সেই কোষ থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল বিদ্যুৎ শক্তি। কোষটি তৈরি করতে যা খরচ। তারপর আকাশে যতদিন সূর্য, কোষ থেকে ততদিন বিদ্যুৎ শক্তি সংগ্রহ করা। কোন খরচ নেই। জল, তেল, কয়লা এবং প্রাকৃতিক গ্যাস যে হারে আমরা খরচ করছি তাতে ভাণ্ডার শূন্য হতে আর দেরি নেই। অতএব ঐ ধরনের তড়িৎ কোষ ভবিষ্যতে আমাদের প্রচুর সাহায্য করতে পারবে।

অর্থাৎ মহাকাশ গবেষণায় লাভবান যে একেবারে আমরা হইনি, তা বলা চলে না। এ সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনা পরে করা যাবে।

তার আগে একটি পলক দৃষ্টি বোলান যাক মানুষের পৃথিবী থেকে মহাকাশে পাড়ি জমানর অতীতের দিন গুলির দিকে। আজকের চন্দ্রে অভিযানের যে সাফল্য, হয়ত সেদিন বাস্তবে তা পরিণত হয় নি। কিন্তু সেই পুরনো কাহিনীও আজকের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়। আরমস্ট্রং, কলিনস এবং অলড্রিনের ধারাবাহিক কাহিনী সুরু করার আগে মুহূর্তের জন্যে একবার পেছনের পাতা উল্টোলে নিশ্চয় ব্যাপরটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

'পৃথিবীর সীমায়িত গণ্ডীকে আশ্রয় করে মানুষ কোন দিনই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। আরও ব্যাপকতার সন্ধানে এর বায়ুস্তরের শেষ সীমা অতিক্রম করে সে চলে যাবে বহু দূরে। প্রথমে সন্তর্পণে। তারপর পুরো সৌরমণ্ডলটাকেই একদিন সে জয় করবে নিজের

প্রয়োজনে।' কথাগুলি বলেছিলেন সোভিয়েত দেশের অন্যতম বিজ্ঞানী এবং আধুনিক মহাকাশ যাত্রার জনক কনসতানতিন এডোয়ারডোভিচ জিওলকভসকি। চাঁদে সত্যি সত্যিই পৃথিবীর দুজন মানুষ অবতরণ করেছে, তাদের সম্মুখে পাহাড়, পায়ের নিচে নুড়ি, আশেপাশে ছোট বড় গহ্বরের ভিড়। ঠিক এমনই একটি বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন ১৮৯৬-এ। তাঁর সে বর্ণনার অদ্ভুত মিল পাওয়া গেল গত ২১শে জুলাই, ১৯৬০। ভারতীয় সময় তখন সোমবার সকাল ৮টা ২৬ মিনিট ২০ সেকেণ্ড। মানুষের ইতিহাসের সবচাইতে রোমাঞ্চকর, সব চাইতে গৌরবমুহূর্ত রচিত হল। সার্থক হল জিওলকভসকির স্বপ্ন। মার্কিন দেশের দুজন মানুষ, নীল আরমস্ট্রং এবং এডুইন অলডরিন চাঁদের বুকে এঁকে দিলেন তাঁদের পদচিহ্ন। আর সেই সঙ্গে প্রথম বর্ণনাটি যা এল জিওলকভসকির বর্ণনার সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল। ব্যতিক্রম শুধু জিওলকভসকি যে দুজন মানুষের কথা উল্লেখ করেছিলেন, তাঁরা রুশ। কিন্তু বাস্তবে চন্দ্রহার গলায় পরলেন আতলানতিকের ওপারের দুজন মানুষ নীল আরমস্ট্রং এবং এডুইন অলডরিন।

সংকীর্ণ প্রতিযোগিতার কথা থাক। আজকের এ সাফল্য কোন বিশেষ মানুষ, কোন বিশেষ দেশ, অথবা কোন বিশেষ অঞ্চলের নয়, পৃথিবীর সর্বজনের। গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র যেদিন মহাবিশ্বের জানালা খুলে দিয়েছিল, কেপলারের গ্রহ-গতি তত্ত্ব যেদিন কৌতুহল সৃষ্টি করেছিল সহস্র মানুষের মনে, নিউটন যেদিন ব্যাখ্যা করলেন চাঁদ কেন উপগ্রহরূপে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে চলেছে তারপর থেকেই মহাকাশ মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। সেদিন থেকেই বলা চলে মানুষ যেন যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে মহাকাশে ভ্রমণের কথা ভাবতে সুরু করল। প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অবলম্বন করে গল্প রচনা করলেন এডগার অ্যালেন পো, হেল, এইচ জি ওয়েলস, জুল ভারন

এবং আরও অনেকে। এরা স্বপ্ন দেখলেন পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে বিচরণ করছে, অথবা ভিন্ন গ্রহে। এমন কি কোন কোন লেখক সুদূর নক্ষত্র মণ্ডলের কোন গ্রহের মাটিও দখল করে বসলেন। তবে এর সমস্তই কল্প কথা। বাস্তবে মহাকাশযাত্রাকে সাফল্যমণ্ডিত করার ব্যাপারে যাঁরা তখন কাজ সুরু করে দিয়েছেন তাঁদের সঙ্গে এঁদের মিল খুবই নগণ্য।

১২০ খৃষ্টাব্দে লুসিয়ান বিরচিত 'ট্রু হিসটোরি' গ্রন্থে প্রথম চন্দ্রাভিযানের একটি বিশদ বিবরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিবরণে রাজহাঁসের পিঠে মহাকাশ যান বহনের কথা বলা হয়। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'ভয়েজ ডালস লা লিউন' এবং 'হিসটোরি দ্যুম ইটাটস এট এমপায়ারস দ্যু সোলেইল'। রচয়িতা সাইরোনো দ্য বারজারস। ইনি রকেট চালিত একটি মহাকাশ যানের বর্ণনা দেন। এই বর্ণনায় কোন কোন স্থানে যথেষ্ট অবিজ্ঞানীসুলভ চিন্তাধারা প্রকট হয়ে উঠলেও মহাকাশ যাত্রার যে সমস্ত অসুবিধেগুলি তিনি আলোচনা করেন তার ভেতর যথেষ্ট বাস্তবতা ছিল। উত্তরকালে প্রখ্যাত কল্পকাহিনীকার জুল ভার্ন-এর বর্ণনায় কামানের গোলার মুখে চড়ে চন্দ্রাভিযানের যে রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির দৃষ্টান্ত মেলে তার সঙ্গে আধুনিক রকেট যাত্রার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

অথচ এই আধুনিক রকেটের প্রাচীন সংস্করণটি তৈরি হয়েছিল চেঙ্গিস খাঁর পুত্র ওগোদাই-এর হাতে। ১২৩২ খৃষ্টাব্দে ওগোদাই এক দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বাহিনী নিয়ে ফাই ফাঙ্‌ ফু শহর আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করেছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি হাউই-এর মত এক ধরনের আগুনের গোলা ব্যবহার করেন। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ওয়াংহু নামে জনৈক চৈনিক অভিযাত্রীর এক বিচিত্র বর্ণনা পাওয়া যায়। ইনি

দুটি ঘুড়ি তৈরি করে জুড়ে দেন একটি কাঠামোর সঙ্গে। কাঠামোর ওপর একটি বসার আসন ছিল আর সেই আসনের নিচে ছিল সাত-চল্লিশটি হাউই-এর মত রকেট। জ্বালানি হিসেবে এতে বারুদ ব্যবহার করা হয়।

রকেটের উদাহরণে চমৎকারিত্ব এনেছিলেন দাক্ষিণাত্যের রাজারা। ঐতিহাসিকদের অভিমত, ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ভারতের কয়েকজন হিন্দু রাজা কতকগুলি রকেট তৈরি করান যেগুলিকে আধুনিক 'মিসাইল' বা ক্ষেপণাস্ত্রের প্রাচীন সংস্করণ বলা চলে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানীদের মতে ভারতীয় কুশলীদের হাতে গড়া ঐ ক্ষেপণাস্ত্র যথেষ্ট উন্নত ধরনের ছিল। এগুলি তৈরি করা হত লোহার নল দিয়ে। ভেতরে থাকত বারুদ। নলের পেছনে দশ ফুট লম্বা একটি বাঁশের অংশ জুড়ে দেওয়া হত গতির সাম্যতা বজায় রাখতে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের সুলতান এমন ধরনের একদল রকেটধারী বাহিনী নিয়ে শ্রীরঙ্গপট্টমের যুদ্ধে বৃটিশ সেনাদের ছত্রভঙ্গ করেন। যুদ্ধে বৃটিশ অধিনায়ক ছিলেন লর্ড কর্ণওয়ালিস। এই রকেটগুলির পাল্লা দেড় মাইল পর্যন্ত ছিল।

তবে বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেল, যদি দূর নভোমাঝে মানুষকে কোনদিন পাড়ি দিতে হয় তাহলে রকেটের দ্বারাই একমাত্র তা সম্ভব। এই রকেটের সংস্কার সাধনের ব্যাপারে সারা ইউরোপে একদিন যুগান্তকারী উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিলেন প্রখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম কনগ্রেভ। কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করে যে সমস্ত রকেট তিনি তৈরি করেন প্রথম দিকে তা মুখ্যত যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বিপন্ন জাহাজের যাত্রীদের রক্ষা করার ব্যাপারে কনগ্রেভ রকেট কাজে লাগান শুরু হয়। মানব কল্যাণে রকেটের ব্যবহার এই প্রথম।

কিন্তু শুধু যুদ্ধ নয়। রকেটের সাহায্যে আকাশে ওড়ার সংবাদ পাওয়া গেল ১১ই জুলাই, ১৯২৮এ। ফ্রায়েডরিখ্ স্ট্যামার নামে জনৈক জার্মান, রকেটের সাহায্যে একটি গ্লাইডার উড়িয়ে ঐদিন বেশ কিছুটা উর্দ্ধাকাশে উড়ে এসে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ১৯৩১-এর ২রা ফেব্রুয়ারি ইনি অসস্ট্রিয়ার সোককেল এবং রাদেগানদ-এর মধ্যে রকেটের সাহায্যে ডাকবিলিরও ব্যবস্থা করেন। এই দুইটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব দুই মাইল। কিন্তু পাহাড়ী পথে ঘুরে যেতে হলে অনেকটা পথ পড়ে। প্রথম ক্ষেপে ১০২টি চিঠি বিলি করা হয়। তবে এই রকেটগুলিতে কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করা হত।

অবশেষে রকেটের পাল্লা যত বাড়তে লাগল, মানুষের কল্পনাও প্রসারিত হতে লাগল সেই হারে। জিজ্ঞাসা, যে মহাকাশ যুগ যুগ ধরে তার মনে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, কি তার স্বরূপ? কি আছে সেখানে? মহাকাশ যাত্রা কি রকেটের সাহায্যে সফল করা যায় না?

সেটা বিংশ শতাব্দীর পাদপীঠ। প্রকাশিত হল প্রখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী কনসতানতিন এডুয়ারডোভিচ জিওলকভসকির রচনা 'একসপ্লোরেশন অব স্পেশ বাই রকেট ডিভাইসেস'। এই গ্রন্থে লেখক বহুস্তরবিশিষ্ট এবং তরল জ্বালানিতে চলে এমন একটি রকেটের পরিকল্পনা দিলেন। উত্তরকালে তাঁরই তত্ত্বের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে বিস্ময়কর রকেট বিজ্ঞান। যার ফল আজকের মহাকাশ যাত্রা।

১৯৩০। লেনিনগ্রেড থেকে একটি অনুরোধপত্র পেলেন জিওলকভসকি। অধ্যাপক নিকোলাই এ রাইনিন লিখেছেন, 'শ্রদ্ধেয় জিওলকভসকি, আপনার পঁচাত্তর বর্ষ জন্মতিথি পালন উপলক্ষে আমরা আপনার আত্মোজীবনী প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছি। আশা করি আপনার সহযোগিতা পাব।'

এর কয়েকদিন পর, অধ্যাপক রাইনিন একটি ছোট্ট প্যাকেট পেলেন জিওলকভসকির কাছ থেকে। প্যাকেটের মধ্যে থেকে বেরলো



জিওলকভসকি

সামান্য কয়েকটি ফটোগ্রাফ এবং একছত্র চিঠি। জিওলকভসকি লিখেছেন, 'প্রিয় অধ্যাপক নিকোলাই, এর বেশি কিছু আপনাকে আর দিতে পারলাম না।' অধ্যাপক রাইনিন পাণ্ডুলিপি পড়ে তো অবাক। এতে ব্যক্তিগত কথাই তো বলতে গেলে কিছু নেই? এমন কি ঐ ফটোগুলির মধ্যে স্ত্রী, পুত্র, নাতি-নাতনী পরিবৃত অবস্থায় তাঁকে না দেখলে বোঝাই যেত না যে কোনকালে তিনি বিয়ে

করেছিলেন। কারণ এ সমস্ত ব্যক্তিগত কথা পাণ্ডুলিপিতে তিনি উল্লেখ করেন নি। পছন্দও করতেন না।

অত্যন্ত শান্ত, ধৈর্যশীল এবং সাবধানী ছিলেন জিওলকভসকি। সেই সঙ্গে আত্মসচেতন এবং সংযত। সম্ভবতঃ প্রথম দিকে সেণ্ট পিটার্সবার্গ সোসাইটি ফর ফিজিক্স এণ্ড কেমিস্ট্রিতে যে গবেষণা-পত্রগুলি তিনি পেশ করেন তাদের প্রচণ্ড অসাফল্যই তাঁকে এমন ভাবে গড়ে তুলেছিল।

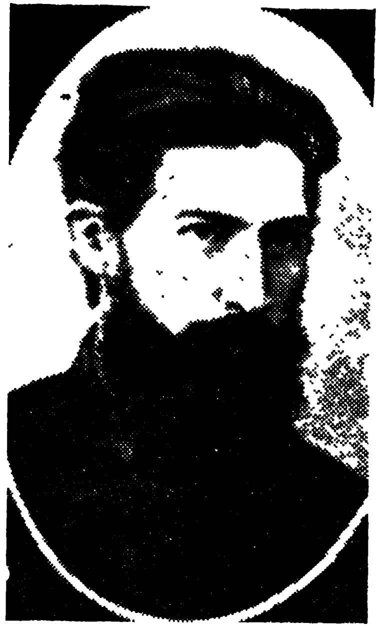
কিন্তু একজনের চোখ তাঁর অধ্যাবসায় এড়িয়ে গেল না। তিনি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী দিমিত্রি মেনডেলিফ্। এঁরই অনুপ্রেরণায় জিওলকভসকি কাজ করে যেতে লাগলেন। তবে নতুন দিকে।

অবশেষে দীর্ঘ কয়েক বছর পর ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হল যুগান্তকারী প্রবন্ধ। বিষয়, মহাকাশ যাত্রা। এই প্রথম। 'নেচার অ্যাণ্ড ম্যান' নামে একটি বিজ্ঞান-পত্রে লেখাটি প্রকাশ পাবার পর রীতিমত সাড়া পড়ে গেল। এই ঘটনা জিওলকভসকির চিন্তাধারাকে এক নতুন পথে পরিচালিত করল। মহাকাশ অভিযান সম্পর্কে এবার তিনি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ভাবতে সুরু করলেন।

গ্রহান্তরের মাঝখানে পড়ে রয়েছে মহাশূন্য! অতএব নভচর যে যানে চড়ে গ্রহান্তরে পাড়ি দেবে সেটিকে সম্পূর্ণ ছিদ্রহীন করে তৈরি করতে হবে। তার মধ্যে থাকবে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সঞ্চিত করে রাখার ব্যবস্থা। এবং সেই সঙ্গে বায়ু বিশুদ্ধকরণেরও। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেহেতু শূন্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, যানটিকে চালাতে হবে ঘাতের সাহায্যে। অর্থাৎ রকেটের সাহায্যে। অবশ্য মানুষের মহাকাশে বিচরণের জন্যে যে রকেটের মত কোন ক্ষেপকের প্রয়োজন হবে, এ কথা সর্বপ্রথম বলেন নিকোলাই আইভানোভিচ কিবালশিখ, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে।

কিন্তু সাধারণ কঠিন জ্বালানিতে চলে এমন রকেটের ক্ষমতা

খুবই কম। উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন রকেটের জন্যে চাই প্রচণ্ড নির্গম-বেগ বা এগঝস্ট ভোলোসিটি। অর্থাৎ রকেটের জ্বালানি পোড়ার পর যত বেগে বেরিয়ে আসবে রকেটও সেই হারে এগিয়ে যাবে। কিন্তু সাধারণ কঠিন জ্বালানি পুড়িয়ে এটা পাওয়া সম্ভব নয়। জিওলকভসকি বললেন, মহাকাশযান চালাতে গেলে কেরোসিনের মত কোন তরল জ্বালানির প্রয়োজন। একটি মহাকাশযানের ছকও এঁকে ফেললেন তিনি যা তরল হাইড্রোজেন এবং



কিবালশিখ

তরল অক্সিজেনে চলতে পারে। জ্বালানি পোড়ার সময় যে প্রচণ্ড উত্তাপ তৈরি হবে তা থেকে রকেট ইঞ্জিনকে কি করে বাঁচান যায় সে কথাও চিন্তা করলেন তিনি।

মোট কথা পুরো সমস্যাটিকে নানা ভাবে খতিয়ে দেখলেন জিওলকভসকি এবং ১৮৯৮ এর মধ্যে তাঁর প্রারম্ভিক গবেষণার কাজ শেষ হল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে 'সায়েন্স সার্ভে' পত্রিকায় তাঁর এই নতুন গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের অল্পদিন পরেই 'সায়েন্স সার্ভে'র এই সংখ্যাটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। কারণ জার'কে সমালোচনা করে এতে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে সেই মুহূর্তে প্রবন্ধটি যথাযথ প্রচার পেল না। তবে সৌভাগ্য-

ক্রমে জিওলকভসকির নিজস্ব কপিটি রক্ষা পায় এবং মূল প্রবন্ধটিকে আরও বিশ্লেষণ করে ১৯১১ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত এভিয়েশন রিপোর্টার নামে একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

সুদূর মহাকাশে পাড়ি দিতে গেলে যে বহুস্তর রকেটের প্রয়োজন হবে রীতিমত তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন তিনি এই প্রবন্ধাবলীতে। বললেন, মনে করুন রকেটের ডগায় করে একটন ওজনের একটি মানববাহী কক্ষকে আমরা চাঁদে পাঠাতে চাই। এর জন্যে নির্গম বেগ হবে প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০০ মিটার। এই বেগই রকেটকে ধাক্কা মেরে চালাবে। যদি একটি রকেটেই আমাদের কাজ সারতে হয় তাহলে যতটা জ্বালানি আমাদের ব্যবহার করতে হবে তার পরিমাণ হবে ঐ রকেটের ষাটগুণ বেশি। প্রযুক্তির দিক দিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে এত বেশি বোঝা নিয়ে ঐ রকেটটির পক্ষে আকাশে ওড়াই অসম্ভব। কিন্তু একটির বদলে যদি পর পর একাধিক রকেট সাজিয়ে বহু স্তর করে নেওয়া যায় তাহলে জ্বালানি অনেকটা কম হলেই চলবে।

এ ছাড়া তাঁর মহাকাশযানকে খাদ্য উৎপাদন, অক্সিজেন প্রস্তুত করা এবং স্বাস্থ্যবিধি অটুট রাখার ব্যবস্থাও করা হয়। সেই সঙ্গে সৌর শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ বা তাপ উৎপাদন এবং প্রয়োজনে সেই বিদ্যুৎ বা তাপের সাহায্যে মহাকাশযান চালান, এমন অনেক কথাই রীতিমত তত্ত্বগতভাবে আলোচনা করলেন একের পর এক, মোট সাতশ'টি গবেষণাপত্রে।

এই সময়ে তিনি শিষ্যরূপে পেলেন ডঃ জেকভ আই পারেলম্যানকে। ডঃ পারেলম্যানই পরে তাঁর গুরুদেবের মূল তথ্যবহুল রচনাকে জনসাধারণের বোধগম্য করে প্রচার করেন। ফলে জিওলকভসকি, রাশিয়ার অন্যতম মৌল-গবেষক হিসেবে পরিচিতি পান।

কিন্তু পৃথিবীর মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা তখন সুরু হয়ে গেছে নানা দিকে, নানা উদ্দেশে। ১৯০৫-এ আর বর নামে জনৈক বিজ্ঞানী কঠিন জ্বালানি দিয়ে একটি রকেট তুললেন প্রায় তিন হাজার ফুট ওপরে। খানিকটা বিস্ফোরক পদার্থ এতে বহন করা হয়েছিল এবং তার সাহায্যে তিনি আকাশের জমাট বাঁধা মেঘকে ছড়িয়ে দিয়ে শিলাবৃষ্টির হাত থেকে অনেককে বাঁচান। পরীক্ষাটি তিনি আরও কয়েকবার করেছিলেন। অ্যালফ্রেড মল নামে আর একজন ইঞ্জিনিয়ার রকেটের সাহায্যে উঁচু থেকে চারপাশের ছবি তোলার চেষ্টা করেন। কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯১২ সালে তিনি সাফল্যমণ্ডিত হন। এটি আকারে যথেষ্ট বড় ছিল। জ্বালানি সহ মোট ওজন সাড়ে বিরানব্বই পাউণ্ড। যাতে সাম্যতা বজায় রেখে উড়তে পারে তার জন্যে এর নিচে একটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্র জুড়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে ছবি তোলার জন্যে আট ইঞ্চি লম্বা এবং দশ ইঞ্চি চওড়া প্লেটের একটি ক্যামেরাও। দূর থেকে বৈদ্যুতিক প্রণালীতে রকেটটিতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। রকেটের বিবর্তনে এ এক নতুন দিক। তবে এতে কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করা হয়েছিল।

১৯১৪। ইউরোপে শুরু হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। বিভিন্ন সরকার তখন রকেটের ওপর সমস্ত রকমের গবেষণা লুকিয়ে ফেললেন। মুখ্যত অনেকে পুরোপুরি যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যবহার করতে লাগলেন রকেট। সে ইতিহাস সর্বসাধারণের কাছে খুবই অস্পষ্ট। তারপর রকেট বিজ্ঞানের নতুন দিগন্তের সূচনা হল ২৬শে মে, ১৯১৯। ম্যাশাচুসেটের অন্তর্গত ওয়ারচেস্টারের ক্লার্ক কলেজের অধ্যাপক ডঃ রবার্ট হাচিন্স গডার্ড উনসত্তর পৃষ্ঠার একটি পাণ্ডুলিপি শেষ করলেন রকেটের উপর। কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্যে সেটি তিনি পেশ করলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনকে। ১৯২০তে ২৫৪০ নম্বর

প্রকাশনীরূপে গবেষণা পত্রটি প্রকাশ করলেন স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন। শিরোনামঃ 'এ মেথড অব রিচিং একস্ট্রিম অলটিচুডস'।

বইটির প্রথম ছত্রে গডার্ড লিখলেনঃ 'বিভিন্ন গবেষণা সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি একটি আবহাওয়া বেলুনে যতটা ঊর্ধ্বাকাশে যেতে পারে, অর্থাৎ প্রায় কুড়ি মাইল, তারও ঊর্দ্ধে পাঠানর উদ্দেশে এই গবেষণা।' কিন্তু মূল বিষয়বস্তু এবং তার ব্যাখ্যা খুব একটা আকর্ষণীয় কিছু হল না। তবে শেষের কয়েকটি লাইন অনেকের মনে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করল। এই অংশে রকেটে চড়ে চাঁদে যাওয়া এবং সেখান থেকে এক ঝলক আলোক সৃষ্টি করে পৌঁছনোর সংকেত পাঠানর বর্ণনা ছিল।

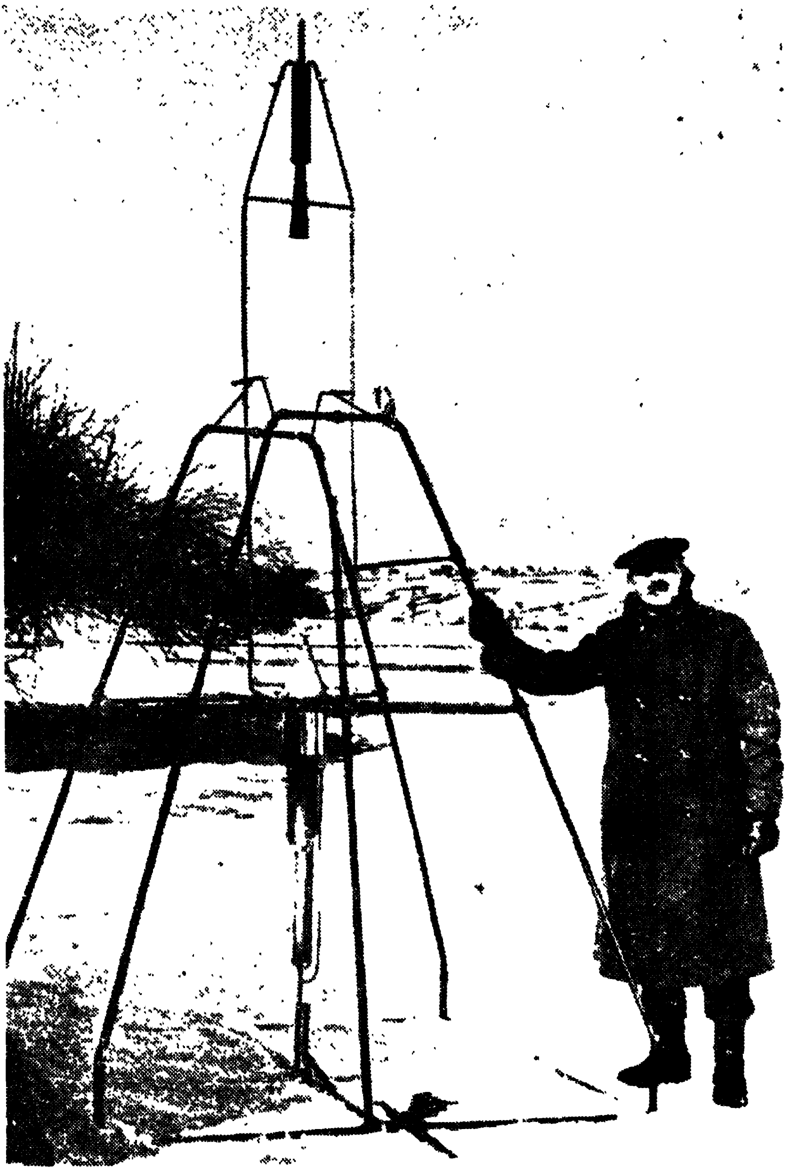
কিন্তু ১৯১৩ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের ফলে পরীক্ষাকার্য চালানর ব্যাপারে বিশেষ সুবিধে করতে পারলেন না ডঃ গডার্ড। ইতিমধ্যে মিউনিকের আর ওলডেনবার্গ নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা 'রকেটে আন্তর্গ্রহ যাত্রা' নামে একটি বই ছেপে ফেলল। লেখক এইচ ওবার্থ। এই বইটিতে তিনি মডেল-ই নামে একটি মহকাশযানের ছক এবং তরল জ্বালানির কথা উল্লেখ করেন। মোটামুটি তাঁর সমস্ত বক্তব্য জিওলকভসকির মূল তত্ত্বের অনুরূপ। তবে ওবার্থ রুশ ভাষা জানতেন না এবং তাঁর পক্ষে জিওলকভসকির মূল রচনা পাওয়াও কঠিন ছিল, একথা ভেবে বলা যেতে পারে তাঁর পরিকল্পনাও মৌলিক ছিল। গডার্ডও রুশ ভাষা জানতেন না, অথচ তরল জ্বালানি নিয়ে তিনি যে একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন একথা ১৯৩৬-এর আগে তিনি বাইরের জগতে প্রকাশ করেন নি।

কিন্তু ওবার্থের কপাল মন্দ। সুখ্যাতির সঙ্গে কিছু উগ্র সমালোচকও জুটল তাঁর। একজন তো তীব্র বিরূপ সমালোচনা করে এক গোছা প্রবন্ধ প্রকাশ করে ফেললেন একটি বিখ্যাত পত্রিকায়।

সমালোচনার নিচে সই করলেন প্রিভি-কাউন্সিলার অধ্যাপক ডঃ লোরেঞ্জ। ডঃ লোরেঞ্জ ঠাণ্ডা মাথায় প্রমাণ করে দিলেন ওবার্থের মহাকাশযান কখনই সেকেণ্ডে সাতমাইল গতিবেগ নিয়ে পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারবে না। সেকেণ্ডে সাত গাইল গতিবেগ পাবার মত ক্ষমতা তার নেই। ওবার্থ এর উত্তর দিলেন, ফল হল না। পরে জানা গেছে আধা-বয়েসী একটি ছোকরা প্রিভি কাউন্সিলারের মত একজন বয়স্ক এবং গন্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে বাদানুবাদ করে এটা ডঃ লোরেঞ্জের ভাল লাগে নি।

তবু হাল ছাড়লেন না ওবার্থ। বার্লিনে চলে এলেন তিনি এবং স্বাধীন ভাবে গবেণষায় লেগে গেলেন। সাহায্যকারীর জন্যে লোক দরকার। কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন। সাড়া দিলেন তাঁকে সাহায্য করতে রুডলফ নেবেল। শিক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা। যুদ্ধে পাইলট ছিলেন। পদে লেফটেনাণ্ট। অভিজ্ঞতা শত্রু-পক্ষের এগারটি বিমান তিনি ধ্বংস করেছেন। কথাবার্তা এবং চটপটে চালচলন দেখে ওবার্থ ওঁকে সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করলেন। এঁর উপর দায়িত্ব রইল রকেট তৈরির জন্যে এলুমিনিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম সংকর ধাতু সংগ্রহ করার এবং তরল জ্বালানি তৈরি করা। পরে জানা যায় নেবেল আসলে ভাঁওতাবাজ। তাড়াহুড়ো করে কোন রকমে হাইস্কুল পাশ করে তিনি সেনা বিভাগে চাকরী নেন। কোন কালে তিনি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন না। কিছুদিন রান্নাঘরের উনুন বিক্রির কাজ করেও বেড়িয়েছেন। অবশ্য কথাটা ওবার্থের কাছে অজ্ঞাত রইল।

আলেকজাণ্ডার বোরিসোভিচ সেরসেভসস্কি নামে একজন রুশ ছাত্র হলেন তাঁর দ্বিতীয় সহকারী। চেষ্টা চলল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু করতে পারলেন না। তবু রকেটের আধুনিকীকরণের ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা এবং কার্যাবলী নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য।



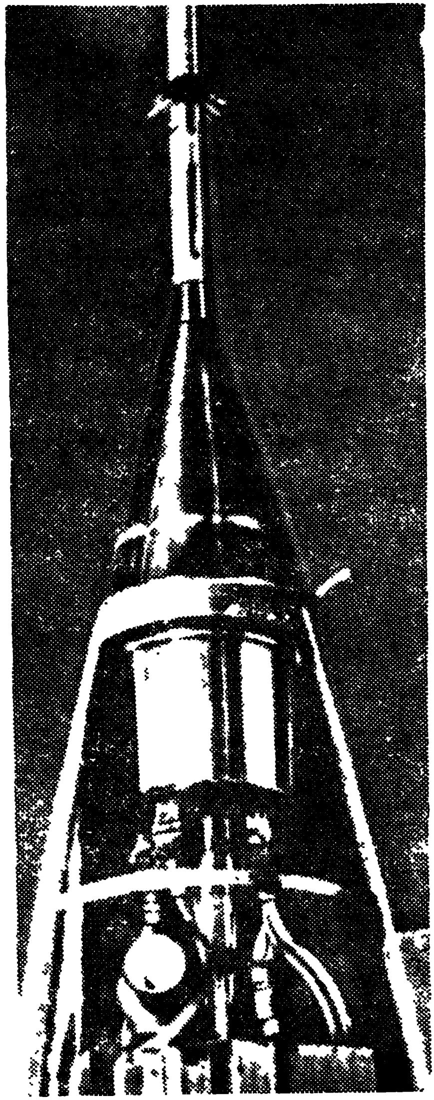
ডঃ গডার্ড মার্চ ১৬, ১৯২৬-এ তাঁর প্রথম তরল জ্বালানির রকেটটি উৎক্ষেপ করছেন।

ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরো দস্তুর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গডার্ড। ১৯২২-এ তিনি তাঁর প্রথম রকেট ইঞ্জিনটি পরীক্ষা করলেন তরল জ্বালানির সাহায্যে। অবশেষে ঐতিহাসিক উৎক্ষেপন পর্ব সম্পন্ন হল ১৬ই মার্চ, ১৯২৬-এ। পৃথিবীর প্রথম একটি আদর্শ তরল জ্বালানির রকেট সাফল্যের সঙ্গে মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে উড়ে গেল। অবার্নের মিস এফি ওয়ার্ডের খামারে এই পরীক্ষা কার্যটি চালান হয়। জ্বালানি তরল অক্সিজেন এবং গ্যাসোলিন। আগুন ধরান হয় একটি গ্যাস-ব্লোয়ার দিয়ে এবং উৎক্ষেপক ভূমিরূপে কাজে লাগান হয় একটি লোহার কাঠামকে। এই ঐতিহাসিক পরীক্ষায় ক্যামেরা অপারেটার রূপে কাজ করেন মিসেস গডার্ড। সহকারী ছিলেন হেনরী শাখস এবং পি এম রুপ। ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে রকেটটি ১৮৪ ফুট দূরত্ব পর্যন্ত অতিক্রম করে। এর পর ১৭ই জুলাই ১৯২৯-এ তিনি যে রকেটটি উৎক্ষেপ করেন সেটিই পৃথিবীর প্রথম জটিল যন্ত্রপাতিবাহী রকেট। এতে ছিল একটি তাপমান যন্ত্র, একটি বায়ুচাপমান যন্ত্র এবং একটি ক্যামেরা। তবে গাইরোস্কোপ বা ঘূর্ণায়মান যন্ত্র জুড়ে সাম্যতা বজায় রেখে প্রথম রকেটটি তিনি আকাশে তোলেন ২৮শে মার্চ ১৯৩৫-এ।

এদিকে ১৯১৭তে সোসেলিস্ট আন্দোলনের পর ওয়াই ভি কনড্রাত্যুক রকেট পরিচালনার ব্যাপারে কতকগুলি পরীক্ষা চালিয়ে ১৯২৯-এ জিওলকভসকির তত্ত্বকে পরিবর্দ্ধিত করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। সোভিয়েত দেশে প্রথম তরল জ্বালানি চালিত জেট ইঞ্জিন তৈরি করলেন সানডারস। গ্যাসোলিন এবং বাতাসে চালিত ও আর-১ ইঞ্জিনটি যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে কাজ করল। এর ঘাত ওঠে ১২০ পাউণ্ড পর্যন্ত। পরে সানডারসের তত্ত্বাবধানে গার্ড-১০ একটি শক্তিশালী রকেট তৈরি করা হল। এতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় অ্যালকোহল এবং তরল অক্সিজেন। ওজন ৬৫ পাউণ্ড।

লম্বা ৭'২ ফুট। ব্যাস ৫'৫ ইঞ্চি। এটি ৩'৪ মাইল পর্যন্ত ঊর্দ্ধাকাশে উঠেছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরীক্ষার দশ দিন পূর্বে পরলোক গমন করলেন সানডারস। নিজের সাফল্যটি আর দেখে যেতে পারলেন না।

তরল জ্বালানিতে চালিত রকেটের বৈশিষ্ট্য হল, বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ না করে এ কাজ করে। কারণ তরলের মধ্যেই জ্বালানি এবং জারক উভয়কেই নেওয়া হয়। ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের বাইরে যেখানে অক্সিজেন নেই সেখানেও যেতে কোন বাধা রইল না। ১৯৩০-এ একদল সোভিয়েত বিজ্ঞানী নাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রোজেন টেট্রোক্সাইড, হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, টেট্রানাইট্রোমিথেন এবং পারক্লোরিক অ্যাসিডের দ্রবন রকেট



১৯৩৩-এর সোভিয়েত রকেট

ইঞ্জিনের অক্সিজেন সরবরাহকরূপে ব্যবহার করার প্রস্তাব করেন। ঐ বৎসরেই ও. আর. এম-১ নামে সোভিয়েত দেশের প্রথম তরল জ্বালানির রকেট উৎক্ষেপ করা হয়। জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় গ্যাসোলিন এবং তরল অক্সিজেন। ঘাত ৪৪ পাউণ্ড। ১৯৩৩-এ আকাশে উঠল ও. আর. এম-৫০ এবং ও. আর. এম-৫২। ঘাত যথাক্রমে ৩৩০ এবং ৬৬১ পাউণ্ড। এর তিন বছর পর পরীক্ষা শুরু হয় ও. আর. এম-৬৫কে নিয়ে। জ্বলন কক্ষে এবার চাপ ওঠে প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ৪০০ পাউণ্ড।

অবশেষে ১৯শে মে, ১৯৩৯-এ সোভিয়েত দেশের প্রথম বহুস্তর বিশিষ্ট রকেট মহাকাশে তুলে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মারকুলভ। জিওলকভসকির মতে একমাত্র বহুস্তর বিশিষ্ট রকেটেই মহাকাশে পাড়ি দেওয়া সম্ভব। মারকুলভের পরীক্ষা এই প্রথম মহাকাশ যাত্রাকে সহজতর করার পথ-প্রদর্শন করল।

কিন্তু আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। এবার দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ। যে রকেট নিয়ে মানুষ একদিন পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডল এবং বিভিন্ন গবেষণার ক্ষেত্রে অবতরণ করেছিল, তাকে নিয়ে এবার শুরু হল সমর সজ্জা। নতুন ধরনের তাপ এবং উচ্চ চাপ সহ সংকর ধাতু তৈরি হল। পরীক্ষা চলতে লাগল আরও বিস্ফোরক জ্বালানির সন্ধানে, গতির পাল্লাকে বৃদ্ধি করার প্রয়াসে। এই সময়ে বিভিন্ন সংস্কারের মধ্যে দিয়ে যে দু'ধরনের রকেট সবচাইতে বেশি উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠল তারা হল ভি-২ এবং 'রাইনবোটে' অর্থাৎ 'রাইনের দূত'। যমদূত! এদের ক্ষেপনাস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

তবে 'রাইনবোটে' রকেটটি এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ৩৭ ফুট লম্বা এই ত্রি-স্তর রকেটকে ঠেলে তোলার জন্যে বুস্টারের ব্যবহার করা হয়। তবে জ্বালানি কঠিন। ডাইগ্লাইকল-ডাইনাইট্রেট।

তিনটি স্তরের একটির জ্বালানি শেষ হয়ে গেলে বিশেষ এক ধরনের বিস্ফোরক চূর্ণ এবং নাইট্রোগ্লিসারিনের সাহায্যে অপরটিতে আগুন ধরানোর ব্যবস্থা ছিল। অগ্রভাগের অংশটি লম্বায় ছিল তেরো ফুট। ব্যাস ৭৫ ইঞ্চি। এটিতে আগুন ধরার সাড়ে পঁচিশ সেকেণ্ডের মধ্যে গতিবেগ দাঁড়াত সেকেণ্ডে এক মাইল। দূরত্ব অতিক্রম করত ১৩৭ মাইল। আধুনিক মহাকাশযানে যে রকেট ব্যবহার করা হয় 'রাইনবোটে' তারই পূর্বপুরুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার পর যখন মহাকাশ গবেষণার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব লাভ করল, তখনই শুরু হল মহাকাশ যাত্রার আধুনিক যুগ। জুল ভার্ন-এর কল্পকাহিনীর বাস্তব চিত্রকররা এগিয়ে এলেন মানুষের বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নকে রূপ দিতে।

সেটা ১৯৪৯!

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী গাভিন ডু বিয়ার বলেছেন, 'বিজ্ঞান কখনও যুদ্ধ করে না'। ক্যাপ্টেন কুক যখন বৃটিশ পতাকাবাহী জাহাজ নিয়ে কুমেরু সাগর অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত তখন মার্কিন মুলুকের সঙ্গে বৃটেনের সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল ছিল। কুমেরুর দরিয়ায় যে কোন বৃটিশ জাহাজকে আক্রমণ কর, এই ছিল মার্কিন সরকারের নির্দেশ। কথাটা কানে যেতেই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন মার্কিন নৌবহরের প্রধানকে ডেকে বলে দিলেন, 'না। একজনকে বাদ দিতে হবে। তিনি ক্যাপ্টেন কুক। রাজনীতিবিদ্ নন, তিনি একজন বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণার কাজে বাধা দেওয়া ঠিক হবে না।' ফ্রাঙ্কলিনের আদেশ যথাযথ পালিত হয়েছিল। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সের সম্পর্কে যখন দারুণ ফাটল ধরেছে তখন দেখা গেছে প্রখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী জেনার ঐ দুই দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ভাব বিনিময় করে চলেছেন। এই সময়ে বিপর্যয়ের মধ্যেও হামফ্রি ডেভি প্যারিসে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিজস্ব কতকগুলি পরীক্ষা ফরাসী বিজ্ঞানীদের দেখান। এঁরা জানতেন রাজনৈতিক কুটিল-চক্র বিজ্ঞানীর সাধনাকে শুধু হত্যা করারই চেষ্টা করে না, পৃথিবীর মানুষকে বিরাট সম্ভাবনার শরিক হতে বঞ্চিত করে। রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বিজ্ঞানী

তাঁর আবিষ্কারের ভাষার মধ্যে যে সার্বজনীনতা লিপিবদ্ধ করে যান, তা চিরন্তন। তা বিশ্বজনীন।

সম্ভবতঃ একথাই বিস্মৃত হয়েছিলেন থার্ড রাইখ। আর তাতে রসদ যোগাচ্ছিলেন হাইনরিখ হিমলার। মহাকাশে রকেট পাঠিয়ে মৌলিক গবেষণা করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ফ্রান্সের সিবেরু রুমানিয়ার ওবার্থ, জার্মানির ডঃ ওয়ারনহার ফন ব্রাউন এবং আরও অনেকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কুটিল রাজনীতি তাকে বিধ্বস্ত করে ফেলল। রকেটের ডগায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আকাশে পাঠিয়ে যেটুকুও বা গবেষণার কাজ চালান হচ্ছিল, এবার ঘটল তার পরিসমাপ্তি। যন্ত্রপাতির পরিবর্তে রকেটের ডগায় চেপে বসল প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ। তৈরী হল গাইডেড মিসাইলস। ক্ষেপণাস্ত্র। প্রথমদিকে হিটলার রকেটের ব্যাপারে খুব আশাবাদী না হলেও পরে বুঝতে পেরেছিলেন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তাঁকে তৈরী করতেই হবে। লণ্ডনকে ধ্বংস না করতে পারলে তাঁর অস্তিত্ব মুছে যাবে এ পৃথিবী থেকে।

১৯৪০-এর মধ্যে পিনেমুঁদ-এ তৈরী হয়ে গেল এ—৪ রকেট। তবে হিটলার এ ব্যাপারে খুব আশাবাদী হলেন না কিন্তু তাঁর অন্যতম সেনাপতি ডনবারজার হাল ছাড়লেন না। বহু বিজ্ঞানীকে জবরদস্ত এখানে ধরে আনা হয়। তাঁদের নামের তালিকা দীর্ঘ বলে আর উল্লেখ করলাম না। এঁদের অনেকেই নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। বিজ্ঞানীদের নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আর চোখে পড়ে না।

কিন্তু ফ্যাসাদ হল ডঃ ফন ব্রাউন, যখন জার্মানের পতন আসন্ন হয়ে উঠল। বিজ্ঞানীদের অনেকেই এর মধ্যে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। অনেকেই আর হিটলারের উন্মাদনার খোরাক যোগাতে

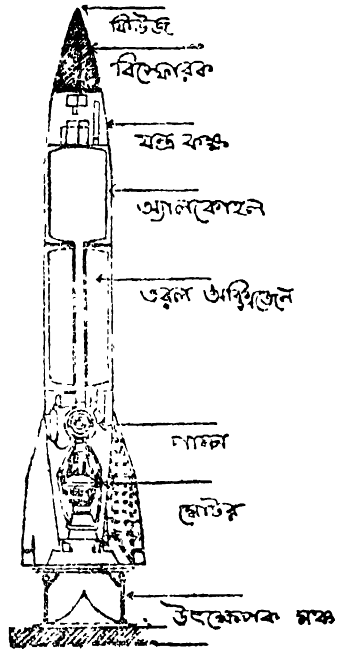
চাইলেন না। ডঃ ফন ব্রাউন তাঁদের মধ্যে পড়লেন। ১৯৪৪ এর মার্চে ডঃ ফন ব্রাউন এবং অপর দুজন ইঞ্জিনিয়ার ক্লস রাইডেন এবং হেলমুখ গ্রুওট্রাপকে গেস্টাপোরা বন্দী করলেন। অভিযোগ—তাঁরা এ—৪ রকেটের ব্যাপারে অন্তর্ঘাতী কাজ করেছেন। যা করতে বলা হয়েছিল তা না করে এতদিন তাঁরা মহাকাশ গবেষণার ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে এসেছেন। শাস্তি প্রাণদণ্ড।

আসলে ১৯৪৩-এ হিমলার ফন ব্রাউনকে গোপনে ডেকে এস এস অর্থাৎ হিটলারের দেহরক্ষী বাহিনীর জন্যে কাজ করতে বলেছিলেন। কিন্তু ফন ব্রাউন তাতে সাড়া দেন নি। খবর পেয়েই ডনবারজার ছুটে এলেন এস এস বাহিনীর সেনাপতি মুলারের কাছে। মুলারকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, ওঁদের বিচার করার ক্ষমতা গেস্টাপোদের এক্তিয়ারে পড়ে না। তা ছাড়া যে প্রোজেক্টে তিনি হাত দিয়েছেন তাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে ওঁদের চাই। মুক্তি পেলেন ফন ব্রাউন এবং অপর দুজন ইঞ্জিনিয়ার।

আর তার পরই পিনেমুঁদের আকাশ ভেদ করে উঠল অব্যর্থ এবং অমোঘ সেই বিভীষণ অস্ত্র। ইতিহাসে তার পরিচয় ভি-২। বৃটেনের কাছে হিটলার রকেট।

এ-৪-এর রকেটের পরবর্তী সংস্করণ ভি-২। সূচলো এর ডগাটি নমনীয় লোহা দিয়ে তৈরী হল। একের চার ইঞ্চি পুরু এবং একটন ওজনের এই আধার পূর্ণ করা হত অ্যামাটল নামে এক ধরনের অত্যন্ত বিস্ফোরক পদার্থে। সম্মুখভাগে থাকল ফিউজ, যাতে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে চাপ পড়ে বিস্ফোরণ ঘটে। সূচলো অংশের নিচে যন্ত্র-কক্ষ। যার কাজ রকেটটিকে ঠিকমত চালিত করা। ইস্পাতের তৈরী কয়েকটি নলের মধ্যে উচ্চ চাপের নাইট্রোজেন গ্যাস ভর্তি করে রেখে দেওয়া হল এই কক্ষে। এর কাজ নিচের জ্বালানি কক্ষে চাপ সৃষ্টি করে জ্বালানি চলাচলে সাহায্য করা। যন্ত্র-কক্ষের নিচে

রকেটের বৃহত্তম অংশ জ্বালানি কক্ষে রাখা হল অ্যালকোহল। তার নিচে তরল অক্সিজেনের আধার। এই আধারটির নিচে একটি পাম্প-যন্ত্র বসান হল যার কাজ অ্যাল-কোহল এবং তরল অক্সিজেনকে একত্রিত করে প্রজ্জ্বলন কক্ষে পাঠিয়ে দেওয়া। এই পাম্পটিকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলা হয় যাতে সেকেণ্ডে এটি পঞ্চাশ গ্যালনেরও বেশি জ্বালানিকে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে তিনশ পাউণ্ড চাপে পাম্প করতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য গডার্ড তাঁর পুরনো একটি পেটেণ্টে এ ধরনের পাম্পের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ওবার্থও এই ধরনের পাম্প তৈরী করার ব্যাপারে ভীষণভাবে চেষ্টা করেছিলেন। পাম্পের পর জ্বালানি গিয়ে পড়ে রকেট-মোটরে এবং সেখানে মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সরু নলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘাত সৃষ্টি করে ভি-২কে ঠেলে তোলে আকাশে।



যথেষ্ট গোপনীয়তা সত্ত্বেও ভি-২-এর সংবাদ চেপে রাখা গেল না বৃটিশ গোয়েন্দা দপ্তরের কাছ থেকে। জার্মানি যে দারুণ একটা কিছু করছে সেটা বুঝতে তাদের অসুবিধে হল না। আর সেই গুপ্ত রহস্যটি জানার আশায় মাকড়সার জাল ফেলে তৎপরতার সঙ্গে চেষ্টা করতে লাগলেন তাঁরা।

বৃটিশের ভাগ্যে তখন বৃহস্পতি। সুযোগ মিলে গেল, না

চাইতেই। এলো পাথাড়ি পরীক্ষা চালাতে গিয়ে ১৯৪৪-এর জুন মাসে একটি ভি-২ গিয়ে পড়ল সুইডেনের কালমারে। সুইডেন তখন নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই ঘটনায় দারুণ চটে গিয়ে প্রতিবাদ জানাল জার্মানির কাছে। বৃটিশ দপ্তর খবরটা পেয়ে অনুরোধ করলেন, ভি-২ এর অংশগুলি তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে তাঁদের দেন। সুইডেন রাজী হয়ে গেল। আর জার্মানির সেই অমোঘ অস্ত্রের ভগ্নাবশেষ নিয়ে একটি সি-৪৭ ডাকোটা বিমানে লেফটেনাণ্ট কলোনেল কাইথ এন অ্যালেন এসে উপস্থিত হলেন লণ্ডনে। পিনেমুঁদের অন্ধকার ছেড়ে এই প্রথম ভি-২ এসে পড়ল সর্বসাধারণের সম্মুখে। তরল জ্বালানির এই রকেটটিকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা ছিল।

ইতিমধ্যে পাল্লা এবং সক্রিয়তার ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দিল ভি-২। ১৯৪৪-এর ৬ই সেপ্টেম্বর ভি-২-কে প্রথম আকাশে তোলা হল শত্রু নিধনের কাজে। লক্ষ্য প্যারিস। পরবর্তী আক্রমণ চলে লণ্ডনের ওপর। উৎক্ষেপ করা হয় হেগ থেকে। অবশেষে মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার অন্তিমে ১৯৪৫-এর ৫ই মে পিনেমুঁদ দখল করে ফেললেন দ্বিতীয় শ্বেত-রুশ সেনাদলের অধ্যক্ষ কনসতানতিন কে রোকোসে ভস্কি। এঁর বক্তব্য, এই অবরোধের ফলে ভি-২র অনেক কিছুই তাঁদের হস্তগত হয়। বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির বহু বিজ্ঞানী এবং কুশলী কিছু রাশিয়ায় এবং কিছু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দেন। এর পরবর্তী কয়েক বৎসর উভয় দেশই বিভিন্ন প্রকার রকেটের ওপর নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেও স্পুতনিক-১ এর আকাশে উৎক্ষেপের পূর্বে সোভিয়েত-কার্যাবলী সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ বাইরের জগত তেমন বিশেষ জানতে পারে নি। সম্ভবতঃ সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের সাবধানী মন এবং প্রচার বিমুখতাই এর প্রধান কারণ। তাছাড়া তাঁদের মোটামুটি কার্যসূচী প্রকাশিত হত রুশ ভাষায়। তাকে যথাযথ অনুবাদ করে প্রচার করার ব্যাপারে পাশ্চাত্য জগতের

কিছুটা শৈথিল্যও ছিল। তবে ১৯৫৬-র মধ্যে অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন রকেট বিজ্ঞানে সোভিয়েত দেশ বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অনেক বড় এবং শক্তিশালী রকেট তাঁরা তৈরী করে ফেলেছেন।

মহাকাশ মানুষকে যুগ যুগ ধরে আকর্ষণ করেছে। অন্ধকার আকাশে কোটি কোটি আলোক, বহু বৎসর ধরে দূর থেকে যে নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে, কি তাদের স্বরূপ? নক্ষত্রের জন্ম-রহস্য কোথায়? মেঘহীন আকাশে চিক চিক করে যে আলোর আভা চোখে পড়ে তার কারণ কি? পৃথিবীকে ঘিরে যে আবহাওয়া মণ্ডল বিচরণ করছে কে তার নিয়ন্ত্রক? এমন হাজারো জিজ্ঞাসা নিয়ে মাটির বুকে দূরবীক্ষণ যন্ত্র বিছিয়ে শত সহস্র বিজ্ঞানী আকাশ রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে এসেছেন দীর্ঘকাল। কিন্তু কাচের লেন্সকে ঝাপসা করে দিয়েছে মেঘমালা, নৈসর্গিক বহু অসুবিধের কাছে জ্যোতির্বিদ পরাজিত হয়েছেন। অনেক রহস্যই অবশেষে না জানা থেকে গেছে মানুষের চিন্তাপটে।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতুর আবিষ্কর্তা ডঃ এডমণ্ড হ্যালি বলেছিলেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল ঊর্দ্ধাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রথম নয় মাইল স্তরের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে কমের দিকে। পরবর্তী আঠারো মাইল স্তরের তাপমাত্রা মোটামুটি স্থির এবং অত্যন্ত কম। শেষ আঠারো মাইল ঊর্দ্ধাকাশে বায়ুমণ্ডল খুবই হাল্কা এবং শীতল। অধুনা আবিষ্কৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই সেদিন যে কথা হ্যালি বলেছিলেন, তা অংশত সত্য। আর এই বায়ুমণ্ডলের রহস্য জানার জন্যেই ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর ডঃ জন জেফ্রিস লণ্ডন থেকে তাপমান যন্ত্র, চাপমান যন্ত্র এবং ছয়টি বোতল জলে পূর্ণ করে সর্বপ্রথম ঊর্দ্ধাকাশে

গিয়ে পরীক্ষা চালান। ওপরে ওঠার সময় এক একটি বোতলের জল ফেলে দিয়ে তিনি সংগ্রহ করেন সেখানকার বাতাস। এই পরীক্ষায় বিভিন্ন স্তরের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য জানা যায়। ১৮৪৭-এ সিভেল এবং ক্লেসে-স্পিনেল্লি বেলুনে চড়ে ২৪২৭০ ফুট উর্দ্ধাকাশ থেকে ঘুরে আসেন। এর পরবর্তী বৎসরে জেনিথ নামে আর একটি বেলুনে নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি নিয়ে এবং গ্যাস্টন জিসাণ্ডায়ের নামে আর একজন সঙ্গীর সঙ্গে ওঠেন ২৯০০০ ফুট পর্যন্ত। কিন্তু নেমে আসার পর দেখা গেল একমাত্র জিসাণ্ডায়েরই জীবিত রয়েছেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল উ াকাশের আবহাওয়াকে জানা।

এরপর ঠিক হয় মানুষ না পাঠিয়ে বেলুনে বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্র পাঠান হোক। কথাটা বললেন ব্রিসেনে নামে জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানী। ফ্রান্সে গুস্তভ হারমাইট, জার্মানিতে আজামন, ডেনমার্কে ওল্যাণ্ড পরে যন্ত্রের সাহায্যে উর্দ্ধাকাশের তথ্য সংগ্রহ করেন। ১৯২৫-এ অধ্যাপক পিতর এ মলচানফ সাইবেরিয়ার বেতারে তথ্য সরবরাহক যন্ত্রের সাহায্যে যুগান্তকারী তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। আর এই অগ্রগতির ধাপ ধরে একই আকাশ রহস্য সংগ্রহের কাজে লাগান হল ভি-২ রকেটকে। ১৯৪৮-এর মধ্যে উর্দ্ধাকাশে ওঠার পর প্যারাস্যুটের সাহায্যে ভি-২-এর ডগায় রাখা যন্ত্রপাতিগুলি পুনরুদ্ধারের কাজও সম্ভব করে তোলা গেল।

ইতিমধ্যে গডার্ডের পরিচালনায় নানাভাবে গবেষণার কাজ চলতে থাকে এবং অনেকের মনেই এই আত্মবিশ্বাস জন্মায় একদিন ঐ রকেটে চড়েই মহাকাশে পাড়ি দেওয়া মানুষের পক্ষে আর তেমন শক্ত হবে না। ১০ই আগস্ট, ১৯৪৫-এ ডঃ গডার্ডের অত্যন্ত আকস্মিকভাবে লোকান্তর ঘটলেও কাজ পুরোদস্তুর এগিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে ভি-২র অনুকরণে তৈরী করা হল রকেট

ভাইকিং। এবার লক্ষ্য হল মূলতঃ তিনটি। এক, জোরাল রকেট তৈরী করা। দুই, উর্দ্ধাকাশ সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য সংগ্রহ করা। তিন, নতুন জ্বালানি সম্পর্কে গবেষণা করা। এ ছাড়াও শক্ত করে উৎক্ষেপণ ক্ষেত্র তৈরী করার চেষ্টাও চলতে লাগল। এই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাঁরা বিভিন্ন ভাবে গবেষণায় লিপ্ত হয়ে আধুনিক মহাকাশ যাত্রাকে সুগম করেছেন তাঁরা হলেন মিলটন ডাবলিউ রোজেন, কারল হ্যারিসন স্মিথ, জেমস ব্রিজার প্রভৃতি।

১৯৪৭-এ ভাইকিং এবং এয়োরবি রকেটের নাম প্রকাশ করলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম এবং তার পরবর্তী দুই বৎসর এদের নিয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হয়। অবশেষে ১৯১৫-তে একটি অদ্ভুত পরীক্ষা চালান হয়েছিল এয়োরবির সাহায্যে। সেবার একটি এয়োরবির মধ্যে দুই পাউণ্ড সোডিয়াম ধাতু পুরে নেওয়া হয়েছিল। সূর্যাস্তের কুড়ি মিনিট পর রকেটটিকে উর্দ্ধাকাশে উৎক্ষেপ করা হয়। তারপর রেডারের সাহায্যে যখন জানা গেল রকেটটি চল্লিশ মাইল দূরে চলে গেছে তখন নিচে থেকে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে সেই সোডিয়ামকে বাষ্পে পরিণত করে আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হতে থাকে। এয়োরবিটি উঠেছিল সত্তর মাইল। সেই সঙ্গে সৃষ্টি করেছিল সোডিয়াম বাষ্পের স্তম্ভাকৃতি মেঘ। প্রায় তিনশ' মাইল দূর থেকে এই মেঘ অনেকে দেখেছে। এই পরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উর্দ্ধাকাশে বাতাসের গতি-প্রকৃতি জানা। ১৯৫৬-তে আর একটি এয়োরবি অদ্ভুত একটি তথ্য পাঠাল উর্দ্ধাকাশের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে। আমাদের চারপাশে যে বাতাস রয়েছে তার মধ্যেকার অক্সিজেন অণু গঠন করে থাকে। অর্থাৎ সব সময় দুইটি অক্সিজেন পরমাণু একত্রে মিলিত হয়ে অবস্থান করে। রাসায়নিক নিয়মে এটাই বিধেয়। কিন্তু উর্দ্ধাকাশে সূর্যরশ্মি বাতাসের সেই অণুকে

ভেঙে পরমাণুতে পরিণত করে। সেখানে তাই পারমাণবিক অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি। কিন্তু নাইট্রিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে সেই পারমাণবিক অক্সিজেন মিলিত হয়ে আণবিক অক্সিজেন প্রস্তুত করে। এখানে নাইট্রিক অ্যাসিডের কাজ কেবলমাত্র ঐ বিক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তার করা। বিক্রিয়াটি চলার সময় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দেখা যায়। মেঘমুক্ত রাতের আকাশে আমরা যে মাঝে মাঝে চকিত প্রভা দেখি সেটাই এই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। এয়োরবির ডগায় কিছু অ্যাসিড পুরে প্রায় ষাটমাইল উর্দ্ধাকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রচুর অ্যাসিড এক সঙ্গে পাওয়ায় এক সঙ্গে এত বেশি পার-মাণবিক অক্সিজেনের রূপান্তর ঘটে যে তার ফলে পনেরটি চাঁদের মত উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত আকাশ আলোকিত হয়ে ওঠে। এই পরীক্ষা উর্দ্ধাকাশের আবহাওয়া সম্পর্কে নতুন তথ্যের সন্ধান যোগাল। পরবর্তীকালে এই তথ্য নানাভাবে নভচরদের সাহায্য করেছে।

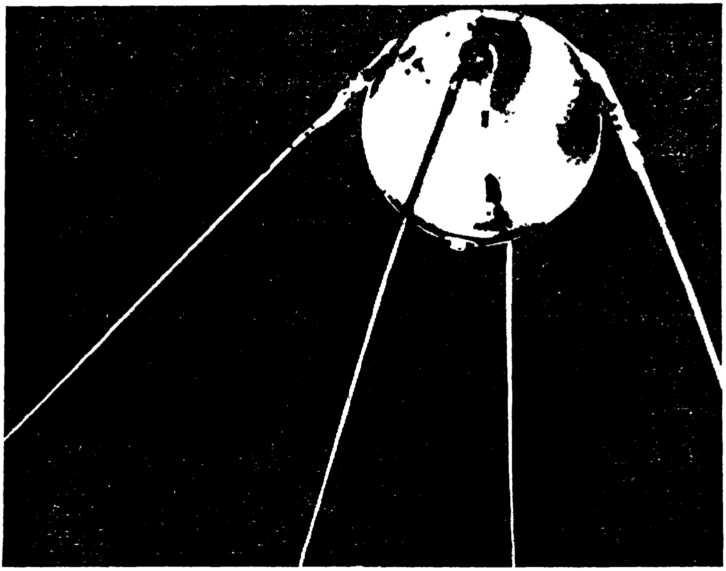
বস্তুত, ১৯৪৯ থেকে সোভিয়েত দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই রকেটের পাল্লা যথেষ্ট বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। রকেট চলার পথে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব, বায়ুমণ্ডলের বাধা এবং কি ভাবে মাটি থেকে বেতার যন্ত্রের সাহায্যে তার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা যায় তার অনেক কিছুই জানা হয়ে গেল ১৯৫৬-র মধ্যে। তবে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের কাহিনী তখনও অজানা। মহাকাশে মানুষের বিচরণ তখনও দূর অস্ত !

বিপ···বিপ···বিপ···

জডরেল ব্যাঙ্কের নিউফিল্ড রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি ল্যাবোরেটরির অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিও-টেলিস্কোপ মার্ক-১ তখন মহাকাশের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে। তার দু'শ পঞ্চাশ ফুট ব্যাসের বেতারচক্ষুর উপর ঠিকরে এসে পড়ল চাঞ্চল্যকর এক নতুন বেতার সংকেত। তরঙ্গ দৈর্ঘ কুড়ি ফুট। প্রতি সেকেণ্ডে সেই তরঙ্গ চল্লিশ লক্ষবার কম্পিত হচ্ছে। আর অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে কথা বলে চলেছে ঃ বিপ···বিপ···বিপ···। জডরেল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ এবং বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডঃ বারনার্ড লোভেল রীতিমত বিস্মিত, পুলকিত, রোমাঞ্চিত! পাঁচশ ষাট মাইল দূর থেকে ভেসে আসা সেই অভিনব বেতার সংকেত সেদিন সারা পৃথিবীর একমাত্র চমকপ্রদ ঘটনা! বিপ···বিপ···বিপ···মহাকাশ থেকে আগত এই বাণী যেন মানব ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

অক্টোবর ৪, ১৯৫৭। সেদিন পৃথিবীর প্রতিটি সংবাদপত্রের হেড লাইন ঃ সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশের কক্ষপথে স্থাপন করলেন স্পুতনিক—১। মানুষের তৈরি প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পঁয়ষট্টি ডিগ্রী উত্তর আকাশে বিচরণ করছে। আর তার বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে অবিরাম বিপ···বিপ···বিপ···। মার্কিন মুলুকের অন্যতম টেলিভিশন

সংস্থা এন বি সি সংক্ষেপে এই সংবাদটি পরিবেশন করার পর মন্তব্য করলেন, 'শব্দটা যেন একটি ঝিঁ ঝিঁ পোকার ধরা গলার ডাক।

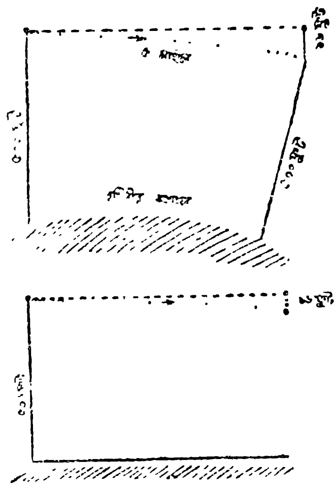


স্পুতনিক-১

অথবা ব্যাঙের ঢিমে তালে গান'। আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সাফল্যে বিস্মিতও যেমন হয়েছিল, সেই সঙ্গে ভীতও। পৃথিবীর হাটে মর্যাদার লড়াই-এ এ যেন তার প্রচণ্ড পরাজয়।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে তখন অদম্য কৌতুহল। সকলের মুখেই এক জিজ্ঞাসা ঃ একশ চুরাশি পাউণ্ডের অত বড় গোলকটি কি করে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে চলেছে? নতুন এই চাঁদ কি আমাদের পুরনো চাঁদের মত আলো দিতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, হ্যাঁ, পারে। কিন্তু চাঁদের মত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাটা? বিজ্ঞানীরা বললেন, এতো বহু পুরনো কথা। নিউটনই তো বলেছিলেন চাঁদ কি করে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।

বস্তুতঃ, ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা গ্রন্থে উপগ্রহের কক্ষপথ নিয়ে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছিলেন গাণিতিক হিসেব ধরে। তাঁর মূল তত্ত্বটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে প্রতিটি বস্তুকে আকর্ষণ করে। এই টানের ফলে কাছাকাছি ঊর্ধ্বাকাশ থেকে প্রতিটি বস্তু সেকেণ্ডে ষোল ফুট করে পথ নেমে আসে। কিন্তু পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বাকাশের দূরত্ব যত বাড়তে থাকে বস্তুর ওপর টানও সেই অনুপাতে কমে যায়। তখন আর সেটিকে প্রতি সেকেণ্ডে ষোল ফুট করে নেমে আসতে হয় না। মনে করুন একটি বস্তুকে পাঁচশ ফুট উঁচু থেকে সেকেণ্ডে এক হাজার ফুট গতিবেগে ছোঁড়া হল ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল পথে। এক্ষেত্রে এক সেকেণ্ড পর বস্তুটির এক হাজার ফুট সরল পথ অতিক্রম করার কথা। কিন্তু পৃথিবীর টানের দরুন বস্তুটি সরল পথে না গিয়ে একটি বক্রপথে যাবে এবং যাত্রার শেষ প্রান্তে ষোল ফুট দূরত্ব বরাবর ভূ-পৃষ্ঠের দিকে নেমে আসবে। আর এমনি করে অগ্রসর হতে গিয়ে ক'য়েক সেকেণ্ড পর একেবারে মাটির বুকে এসে ঠিকরে পড়বে.…এবার ধরুন, ঐ একই বস্তুকে পাঁচশ ফুট উঁচু থেকে আগের মতই আবার ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল পথে ছোঁড়া হল। তবে গতিবেগ সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল। এবার বস্তুটি এক সেকেণ্ড পর যখন বক্রপথে পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দেবে তখন দেখা যাবে যাত্রামুহূর্তে সেটি যেখানে ছিল সেখান থেকে লম্ব বরাবর



ষোল ফুট দূরত্ব নিচে নেমে এলেও তার গতিপথটি ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় সমান্তরালই আছে। কারণ পৃথিবীর পিঠও বক্র এবং প্রতি পাঁচ মাইলে তার গতি প্রায় ষোল ফুটের মত। ফলে বস্তুটি একটি বৃত্তাকার পথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে উপগ্রহের মত। নিউটন এই গতিবেগের নাম দেন সারকুলার ভেলোসিটি বা বৃত্তীয় গতিবেগ।

কিন্তু পৃথিবীর কাছ থেকে এত প্রচণ্ড গতিবেগে চলায় সবচাইতে বড় বাধা হল বায়ুস্তর। বাতাসের ঘর্ষণে বস্তুটির গতিবেগ কমে যায় এবং অবশেষে কক্ষচ্যুত হয়ে আবার ভূ-পৃষ্ঠের ওপর নেমে আসে। তাছাড়া বাতাসের প্রবল ঘর্ষণের ফলে উত্তপ্ত হয়ে বস্তুটি পুড়েও যেতে পারে। নিউটন বললেন, বাতাসের হাত থেকে বাঁচানর জন্যে উপগ্রহকে অন্ততপক্ষে একশ পঞ্চাশ মাইল ঊর্দ্ধাকাশে বিচরণ করতে হবে। এতটা ওপরে তুলেই তাকে ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল করে নিক্ষেপ করা দরকার। এখানে বাতাস হাল্কা। তাই ঘর্ষণ কম হবে। তাছাড়া পৃথিবীর টানও কমে যাওয়ায় সেকেণ্ডে আর ষোল ফুট করে পথ নেমে আসতে হবে না। ফলে বৃত্তীয় গতিবেগও কম হলে চলবে। পরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এক হাজার মাইল উপরে বৃত্তীয় গতিবেগ সেকেণ্ডে ৪·৪ মাইল হলেই চলে। আর তা ২·৯ মাইলে গিয়ে দাঁড়ায় ৭৭০০ মাইল ঊর্দ্ধাকাশে। অতএব তত্ত্বের দিক থেকে মহাকাশে কৃত্রিম-উপগ্রহ স্থাপন করা তেমন কোন কঠিন ব্যাপার ছিল না।

তবু দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয়েছে সত্যিকার সাফল্যের অপেক্ষায়। অবশেষে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন জিওলকভসকি, ১৯৫৭তে তা বাস্তবে রূপান্তরিত হল। চল্লিশ লক্ষ কম্পনাঙ্কের বেতার তরঙ্গ বিপ···বিপ···বিপ···শব্দ তুলে জানিয়ে দিল, মানুষও চাঁদ তৈরী করতে পারে।

কিন্তু আতলানতিকের ওপারে এই সাফল্য প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওবার্থ, ডঃ ফন ব্রাউন প্রমুখ বিশ্বখ্যাত রকেট্ বিজ্ঞানীরা চলে এসেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ইতিমধ্যে এঁদের পরিচালনায় সুদূর মহাকাশে রকেট পাঠানর ব্যাপারে কাজও হয়েছিল যথেষ্ট। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, একদিন তাঁরাই মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করার গৌরব অর্জন করতে পারবেন। স্প্ুতনিক-১ সেই আকাঙ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করল। আর সেই সঙ্গে শুরু হল রুশ-মার্কিনী মহাকাশ গবেষণার এক দারুণ প্রতিযোগিতা।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ব্রিটেনের অক্সফোর্ডে সুদূর মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে কিভাবে গবেষণা চালান যায় তার ওপর একটি আলোচনাচক্র বসে। উপস্থিত বহু বিজ্ঞানী সেদিন রুদ্ধশ্বাসে সে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করলেও অনেকেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু আবার তার পুনরাবৃত্তি করা হল ১৯৫৪-তে রোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসর সম্মেলনে। ভূ-পদার্থ বৎসর কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডল, মহাকাশের সুদূরতম অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক সমস্যা প্রভৃতির ওপর গবেষণা চালান। কিন্তু সেদিনও কেউ মনে করতে পারেন নি, কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করা খুব সহজ কাজ হবে। অবশেষে ১৯৫৫তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম প্রকাশ করলেন প্রোজেক্ট ভ্যানগার্ডের কথা। বলা হল, ১৯৫৮-র মধ্যে তাঁরা কুড়ি পাউণ্ড ওজনের কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করবেন। দু বছর ধরে চলল দারুণ প্রচারকার্য। ভ্যানগার্ডের রকেটটি কেমন হবে, উপগ্রহই বা কিভাবে আবর্তন করবে, কি কি অসুবিধের সম্মুখীন হওয়া সম্ভব, এমন নানান ব্যাপারের ওপর চলল হাজারো আলোচনা। অথচ একদিকে যখন সাজ-সাজ রব, তখন ভল্গা নদীর চারপাশের

মানুষরা নীরব। এই সময়ে সোভিয়েত দেশ রুশ ভাষায় শুধু একটি সংবাদ পরিবেশন করল: ১৯৫৭-৫৮-তে মহাকাশে কৃত্রিম-উপগ্রহ উৎক্ষেপ করা হবে। ব্যাস, এরপর আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

তবে ভ্যানগার্ডের ব্যাপারটা সোভিয়েত বিজ্ঞান-পত্র 'এভিয়েশন উইক'-এ আলোচনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক কাইরিল স্টান্যুকোভিচ একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, 'পশ্চিমী সংবাদপত্রে আপাতত যে ধরনের কৃত্রিম উপগ্রহের কথা বলা হচ্ছে, তার চেয়েও বড় উপগ্রহ তৈরী করা তেমন কঠিন কিছু নয়'। এতে পরিষ্কার বোঝা গেল, সাড়াশব্দ না করলেও সোভিয়েত দেশ একেবারে থেমে নেই। অথচ ১৯৫৫তে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসর বৈঠকে তাঁরা বলেছিলেন, আপাতত কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের কোন পরিকল্পনা তাঁদের নেই। কিন্তু ১৯৫৬-র মাঝামাঝি কানাঘুষায় শোনা গেল, তাঁরা অত্যন্ত শক্তিশালী দূরপাল্লার রকেট তৈরীর কাজ শেষ করে ফেলেছেন। সেই সঙ্গে মহাকাশ গবেষণার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিও। আর তারপরই ১৯৫৭র ১০ই জুন রুশ কর্তৃপক্ষ বেলজিয়ামে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৎসর সংস্থার প্রধানকে একটি নোটে জানালেন তাঁরা প্রস্তুত। ভূ-পদার্থ বৎসরের গবেষণার অংশ রূপে তাঁরা ঐ বছরেই মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করবেন। ৩রা আগষ্ট রয়টার সংবাদ দিল, অধ্যাপক এভজেনি ফাইয়েডেরেভকে সোভিয়েত দেশের কৃত্রিম উপগ্রহ সংস্থার প্রধানরূপে নির্বচিত করা হয়েছে।

অবশেষে ১৯৫৭র ৪ঠা অক্টোবর। গ্রিনিচ মিন টাইম সন্ধ্যে সাতটা বেজে আটতিরিশ মিনিট। স্পুতনিক-১ সত্যি সত্যিই মহাকাশের বুকে বিচরণ করতে লাগল। আর সেদিন নৈশ্য-ভোজের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মহাকাশ বিজ্ঞানী ডঃ ফন ব্রাউন খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দিলেন, রাশিয়ানরা এমন একটা যে কিছু

করবেন, এ তিনি আগে থেকেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। এই সঙ্গে আরও বললেন, লালফিতের বাঁধনে আমাদের আটকে রাখা হয়েছে। ভগবানের দোহাই, বাঁধনটা একটু আল্গা করুন। তাহলে আগামী ষাট দিনের মধ্যে আমরাও আকাশে নতুন চাঁদ পাঠাতে পারব। শুধু সবুজ সংকেতটি দিন, আর ষাট দিন সময়।

ডঃ ফন ব্রাউনের এই আবেদন গ্রাহ্য হয় এবং তার কয়েক সপ্তাহ পরই মার্কিনী কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে বিচরণ করতে থাকে। তবে তুলনায় অনেক ছোট।

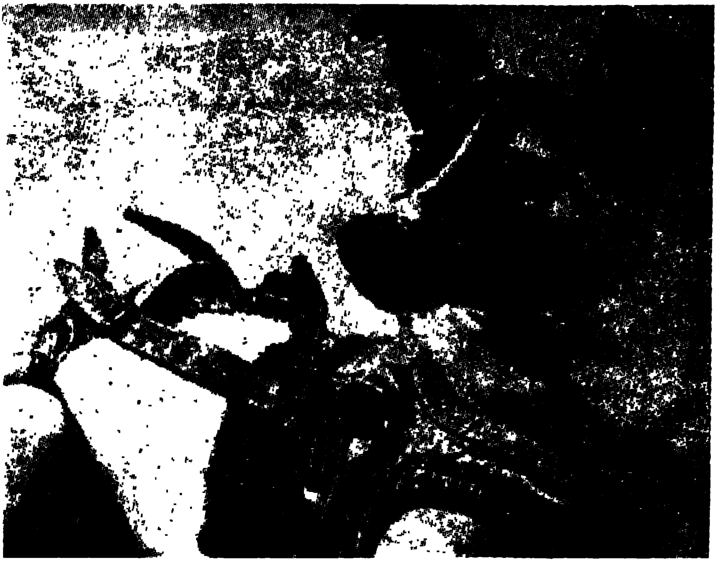
স্পুতনিক-১কে কি ধরনের রকেটের সাহায্যে মহাকাশে উৎক্ষেপ করা হয়েছিল, সে খবর এখনও অজানা। তবে আকাশে উঠেই উপগ্রহটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সম্মুখ ভাগে থাকে তেইশ ইঞ্চি ব্যাসের ১৮৪ পাউণ্ড একটি গোলক। এরই নাম স্পুতনিক-১। এর সঙ্গে লাগান ছিল বেতার প্রেরক যন্ত্র। আর স্পুতনিক-১ এর পেছনে চলতে থাকে যার সাহায্যে সেটিকে উৎক্ষেপ করা হয় সেই রকেটটি। গোলকের সম্মুখে একটি ছুঁচলো চোঙার মত অংশও একই সঙ্গে পৃথিবী পরিক্রমন করতে থাকে। আকাশে ওঠার সময়ে বাতাসের ঘর্ষণ জনিত তাপে যাতে স্পুতনিক-১ পুড়ে না যায় তার জন্যেই গোড়ার দিকে এই ছুঁচলো চোঙাটি ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্রথমদিকে প্রতি ৯৬.২ মিনিটে স্পুতনিক-১ পৃথিবীকে একবার করে প্রদক্ষিণ করতে থাকে একটি উপবৃত্তীয় কক্ষপথে। প্রথম দিকে স্পুতনিক-১কে অনেকেই দেখতে পান নি। ফলে, গুজব রটে সব ভাঁওতা। কোন কৃত্রিম উপগ্রহই সোভিয়েত দেশ আকাশে তুলতে পারে নি। অনেকে বলল, যদিও তুলে থাকে তার ওজন ১৮৪ পাউণ্ড নয়, ১৮.৪ পাউণ্ড। কিন্তু ১৯৫৭-র ৬ই অক্টোবর ইণ্ডিয়ানার টেরহাউট-এর একদল বিজ্ঞানী খবর দিলেন, তাঁরা নাকি

স্পুতনিক-১ কে দেখতে পেয়েছেন। ৮ই অক্টোবর সিডনি এবং অস্ট্রেলিয়ার উওমেরা চন্দ্র-পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে জানান হয়, ইণ্ডিয়ানার বিজ্ঞানীরা ঠিকই বলেছেন। তাঁরাও স্পুতনিক-১ দেখতে পেয়েছেন। উপবৃত্তীয় পথে ঘোরার সময় এটি যখন পৃথিবীর নিকটতম স্থানে বিচরণ করে তখন দূরত্ব থাকে ১৩৬ মাইল এবং দূরবর্তীতম স্থানে সরে গেলে এই দুরত্ব দাঁড়ায় ৫৮৫ মাইল। পরে বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে স্পুতনিক-১এর গতিবেগ ক্রমেই কমে আসতে থাকে। ওদিকে রাসায়নিক তড়িৎ-কোষের ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সেই বিপ···বিপ···বিপ···শব্দও দিন সাতেকের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। শেষে ১৯৫৮র ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে শেষবারের মত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে স্পুতনিক-১ বায়ুমণ্ডলের চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

প্রথম সাফল্যের উত্তেজনা না কাটতেই আবার চমক। মাত্র একমাস পরে ওরা নভেম্বরে সোভিয়েত দেশ আকাশে তুলল স্পুতনিক-২। আরও বড়। ওজন ১১২০ পাউণ্ড। শুধু জটিল যন্ত্রপাতিই নয়। এবারকার উপগ্রহকে সত্যি সত্যিই একজন যাত্রী গিয়ে দখল করে বসল। মহাকাশের বুকে প্রথম নভচর লাইকা মানুষের তৈরী কৃত্রিম উপগ্রহে বসে বিচরণ করতে লাগল। লাইকা কুকুর হলেও একজন দক্ষ বিজ্ঞানীর মত মহাকাশের নিয়ম মেনে কাজ করল। উপগ্রহের কক্ষে বিশুদ্ধ বাতাস রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্যে। বিশেষ এক ধরনের পর্দার সাহায্যে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আর জিলেটিনের মত এক ধরনের খাবারের সাহায্যে তাকে সুস্থ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তার দৈহিক, মানসিক এবং কাজকর্মের যাবতীয় খবর বেতার-সংকেতের সাহায্যে পৃথিবীর গবেষণাগারে নিয়মিত পৌঁছতে থাকে। মোট কথা মহাকাশে মানুষের নিরাপত্তার জন্যে যা যা তথ্য দরকার তার অনেক কিছুই

সরবরাহ করল লাইকা। অবশেষে অক্সিজেন গেল কমে। হয়ত বা সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে দৈহিক ক্ষমতাও লোপ পেল। কয়েকদিন



(মহাকাশে প্রথম নভচর—লাইকা)

মাঝে মাঝে যে বহু আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠস্বর বিজ্ঞানীদের সদা ব্যস্ত করে রেখেছিল একদিন আর তা শোনা গেল না। মুহূর্তে মহাকাশের বেতারবার্তা জানিয়ে দিল 'লাইকা আর নেই'! প্রথম নভচর লাইকা। মহাকাশ যাত্রার প্রথম সংগ্রামী লাইকা। মহাকাশেই সে প্রথম শহিদ হয়ে গেল।

স্পুতনিক-২এর পরীক্ষায় সূর্যের বিকিরণ ক্ষমতা, মহাজাগতিক রশ্মির মাত্রা এবং ঊর্দ্ধাকাশে বাতাসের চাপের ওপর অনেক নতুন তথ্য পাওয়া যায়।

আর স্পুতনিক-২এর ঐতিহাসিক উৎক্ষেপের পর ১৯৫৮-র ১লা ফেব্রুয়ারী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বুকে প্রথম গর্জন শোনা গেল জুপিটার-সি রকেটের। বহু বিফলতার পর সেদিন গ্রিনিচ মিন

টাইম সকাল তিনটে বেজে আটচল্লিশ মিনিটে মহাকাশের কক্ষপথে গিয়ে পৌঁছল মার্কিন দেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ একসপ্লোরার-১। তারপরই একে একে একসপ্লোরার ২, ৩, ৪। বিলম্বিত এ যাত্রা। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিপক্ষ সোভিয়েতের মধ্যেকার ব্যবধান প্রচণ্ডবেগে কমিয়ে আনল।



জুল ভার্নের কল্পনায় মহাকাশচারীরা ভারহীন অবস্থায় ভাসমান

গ্যালিলিওর লেখা সাইডেরিয়াস নানসিয়াস পড়ে বিশ্বখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জন কেপলার লিখেছিলেন ঃ 'গ্রহ এবং নক্ষত্র জগতের মধ্যে বিরাজ করছে যে অন্তহীন শূন্যতা, তাকে পাড়ি দেবার মত জাহাজ একদিন আবিষ্কৃত হবেই। আর তার নাবিকের আসন

অধিকার করে নেবে আমাদের মতই রক্ত-মাংসের মানুষ। তাঁর এই উক্তির তিনশ পঞ্চাশ বৎসর পর প্রায় তিরিশটি কৃত্রিম উপগ্রহ সত্যি সত্যিই পৃথিবীকে ঘিরে পরিক্রমণ করতে লাগল। সেটা ১৯৬০। ভোলতেয়ার, ডিউমাস, জুল ভার্ন, এডগার অ্যালেন পো, এইচ জি ওয়েলস এবং আরও অনেকেই তাঁদের রোমাঞ্চকর দুঃসাহসিক কল্পকাহিনীর মধ্যে মানুষের মহাকাশে যাত্রার যে স্বপ্ন উপলব্ধি করেছিলেন, এতদিনে তার রূপ পরিগ্রহ করতে চলল বাস্তবে। ১৮৬৯-এ প্রকাশিত হয় 'দি ব্রিক মুন'। রচয়িতা এডুয়ার্ড এভারেট হেল এই উপন্যাসে সর্বপ্রথম ইঁটের তৈরি একটি কৃত্রিম উপগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। বলা হয়, মানব আরোহী নিয়ে এই উপগ্রহ মহাকাশে বিচরণ করে গবেষণা চালাবে। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ, বার্তা বিনিময় এবং নৌ-পরিচালন ক্ষেত্রে ইঁটের তৈরি সেই উপগ্রহ কিভাবে কাজ করবে, তার যে বিশদ এবং রসগ্রাহী আলোচনা হেল ঐ উপন্যাসে করেছিলেন সেটা অভিনবত্বের দিক দিয়ে শুধু আকর্ষণীয়ই ছিল না, উত্তরকালে মহাকাশ যাত্রার বাস্তব রূপায়ণে সে যেন অতি স্পষ্ট বিজ্ঞান-সম্মত এক ইঙ্গিত।

১৯৬০-এর মধ্যে সোভিয়েত দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে একের পর এক যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি স্থাপন করে, তাদের সাফল্য উভয় দেশের মনেই যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস এনে দিল। পরিষ্কার বোঝা গেল, মহাকাশের বুকে মানুষের পদসঞ্চারণের আর দেরী নেই। যদিও সম্ভাব্য বাধাগুলি সম্পর্কে অনেকেই তখনও নিশ্চিত হতে পারেননি। ১৯৫৯-এ রয়েল অব ইংলণ্ডের জ্যোতির্বিজ্ঞানী রিচার্ড ভ্যান ডু রিয়েট উওলে একবার মন্তব্য করেছিলেন, মানুষের পক্ষে মহাকাশে বিচরণ করা অসম্ভব ব্যাপার। এমন কি ৭ই এপ্রিল ১৯৬০-এও প্রবীণ বিজ্ঞানী ডঃ ভান্নেভার বুশ দি নিউইয়র্ক টাইমসের এক সাক্ষাৎকারে বলেন, ব্যাপারটায় চমক সৃষ্টি করা সম্ভব। তবে মানুষের

ক্ষেত্রে ঝক্কিটা না নেওয়াই ভাল। তবু এ ধরনের বিপরীত মন্তব্যকে ধূলিস্যাত করে দিয়ে সেই চমকই মানুষ সৃষ্টি করল ১২-ই এপ্রিল ১৯৬০ তে। ঐদিন পৃথিবীর প্রথম মানুষ পৃথিবী প্রদক্ষিণের জন্যে উঠলেন মহাকাশে। ইউরি আলেক্সেয়িয়েভিচ গ্যাগারিন ভোস্টক মহাকাশযানে



মহাকাশে প্রথম মানুষ—ইউরি গ্যাগারিন

চড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তুশ তিন মাইল ঊর্দ্ধাকাশ ঘুরে ফিরে এলেন। চির পুরাতন বাধা এবং সংস্কারকে উপেক্ষা করে জুল ভার্নের কল্পলোকের নায়ক এই প্রথম ইতিহাস সৃষ্টি করে বসল।

বস্তুত ঝক্কি যে ছিল না তা নয়। তবে বৃহৎ সাফল্যের মাঝখানে

দাঁড়িয়ে পেছনের ফেলে আসা বাধা বিঘ্নের কথা আমরা বিশেষ একটা উপলব্ধির মধ্যে আনতে পারি না বলেই সম্ভবত সাফল্যটিকে একটি সহজ ঘটনা বলে মনে হয়। গ্যাগারিনের পর একে একে অনেকেই সুদূর আকাশ থেকে ঘুরে এলেন। মানুষ আজ চাঁদের পাশেও পাড়ি জমিয়েছে। হয়ত এই বছরেই সে চাঁদের বুকে বিচরণ করতে সমর্থ হবে। তবু প্রথম দিকে এই ঘটনাগুলি যতটা রোমাঞ্চ, যে পরিমাণ অভিভূতির সৃষ্টি করত আজ আর ততটা করে না। আজ সব কিছুই যেন গতানুগতিক ব্যাপার। সহজ ঘটনা।

তবু আজ থেকে দশ বছর আগেও মানুষের মহাকাশ যাত্রা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা এক প্রকার অনিশ্চিতই ছিলেন। একটি ভারী রকেটকে ঊর্দ্ধাকাশে ঠেলে তোলা অথবা কিছুটা যন্ত্রপাতি নিয়ে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের দূরাকাশে বিচরণ, বিজ্ঞানীর কাছে এ ব্যাপারগুলি ১৯৬০ এর মধ্যে কতকটা সহজ ব্যাপার হয়ে উঠলেও, একেবারে রক্ত-মাংসের মানুষ সম্পর্কে তখনও তারা দ্বিধাগ্রস্ত। নানা রকম প্রশ্ন তাঁদের মনে। ১৯৫৮-এ এক্সপ্লোরার-১ আবিষ্কার করল ভ্যান অ্যালেন বেল্ট। পৃথিবীকে ঘিরে ঊর্দ্ধাকাশে একটি পুরু আবরণীর মত এই বেল্ট একটি আচ্ছাদনী সৃষ্টি করে অবস্থান করছে। চল্লিশ ডিগ্রী উত্তর এবং চল্লিশ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর বিস্তৃত এই আচ্ছাদন পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে সূর্য থেকে বিকিরিত ইলেকট্রোন এবং প্রোটোন কণিকাদের নিয়ত শোষণ করে নেয় বলেই অত্যন্ত ক্ষতিকর ঐ কণিকাদের হাত থেকে জীবজগত রক্ষা পায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর দূরত্ব প্রায় ছয়শ' মাইল। পুরুও প্রায় ততটা কিন্তু একটি নয়, আরও একটি ভ্যান অ্যালেন বেল্ট আবিষ্কার করে ফেলল পাইওনিয়ার-৩ মহাকাশযান। এটির দূরত্ব প্রায় চার হাজার মাইল। তবে প্রথমটির মত এটি তেমন জোরাল নয়। ইলেকট্রোন এবং প্রোটোনকে ধরে রাখার

ক্ষমতাও এর মাঝে মাঝে হ্রাস পায়। কখনও বা একেবারে অন্তর্হিতও হয়ে পড়ে।

এই ভ্যান অ্যালেন বেল্টটি গোড়ার দিকে একটি মস্ত সমস্যারূপে পরিগণিত হয়েছিল। কারণ দূর আকাশের যাত্রীকে যদি বেতার তরঙ্গের সাহায্যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়, তাহলে সেই তরঙ্গ ঐ আচ্ছাদনী শোষণ করে নিতে পারে। তথ্য সরবরাহ, মহাকাশযান এবং তার কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে এটা একটা বিরাট বাধাস্বরূপ। সুখের কথা, পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে ভ্যান অ্যালেন বেল্টের বাধা অতিক্রম করে বেতার তরঙ্গ যাতায়াত করতে পারে। এরপর এল বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার কথা। মহাকাশে যে যানটির মধ্যে মানুষ বাস করবে, তাকে শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণা, যানটির পরিচালনা, পৃথিবীর সঙ্গে বেতার যোগাযোগ, এমনকি প্রয়োজনে নভচরকে ঘুম পাড়ান বা জাগিয়ে তোলা, তার জন্যেও চাই প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি। যদিও গোড়ার দিকে মার্কিন এবং সোভিয়েত দেশের কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে সিলভার-ক্যাডমিয়ামের মত সঞ্চয়ক তড়িৎ কোষ ব্যবহার করা হয়েছিল, পরে সূর্য থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের ব্যাপারটা সহজ হওয়ায় সে সমস্যাটিকেও দূর করা সম্ভব হল।

কিন্তু তখনও প্রশ্ন হাজারো। পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধে সমৃদ্ধ এই যে জীবন, মহাকাশযানের কৃত্রিমতার মধ্যে সে কি বেঁচে থাকতে পারবে? ১৮ই আগস্ট, ১৯৫৮-তে তৈরি হল ন্যাশনেল এরোনটিক এণ্ড স্পেশ এডমিনিস্ট্রেশন সংস্থা বা সংক্ষেপে নাসা। অনুরূপ একটি সংস্থা সোভিয়েত দেশেও স্থাপিত হল। মানুষকে মহাকাশে পাঠানর ব্যাপারে নানা রকম অনুসন্ধান এবং পরীক্ষাকার্য চালাতে শুরু করলেন এঁরা। আকাশের বুকে কি পরিমাণ উল্কাপিণ্ড বিচরণ করে এবং

তাদের আঘাত থেকে নভচরকে বাঁচানর সম্ভাব্য উপায় কি, তার ওপর কাজ চলতে লাগল। মানুষ যখন মহাকাশে শূন্য-মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে অবস্থান করবে তখন তার মানসিক এবং দৈহিক অবস্থা যাতে স্বাভাবিক থাকে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা হল। এর জন্যে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা আকাশে পাঠালেন লাইকাকে। লাইকার পর ইঁদুর ব্যাঙ এবং আরও কয়েকটি কুকুর পাঠান হয়। মার্কিন মুলুক থেকে পাঠান হয় গিনিপিগ বানর এবং সিম্পাঞ্জি। প্রচণ্ড গতিবেগ, কৃত্রিম আবহাওয়া, শূণ্য-মাধ্যাকর্ষণে তাদের জৈবিক অবস্থা প্রভৃতি জানার জন্যে তাদের দেহের সঙ্গে কতকগুলি বৈদ্যুতিক সংযোগ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে যাবতীয় তথ্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আপনা থেকেই পৃথিবীর গবেষণাগারে ভেসে আসে এবং মানুষের ব্যাপারে যথেষ্ট নিরাপত্তা গ্রহণের সাহায্য করে। এরপর বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপায়ে মহাকাশে বিচরণ করার সময় নভচররা যে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন তা তৈরি করে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলেন। স্থির করা হল মহাকাশ-যানটিকে পুরোপুরি আবদ্ধ রাখা হবে এবং তার মধ্যে থাকবে কৃত্রিম আবহাওয়া। আর সেই আবহাওয়ার চাপ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় সাড়ে সাত সের। পরে অবশ্য যে পোশাকটি নভচররা পরে থাকবেন, তার মধ্যেই ঐ রকম আবহাওয়া সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। পোশাকের মধ্যে অক্সিজেন এবং নাই-ট্রোজেন গ্যাস মিশিয়ে রাখা হল। কিন্তু দেখা গেল, এতে কিছুটা অসুবিধে আছে। সাধারণত বাতাসের নাইট্রোজেন কিছু পরিমাণে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়। কিন্তু কোন কারণে যদি মকাকাশ পোশাকের চাপ হঠাৎ কমে যায়, তাহলে দেহের রক্তের মধ্যেকার দ্রবীভূত নাইট্রোজেন বুদ-বুদ সৃষ্টি করতে পারে। এর ফলে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল হয়ে পড়বে। কিন্তু ভাল ফল পাওয়া গেল

নাইট্রোজেনের বদলে হিলিয়াম গ্যাস মিশিয়ে। যদিও হিলিয়াম রক্তের সঙ্গে কিছুটা স্বাভাবিকভাবে মিশে যেতে পারে, তবে ক্ষতি তেমন হয় না। তবে চাপের পরিবর্তন হলে এক্ষেত্রে নভচরদের কথা বলার ক্ষমতা কিছুটা কমে আসে। অর্থাৎ নভচরের দৈহিক এবং মানসিক নিরাপত্তার জন্যে যা যা করা দরকার, সমস্ত কিছুই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হল। এছাড়াও পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার পর প্যারাস্যুটের সাহায্যে তাঁদের উদ্ধার করার খুঁটিনাটি ব্যাপার সম্বন্ধেও কাজ শেষ হয়ে গেল। রকেট উৎক্ষেপ করার সময় যদি কোন গোলযোগ ঘটে, তাহলে যে কক্ষটির মধ্যে নভচররা থাকবেন, তার মধ্যেকার একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কক্ষের ডালাটি খুলে দেবে এবং ধাক্কা মেরে যাতে প্যারাস্যুটের সাহায্যে তাঁদের উদ্ধার করা যায় তার ব্যবস্থা করবে, এ দিকটার কথাও ভাবলেন পরিকল্পনাকারীরা।

অবশেষে প্রশ্ন দাঁড়াল নভচরদের যোগ্যতা সম্পর্কে। এ ব্যাপারে যেটুকু তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি তা একমাত্র নাসা থেকে। কারণ, মহাকাশ অভিযানের পুরো ব্যাপারটা সোভিয়েত দেশ আগে থেকে কখনই প্রচার করতে চায়নি। এমন কি গ্যাগারিনের সাফল্যের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারেনি, সে দেশের মানুষ আকাশের দিকে পা বাড়িয়েছে। কিন্তু ১৯৫৫-তেই খবর পাওয়া গেল, মার্কিন মুলুক তাদের 'মার্কারি' প্রকল্প সম্পর্কে তোড়জোড় প্রায় শেষ করে এনেছে। ঠিক হয় এই প্রকল্পে তারা অ্যাটলাস-ডি রকেট ব্যবহার করবে। রেডস্টোন রকেটের চেয়ে এর খরচ কম অথচ ক্ষমতা বেশি। আর একই সঙ্গে চলল উপযুক্ত মানুষের সন্ধান যারা নভচর হওয়ার যোগ্যতা রাখেন।

কিন্তু কি তাদের যোগ্যতা? তারা কি কোন অতিমানব? যে কেউ কি মহাকাশযানের আরোহী হতে পারে না? হলেই বা ক্ষতি কি? কারণ কাজ তো করবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। আর সেই যন্ত্রদের

চালনা করবে পৃথিবীর ওপরকার নিয়ন্ত্রক স্টেশন। কিন্তু না। এতদিন জীবজন্তুরা মহাকাশ সম্পর্কে যে অনুভূতিই প্রকাশ করুক, মানুষ আর কুকুর অথবা সিম্পাঞ্জি কখনই এক হতে পারে না। মানুষের নিজস্ব বুদ্ধি রয়েছে। বিচার ক্ষমতা আছে। তার বক্তব্য তাই অনেক বেশি মূল্যবান। তাছাড়া এমনও হতে পারে, মহাকাশে হঠাৎ পৃথিবীর যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। তখন আত্মরক্ষার পুরো দায়িত্ব তাকেই গ্রহণ করতে হবে। এর জন্যে চাই অফুরন্ত মনোবল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সংযম এবং সেই সঙ্গে জটিল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ক্ষমতা।

ঠিক করা হল আঠাশ বছর বয়সের নিচে কাউকে নভচরের দায়িত্ব দেওয়া হবে না। এঁদের মানসিক মান বা আই কিউ ১২৫ বা তারও বেশি চাই। যে কোন জটিল তথ্য নিজে থেকে পড়ে মর্মোদ্ধার করার যোগ্যতা এঁদের অবশ্যই থাকতে হবে। কুশলীরা যা শেখাবেন চটপট তা শিখে ফেলাব ক্ষমতা, হাতে কলমে জটিল যন্ত্রাবলী পরিচালনা বা মেরামত করার যোগ্যতা চাই। অটুট স্বাস্থ্য এবং কম লম্বা। বিভিন্ন ব্যাপারের দিকে লক্ষ্য রেখে ১৯৫৮-তে মার্কারি প্রকল্প সেনাবিভাগ থেকে নভচর নির্বাচন করার কথা স্থির করে ফেললেন। যাঁদের নির্বাচিত করা হয়, তাঁদের সকলেই বৈমানিক। এঁদের যোগ্যতার জন্যে মুখ্যত সাতটি বিষয়ের ওপর লক্ষ্য রাখা হতঃ এক, বয়েস চল্লিশের নিচে: দুই, উচ্চতা পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চির কম; তিন, অটুট স্বাস্থ্য; চার, বিজ্ঞান বা কারিগরি বিদ্যায় স্নাতক; পাঁচ, বিমান চালনায় স্নাতক: ছয়, পনেরশ' ঘণ্টা বিমান চালনার অভিজ্ঞতা এবং সাত, জেট-চালিত বিমান সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা। প্রায় ৫০৮ জনকে প্রথমে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু চূড়ান্ত নির্বাচনে সাফল্য অর্জন করলেন মাত্র সাতজন। এঁরা হলেন, ডোনাল্ড কেণ্ট শ্লেটন, লেরয় গর্ডন

কুপার, ভার্জিল আই গ্রিসম, ওয়ালটার মার্টি শিরা, অ্যালেন বারলেট সেপার্ড, ম্যালকম স্কট কার্পেন্টার এবং কর্নেল জন হার্সেল গ্লেন। বয়স এবং পদাধিকার বলে গ্লেনকে করা হল প্রধান নভচর। আর নির্বাচনের পর যখন এই নভচররা অনুশীলন কাজে যোগ দিলেন তখন যে কক্ষে চড়ে তাঁরা আকাশে পাড়ি দেবেন, তাকে যথাযথভাবে তৈরি করার কাজে লেগে গেলেন কুশলীরা। এই ক্যাপস্যুল বা কক্ষ নির্মাণের সব চাইতে অসুবিধে ছিল এই যে, এটিকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে ফিরে আসার সময় বাতাসের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘর্ষণে এটি না পুড়ে যায় এবং নভচরদের কোন ক্ষতি না হয়। সেই সঙ্গে নিরাপদে যাতে অবতরণ করা যায় তারও ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়।

মার্কিন মহাকাশ-যাত্রার পরবর্তী কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় ভরা। এর প্রধাণ কারণ, শক্তিশালী রকেট উদ্ভাবনের অক্ষমতা। অবশেষে ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৬০-তে একটি মার্কারি-রেডস্টোন-২ বা এম আর-২ হ্যাম নামে একটি পুরুষ সিম্পাজিকে নিয়ে আকাশে উঠল। তিন বছর আট মাস বয়েসের এই সিম্পাঞ্জিটির ওপর দায়িত্ব ছিল একটি হাতল টেনে সাদা আলো জ্বালান এবং আর একটি হাতল টেনে নীল আলো জ্বালান। হ্যাম যথাযথ দায়িত্ব পালন করল। প্রায় ৬·৬ মিনিট সে শূন্য-মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে ছিল। পৃথিবীর বুকে ফিরে আসার পর তার মার্কারি কক্ষটি কিছুটা জোরেই সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরে একটি হেলিকপ্টার তাকে উদ্ধার করে গবেষণাকক্ষে নিয়ে আসে। প্রায় তিন ঘণ্টা পর কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে একটি আপেল এবং আধখানা কমলা লেবু তাকে খেতে দেওয়া হয়। কোন রকম উত্তেজনা প্রকাশ না করে সে খেতে শুরু করে। ব্যাচারা হ্যাম! সে বুঝতেও পারল না মহাকাশ যাত্রার কত বড় সাফল্য সে অর্জন করেছে।

এরপর ২১শে ফেব্রুয়ারী আবার পরীক্ষা। তবু খুশি হতে পারলেন না স্পেশ সেণ্টারের ফন ব্রাউন। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ২৪শে মার্চ আর একটি পরীক্ষা চালান হল। কিন্তু আবার পরাজয়! ১২ই এপ্রিল ১৯৬০-তে সোভিয়েত নভচর গ্যাগারিন ভোস্তক-১ নভ-যানে চড়ে আকাশে উঠলেন। নাসার কর্তাব্যক্তিরা মন্তব্য করলেন, 'রুশরা দেখছি আমেরিকানদের সব সময় পেছনে ফেলবেই!' কংগ্রেস রীতিমত শঙ্কিত, মার্কিন জনসাধারণও। এই সাফল্যকে খাটো করার জন্যে কয়েকটি রাজনৈতিক নিবন্ধে বলা হল, বাজে কথা। পৃথিবী প্রদক্ষিণ নয়, আসলে একটি জেট প্লেনে করে অনেক ওপরে গিয়ে গ্যাগারিন প্যারাস্যুটে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

গ্যাগারিনের এই সাফল্য মার্কিনী তোড়জোড়কে আরও জোরাল করে তুলল। অবশেষে ৫ই মে তে সেপার্ড উঠলেন মহাকাশে। তবে প্রদক্ষিণ নয়। প্রায় নব্বই মিনিট তিনি ঊর্দ্ধাকাশে ছিলেন। সে সময়ে তাঁর কক্ষের তাপমাত্রা ছিল একানব্বই ডিগ্রী ফারেনহাইট। তবে পোশাকের মধ্যের তাপমাত্রা পঁচাত্তর ডিগ্রী। মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখলেন, শূন্য-মাধ্যাকর্ষণ তাঁর মনের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি। অতএব শূন্য-মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে নানা ধরনের অলীক ধারণা অপসৃত হয়ে গেল।

২১শে জুলাই-এ যাত্রা করলেন গ্রিসম। ৬ই আগস্ট ঘেরম্যান স্টিপেনভিচ টিটভ ভোস্টক-২ মহাকাশযানে সাড়ে সতেরবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন প্রায় ১১৫ মাইল ঊর্দ্ধাকাশে। টিটভের এত বেশি সময় ধরে বিচরণ মার্কিন মনে আবার ত্রাশের সঞ্চার করে। টিটভের এই সাফল্যে এটাই প্রমাণিত হল, ঊর্দ্ধাকাশ থেকে নিরাপদেই নভচররা ফিরে আসতে পারবেন। তবে টিটভের বক্তব্য, এগারবার ঘোরার পর তিনি কিছুটা অসুস্থ হয়ে

পড়েছিলেন। সম্ভবত শূন্য-মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়ার দরুন এটা হতে পারে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী ২০-তে গ্লেন মহাকাশ থেকে জানালেন, তাঁর সমস্ত কিছুই ভাল লাগছে। এই সময়ে রেট্রো রকেটের সাহায্যে কিভাবে মহাকাশযানকে নিরাপদে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে চালান যায়, সে সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করেন গ্লেন। উল্লেখ্য, এই রেট্রো রকেটের কাজ, মহাকাশযানের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা। অবশেষে ১৯৬০-র ৩রা অক্টোবরের মধ্যে মার্কিন মুলুকের কার্পেণ্টার, শিরা এবং সোভিয়েত দেশের নিকোলিয়েভ এবং পপোভিচের পরিক্রমণের পর পরিষ্কার বোঝা গেল, অন্তহীন নীল আকাশও মানুষের অগম্য নয়। গ্লেনকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন একটি কথাই তিনি বলেছিলেন, 'মহাকাশ যানটি বেশ গরম ছিল।' তাঁর গা-টিও বেশ গরম ছিল। খুব তৃষ্ণার্ত। সেই সঙ্গে জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস চালাচ্ছিলেন। মনে হল, বেশ কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। আর কোন শারীরিক ক্ষতি হয়নি তাঁর।

১৯৬০-তে মার্কারি প্রকল্পের সমাপ্ত হল। এবার জেমিনি-প্রকল্প। ১৬ই জুন ১৯৬০ ভোস্তক-৫ উঠল মহাকাশে একাশীবার প্রদক্ষিণের জন্যে। ঐ দিনই কিছু পরে সোভিয়েত দেশ আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা সৃষ্টি করে ফেললেন ভোস্তক-৬ মহাকাশে তুলে। এর যাত্রী ভালেন্তেনা তেরেস্কোভা। প্রথম মহিলা নভচর। আর আতলানতিকের ওপারে যখন জেমিনির কাজ চলতে লাগল, সেই অবসরে অক্টোবর ১২, ১৯৬০তে একেবারে তিনজন রুশ নভচর একই সঙ্গে নতুন আর এক ধরনের যানে মহাকাশ পরিক্রমায় বের হলেন। এর নাম 'ভোস্খদ' অর্থাৎ 'সূর্যোদয়'। আর এই তিনজন নভচরের মধ্যে শুধু একজনের পরনেই ছিল মহাকাশ-পোশাক। বাকি দুজন পরলেন সাধারণ পোশাক। যেন কোন প্লেনের পাইলট। এবার

লক্ষ্য চন্দ্র। এরপরই পুরো মহাকাশ যাত্রার মুখ্যত তিনটি দিক লক্ষ্য করার মত। এক, চন্দ্রাভিযানের প্রস্তুতি ; দুই, সূর্য, বিভিন্ন গ্রহ প্রভৃতি সম্পর্কে গবেষণা ; তিন, পৃথিবীর আবহাওয়া নির্ণয় এবং দূর পাল্লার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন। উল্লেখ্য, শেষোক্ত প্রকল্পটিকে বলা চলে মানব কল্যাণে মহাকাশ যাত্রা।

সেপ্টেম্বর, ১৯৬০। একটা ছুটির দিনে আমরা ঠিক করেছিলাম হিউসটনে নাসার মহাকাশ কেন্দ্র দেখতে যাব। কিন্তু যখন সব ঠিকঠাক, বাদ সাধল এন বি সি টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। যাত্রার দিন ঠিক দুপুরে হঠাৎ টেলিভিশন পর্দার ওপর ভেসে উঠল: জরুরী বিজ্ঞপ্তি। পরক্ষণেই ঘোষকের মুখ দেখা গেল। একটি মানচিত্রের ওপর লাঠি বুলিয়ে ভূগোলের মাস্টারমশায় যেমন ছাত্রদের পড়িয়ে যান, তেমনিভাবে বলে চললেন তিনি: কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে সংবাদ। মেক্সিকো উপসাগরের উত্তর উপকূল বরাবর হঠাৎ আবহাওয়ায় নিম্নচাপ দেখা দিয়েছে। পানামার ওপর দিয়ে হারিকেন বেল্লা এগিয়ে আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম বরাবর। মনে হচ্ছে এই ঝড় আজ বিকেল চারটের মধ্যে গালভেস্টোন, নিউঅরলিন্স, হিউসটন, পোর্ট লাভাকাসহ রিওগ্রান্দে উপত্যকায় এসে পড়বে। পাঁচটা নাগাদ কলেজ স্টেশন, অস্টিন, সান অন্তেনিওতে প্রবল বর্ষণের সম্ভাবনা আছে। ঘোষক সঙ্গে সঙ্গে ম্যাপের ওপর বিপদ-সঙ্কুল স্থানগুলি দেখিয়ে চলেছেন। ঘোষণার কিছু পরেই পর্দার ওপর লেখা ভেসে উঠল: কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে। সেই সঙ্গে মেঘের বিচিত্র আলোড়ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক। দানবের আস্ফালনের মত ঘূর্ণীঝড় এগিয়ে আসছে সাগরের বুকের ওপর দিয়ে।

আর প্রকৃতির সেই প্রলয়ঙ্কর ছবি পাঠাচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ। পাঠাচ্ছে মহাকাশের বুকে কয়েক-শ' মাইল দূর থেকে আমাদের সাবধান করার জন্য······উল্লেখ্য, টেলিভিশনের ঐ আবহাওয়াবার্তা সেদিন হুবহু মিলে গিয়েছিল। আগে থেকে সাবধান বাণী পাওয়ায় ঐ ঐ অঞ্চলের আকাশে সেদিন কোন বিমান চলেনি। অর্থাৎ সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে সকলেই নিজেদের সতর্ক করে রেখেছিলেন। আর সব চাইতে মজার ব্যাপার, আবহাওয়ার পূর্বাভাসই নয়, প্রকৃতিতে সেই আবহাওয়ার স্বরূপটি কেমন ছিল, তারও একটি পরিষ্কার ছবি নিজের চোখে দেখলাম। বলা বাহুল্য, হিউসটনে আর সেদিন যাওয়া হয়নি।

ঠিক এই ধরনের এমন সঠিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে কোন ধারণা আজ থেকে দশ বছর আগেও কি কেউ করতে পেরেছিলেন? ঐ বছর ২রা সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত দেশের আবহাওয়া জ্ঞাপক কৃত্রিম উপগ্রহ কসমস-১৪৪ এবং কসমস-১৬৫ অনুরূপ আরও তিনটি ঘূর্ণীঝড়ের সন্ধান পেয়েছিল। সেই সঙ্গে ঝড়ের গতিবেগ এবং সঞ্চারপথও। দেখা গেল, এর দুটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্য আঘাত করবে। সঙ্গে সঙ্গে মস্কোর আন্তর্জাতিক আবহাওয়া অফিস থেকে খবরটি সেদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে এবং আগে থেকে যথাযথ নিরাপত্তাসূচক ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বেশ কিছু ক্ষতির হাত থেকে তারা রক্ষা পায়। ১৯৬০-তে একটি মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ প্রচণ্ড রকমের একটি হারিকেনের সংবাদ সরবরাহ করে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষকে অনিবার্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে। সেই সঙ্গে কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তিও। ঐ একই বছরে নিম্বসি-২ এবং এসসা-১ নামে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ ভারত মহাসাগরের কয়েকটি অঞ্চলের ছবি তুলে পাঠায় বোম্বাই-এর কোলবা গবেষণাগারে। ঐ ছবি ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জুগিয়েছে।

বস্তুত মানুষের মহাকাশে বিচরণ ছাড়াও মহাকাশ গবেষণা কতভাবে যে জনমানুষের মঙ্গল সাধনে এগিয়ে এসেছে সে খবর আজও অনেকেই আমরা রাখি না। অভিযোগ ঃ দারিদ্র্য নিপীড়িত পৃথিবীতে এই যে চন্দ্রাভিযান, এই যে আন্তর্গ্রহে যাত্রার প্রস্তুতি, এত যে বিপুল পরিমাণ খরচ. একি প্রচণ্ড রকমের অপচয় নয়? এর উত্তর ঃ না। মহাকাশ গবেষণা আজ শুধু বিজ্ঞান-বিলাস নয়, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সার্থক প্রচেষ্টাও শুধু নয়, মানুষের গগন বিচরণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-রহস্য সম্পর্কে আজ আমরা অনেক নতুন তথ্য জানতে পেরেছি। আমাদের এই প্রাচীন পৃথিবীকে চিনতে পেরেছি নতুনভাবে। ডারউইনের 'সার্ভাইবেল অব দি ফিটেস্ট' সম্পর্কে মানুষ আজ অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছে এরই সাহায্যে।

সংবাদপত্রের শিরোনামে নভচরদের নাটকীয় কার্যাবলী দেখে আমরা বিস্মিত হই কিন্তু মানব-আরোহীবিহীন যে সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ আজ নিয়ত মহাকাশে বিচরণ করে মানুষের কল্যাণে হাজারো তথ্য পাঠিয়ে চলেছে, যাদের দিয়ে আমরা নিত্য-নতুন সমস্যার সমাধান করে চলেছি, তাদের কথা ভোস্তক বা অ্যাপলো নভচরদের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়। বরং এদের ভূমিকাই আজ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্ত উপগ্রহের কেউ দূরপাল্লার বিমান পরিচালনায় সাহায্য করছে, কেউ সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার ওপর বাজপাখীর চোখ রেখে মানুষকে অনিবার্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা করছে, কারুর কাজ সাগর প্রকৃতির ওপর নজর রাখা, মেরু অঞ্চলের হিম শৈলের কার্যাবলী লক্ষ করা এবং আরও যে কত তার হিসেব দেওয়া কম কথায় যথেষ্ট শক্ত।

সম্প্রতি যে সমস্ত আবহাওয়া জ্ঞাপক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে বিচরণ করছে তারা সারা পৃথিবীর আবহাওয়ার ব্যাপারে নিয়ত নানা রকমের তথ্য পাঠিয়ে চলেছে। কিছুদিন আগেও পৃথিবীর

মাত্র শতকরা কুড়ি ভাগ অঞ্চলে আবহাওয়া সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য পূর্বাভাস জোগান সম্ভব ছিল। বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে সর্বত্র সমানভাবে আবহাওয়া সংবাদ যাতে প্রচার করা যায় তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কিভাবে ঘূর্ণী ঝড় হয়, বাতাসের আর্দ্রতা এবং তাপমাত্রা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তার ওপর অনেক নতুন তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। দূর-ভবিষ্যতে কখন, কোথায় কি ধরনের আবহাওয়া থাকবে, কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে এখনই তা বলে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে কৃষিজ উৎপাদন কখন, কোথায় এবং কতটা করা যেতে পারে, বহু আগে থেকেই তার হিসেব করে সেইমত আমরা কাজ করতে পারব। এ ধরনের প্রচেষ্টা বিশ্বের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভবিষ্যতে তাঁরা কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর আবহাওয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতেও সমর্থ হতে পারেন। ফলে খরা অঞ্চলে কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি ঝরিয়ে অথবা অতি বৃষ্টির অঞ্চল থেকে বান ডাকা মেঘকে প্রয়োজন মত সরিয়ে দিয়ে আরও বেশি শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। কৃত্রিম উপগ্রহ মানুষের অগম্য স্থানেও সহজে বিচরণ করতে পারে বলে সমুদ্রের ওপর আমরা সহজে দৃষ্টি রাখতে পারব। পৃথিবীর খাদ্য সমস্যা বলতে আমরা মুখ্যত প্রোটিন সমস্যাই বলে থাকি। সমুদ্র সেই প্রোটিনের বিরাট আকর। সুপরিকল্পিতভাবে আজ যদি আমরা সমুদ্রের মাছ কাজে লাগাতে পারতাম, আমাদের প্রোটিন সমস্যার যথেষ্ট লাঘব হত। কিন্তু প্রচলিত নিয়মে সমুদ্রের কোথায়, কতটা এবং কি ধরনের মাছ পাওয়া যেতে পারে জরিপ করে বের করা যথেষ্ট কষ্টকর ব্যাপার। সেই মাছের প্রধান খাদ্য সামুদ্রিক শৈবাল। যেখানে প্রচুর শৈবাল সেখানেই মাছের ভিড়। কৃত্রিম উপগ্রহ খুব কম সময়ের মধ্যে কোন

সমুদ্রের কোথায় কতটা শৈবাল আছে; তা সহজেই আমাদের জানাতে পারবে। ফলে সেই অঞ্চলে গিয়ে মাছ সংগ্রহ করা কঠিন হবে না। এছাড়াও পৃথিবীর বন এবং পশু সম্পদ সম্পর্কেও অনেক কথা জানা যাবে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে। জানা যাবে, শস্য হননকারী কীট-পতঙ্গের ঠিকানা, তাদের প্রাদুর্ভাবের কথা। কখন কোথায় কি ধরনের কীট-পতঙ্গ বা পশু শস্য নষ্ট করতে পারে, আগে থেকে তা জানতে পারলে সময়মত প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করাও কঠিন হবে না।

ইতিমধ্যে নভচরদের ব্যবহার উপযোগী অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানান বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে জটিল হিসেব কষা যন্ত্র, ক্যামেরা, বেতার-গ্রাহক এবং প্রেরক-যন্ত্র প্রভৃতি। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র কোনো না কোনভাবে আমরা তা ব্যবহার করে চলেছি। তবে উল্লেখযোগ্য অবদান হল, একেবারে নতুন পদ্ধতিতে এবং যথেষ্ট কম খরচায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন ব্যবস্থা। পৃথিবীতে যে হারে জ্বালানি পুড়ে চলেছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত সঞ্চয় প্রায় শেষ হবার মত অবস্থা। নতুন পদ্ধতিতে সরাসরি সূর্য থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। অতএব ভবিষ্যতের মানুষকে মূল্যবান এই শক্তির জন্য কারুর মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

নভচরদের কর্মঠ রাখার জন্যে নতুন দৃষ্টিতে গবেষণা চালাতে হয়েছে বিজ্ঞানীদের। সম্পূর্ণ কৃত্রিম পরিবেশে তাঁদের দেহ এবং মন যাতে সচল থাকে তার জন্যে চালিয়ে যেতে হয়েছে হাজারো পরীক্ষা। প্রোটিন, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং ভিটামিন, সুষম খাদ্যের তালিকায় এদের নাম থাকলেও ঠিক কিভাবে এবং কতটা পরিমাণ এই খাদ্য মানুষের মন, দেহ এবং মেজাজকে যথাযথ রক্ষা করতে পারে, তার হিসেব এই সেদিনও আমাদের জানা ছিল না। শিল্প-সমাজ জীবনে এটা রীতিমত একটি সমস্যা। আজ কেউ আমরা

অফিসের কেরানী, কেউ কারখানার শ্রমিক, কাউকে বা কাজ করতে হয় বিশেষ একটি জটিল হিসেব কষা যন্ত্রের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মানুষ যখন যে কাজ করে, যে পরিবেশে কাজ করে তার সঙ্গে খাদ্যের বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যও যে জড়িত, সে সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য পাওয়া গেছে নভচরদের কথা ভাবতে গিয়ে। নতুন এই অভিজ্ঞতা আজ অনেক দেশেই খাদ্য নির্বাচনে সহায়তা করছে। সেই সঙ্গে আবিষ্কৃত হয়েছে নানা রকমের ওষুধ, রক্তচাপ, আন্ত্রিক-ব্যাধি, মানসিক রোগ এবং আরও নানান জটিল রোগ চিকিৎসার নতুন পদ্ধতি। মাথাধরা বা জ্বর-জ্বর ভাবের জন্যে বাজার থেকে যে এসপেরিন কিনে অনেকে কাজ চালান, সেটাকে মহাকাশচারীদের উদ্দেশেই প্রথমে আরও বেশি উন্নত করে তৈরি করা হয়েছিল। এখন তা আমাদের কাজে লাগছে।

এখানেই শেষ নয়। কৃত্রিম উপগ্রহ আজ আকাশের বুকে বিচরণ করে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে চলেছে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক সম্ভার। ইতিমধ্যে এদের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে অনেক নতুন খনি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে, যাদের সঞ্চিত সামগ্রী মানুষের বুকে আরও বহু বছর নতুন করে বাঁচার আশা যোগাবে। কয়েক বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে প্রচুর পরিমাণ খনিজ তেলের সন্ধান দেয় কৃত্রিম উপগ্রহই। ইতিমধ্যে সেই তেল সংগ্রহ করার কাজও শুরু হয়ে গেছে।

তবে মহাকাশ গবেষণার সব চাইতে বড় অবদান সম্ভবত বার্তা বিনিময়কারী কৃত্রিম উপগ্রহ। একথা ঠিক, আজকের পৃথিবীর সব চাইতে বড় প্রয়োজন অর্থনৈতিক উন্নয়ন। মানুষ আজ খাদ্য চায়। চায় সামাজিক নিরাপত্তা। সেই সঙ্গে মানসিক সাম্যও। এর জন্যে প্রয়োজন মানুষে মানুষে আরও দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন। পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং কৃষ্টিগত সমঝোতা। আর এটা

তখনই আরও সুষ্ঠুভাবে লাভ করা যাবে, যখন পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা হবে আরও নিগূঢ়। বার্তা-বিনিময়কারী কৃত্রিম উপগ্রহ এই ব্যবস্থাকেই আজ সুগম করে দিয়েছে। সংবাদপত্র, সাধারণ টেলিফোন বা বেতার যন্ত্র যা এতদিন করতে পারেনি তাই সম্ভব করতে চলেছে কৃত্রিম উপগ্রহ।

আজ কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে মুহূর্তে এক মহাদেশের সংবাদ আর এক মহাদেশে পৌঁছে যাচ্ছে। মনে পড়ে, ১৯৬০ তে যখন প্যারিসে প্রচণ্ড ছাত্র বিক্ষোভ চলে অথবা চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক বিবর্তন, তখন আতলানতিকের ওপারে প্রায় সাড়ে চার হাজার মাইল দূর থেকে টেলিভিশনে সেই ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করি। মাত্র কয়েক বছর আগেও টেলিভিশন ছবি তো দূরের কথা, সাধারণ বেতারেও অত দূরে সরাসরি শুধু বার্তা পাঠানই যথেষ্ট শক্ত কাজ ছিল। একবার ভেবে দেখুন, প্যারিসের রাজপথে যখন ছাত্রদের দারুণ দঙ্গল চলছে, ঠিক সেই সময়ে হাজার হাজার মাইল দূরে টেলিভিশনের সামনে বসে সকলে তা প্রত্যক্ষ করছে। সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহ মলনিয়া-১ সারা সোভিয়েত দেশের বেতারবার্তা, টেলিভিশন ছবি এবং রেডিও টেলিফোন ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও তাদের বেতার এবং টেলিভিশন অনুষ্ঠানের বিনিময় চলছে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্তা-বিনিময়কারী কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—টেলস্টার, রিলে এবং সিনকম। এদের মধ্যে আবার সিনকমের ভূমিকা যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এটি পৃথিবীর বিষুব রেখা বরাবর ২২২৩৭ মাইল দূরে পৃথিবীকে ঘিরে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিক বরাবর বিচরণ শুরু করে। আপেক্ষিক গতিবেগ, পৃথিবী তার অক্ষের চার পাশে যতটা জোরে আবর্তন করে ততটা। ফলে ঊর্দ্ধাকাশে একে মনে হয় যেন একই জায়গায় স্থির হয়ে

রয়েছে। মাটির ওপর থেকে পাঠান বেতারতরঙ্গ পৃথিবীর দূরাঞ্চলে সরাসরি যেতে বাধা পায় বলে, এঁরা বেতার সংকেতকে প্রথমে পাঠাবেন কৃত্রিম উপগ্রহে। কৃত্রিম উপগ্রহ সেই সংকেত পাঠিয়ে দেবে বিভিন্ন অঞ্চলে। কৃত্রমি উপগ্রহের মাধ্যমে বার্তা বিনিময় ব্যবস্থার এটাই হল মূল কথা। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর যে কোন অঞ্চল থেকে আমরা সারা পৃথিবীর বেতার বা টেলিভিশন অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারব। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং কৃষ্টিগত ভাবের লেনদেনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করা তখন সহজ হবে। ভবিষ্যতে এমন পরিকল্পনাও আছে, রাতের অন্ধকারে কৃত্রিম উপগ্রহের বুকে আলোর চকমকি জ্বেলে নৌ এবং বিমান চলাচলে সাহায্য করা হবে। সেই সঙ্গে সূর্যের আলো নিয়ত কৃত্রিম উপগ্রহের গায়ে প্রতিফলিত করে পৃথিবীর অমাবস্যার আকাশে নতুন চাঁদের উদয় ঘটানর কথাও ভাবা হচ্ছে। আমাদের জীবনে তখন কোন অমানিশা বলে কিছু থাকবে না। অমাবস্যার চাঁদে তখন চারদিক ভরপুর। জানি না, সে চাঁদ মানুষের জীবন থেকে সত্যিকার অমানিশা দূর করতে পারবে কিনা। তবে একথা অনস্বীকার্য মহাকাশ অভিযান আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। আরও অনেক কিছু দেবার প্রতিশ্রুতিও রাখে।

অবিশ্বাস্য! তবু জল্পনা কল্পকথার চির অতীতকে ব্যঙ্গ করে সেটাই বাস্তবে পরিণত হয়ে গেল। পৃথিবীর সেই চাঁদ, যাকে ঘিরে লক্ষ মানুষের অযুত রূপকথা নিযুত শিশুর শিয়রে ঘুমপাড়ানি গান গেয়েছে, হাজারো বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা মাকড়সার জাল সৃষ্টি করেছে যুগের পর যুগ, তারই বুকে মানুষের পদচিহ্ন আঁকা হয়ে গেল। চাঁদকে নিয়ে মানুষের কল্পনায় এতদিন যে যথেচ্ছাচার চলছিল, ওঁরা তিনজন—আরমস্ট্রং, কলিনস এবং অলডরিন তাকে নিজেদের স্পর্শে দেখলেন, উপলব্ধি করলেন। আর এই সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটল দীর্ঘ জল্পনার একটানা আলো-আঁধারি মরীচিকা।

অদ্ভুত! অবিশ্বাস্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী দূর নভোস্থলের এই উপগ্রহটিকে নিয়ে কত গল্পই না রচিত হয়েছিল। তার কোনটি কুসংস্কারে ভরা, কোনটির মধ্যে ফুটে উঠেছে রীতিমত বিশ্বাসের সুর, কারুর কাছে চাঁদ একজন অতি প্রাকৃতিক প্রাণী বিশেষ। প্রাচীন ভারতের গল্পকথার মধ্যে দেবদেবীর চন্দ্রলোকে গমন আজও যেন প্রতিটি ঘরেরই কথা হয়ে রয়েছে। চাঁদের মা বুড়ির চরকা চালানোর গল্প এখনও পুরনো হয়নি।

আফ্রিকার আদিবাসী বুসম্যানদের লোক-গাথায় চাঁদ একটি জীবন্ত প্রাণী। সূর্যের সঙ্গে তার দীর্ঘকালের দ্বন্দ্ব। তাই সূর্য তার

রশ্মি দিয়ে তাকে নিয়ত ফালি ফালি করে কেটে চলেছে। এ কারণেই চাঁদের কলার হ্রাস। তবু সূর্যকে ডেকে মাঝে মাঝে সে বলে, আমাকে ক্ষমা কর। তার করুণ আবেদনে সূর্য খানিকটা নরম হয়। কিছুদিনের জন্যে তার রোষকশা থেকে চাঁদকে সে অব্যাহতি দেয়। তাই চাঁদের কলেবর আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু যখনই সে ভরে ওঠে, অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র রূপে বিকশিত হয়, সূর্যের রাগটা যেন আবার নতুন করে নেমে আসে। ফলে আবার তার কলার হ্রাস হতে থাকে। কি অদ্ভুত কল্পনা। এর ভেতর রূপক থাকলেও, সূর্যই যে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ, প্রাচীন বুসম্যানদের এমন একটি ধারণা অবাক করারই মত।

নীল নদের ধারার দু'পাশের মানুষের কথা কিন্তু ভিন্নতর। তাদের গল্প ঃ এক সময়ে মানুষ অমর ছিল। যখন তারা দেখল তাদের সেই অমরত্বে কেউ হাত দিতে পারবে না তখন তারা ঈশ্বরকে সরাসরি অস্বীকার করে বসল। ব্যাপারটা দেখে রেগে গেলেন বিশ্ব-যাদুকর। তিনি তাদের ভাগ্যবিধাতা। তাদের মাথায় তিনি নিক্ষেপ করলেন ব্রহ্মাণ্ডের অগ্নিকুণ্ড। কেউ আর তখন বেঁচে রইল না। অবশেষে সেই যাদুকর একটি পুরুষ এবং দুটি নারীকে পাঠিয়ে দিলেন পৃথিবীতে। উদ্দেশ্য, নতুন সমাজ গড়ে তোলা। তাদেরই বংশধর চামেলিয়ন এবং লুনা। চামেলিয়ন ভাই। লুনা বোন।

কিন্তু চামেলিয়নের প্রকৃতিটা ছিল ভীষণ ভয়ঙ্কর। বোনের সঙ্গে তার ঝগড়া লেগেই থাকত। ব্যাপারটা দেখে সেই যাদুকর লুনাকে নিয়ে আকাশে চলে গেলেন। এই লুনাই হল চাঁদ। পৃথিবীর দিকে সে সর্বদা চেয়ে থাকে। আর পৃথিবীতে তার জন্ম একথা যাতে সে না ভুলতে পারে তারই জন্যে ব্যবস্থা করা হল তার কলার হ্রাস বৃদ্ধির। এদিকে সূর্যের ভয়, চাঁদ হয়ত তার সঙ্গে এবার টেক্কা

মারতে শুরু করবে। তাই তার তেজ দিয়ে চাঁদের কিছুটা অংশ সে পুড়িয়ে দিল। এটাই সেই চন্দ্রকলা? এই রূপকথায় শুক্রকে বলা হয়েছে চাঁদের প্রেমিক।

কারুর কাছে চাঁদ রাতের প্রহরী সেজে জগতের সমস্ত কিছু নিরীক্ষণ করে চলেছে। গ্রীক এবং রোমানদের কাছে চাঁদ একজন দেবী। অপূর্ব সুন্দরী। কখনও তাঁর নাম আরতেমিস। কখনও ডায়ানা বা সেলেন। আবার অতীতের মানুষ চাঁদের কলার হ্রাস বৃদ্ধি দেখে সময়ও গুনতো। তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দে ডায়েজিনেস লেইরটিয়াস নামে জনৈক দার্শনিক লিখেছেন: মিশরীয়দের প্রাচীন নথিপত্রে ৩৭৩টি সূর্যগ্রহণ, ৮৩২টি চন্দ্রগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, এ ধরনের নথিপত্র তৈরি করতে সময়ের প্রয়োজন দশ হাজার বছর। এ থেকে মিশরীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে।

অ্যারিস্টটলের ধারণা ছিল চাঁদের সঙ্গে মানুষের রক্তের সম্পর্ক আছে। হোরেসের মতে, চাঁদ নিস্তব্ধতার বাণী। অদ্ভুত সত্য। দেশ বিদেশে এমন হাজারো বিশ্বাস নিয়েই চাঁদ একদিন মানুষের মনে নিজের আসনটি রচনা করে নিয়েছিল। তবু ভাবতে অদ্ভুত লাগে, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের অনেক আগেই গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিতাস, অ্যানাকজাগোরাস এবং পিথাগোরাস ঘোষণা করেছিলেন চাঁদ জ্যোতির্মণ্ডলেরই একটি অংশ। চাঁদে যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন প্লেটো এবং সিসেরো। প্লুতার্কের মতে, চাঁদ নক্ষত্রের মতই একটি বস্তু। তবে মাঝে মাঝে তার বুকে চিড়খাওয়া গর্ত। বিজ্ঞান অবশ্য এ সত্যকে প্রমাণ করেছে।

কিন্তু মানুষের চোখে চাঁদ বাস্তবতা নিয়ে ভেসে উঠল ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বছর গ্যালিলিও নিজের তৈরি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে চাঁদকে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখলেন। তাঁর সে অভিজ্ঞতার

বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্যালিলিও লিখেছেন ঃ চাঁদের পিঠটা পুরোপুরি মসৃণ নয়। চাঁদ একেবারে গোলও নয়, অসম। গর্ত এবং ঢিপিতে ভরা। পৃথিবীরই মত কোথাও তার উঁচু পাহাড় কোথাও গভীর উপত্যকা। দূরবীক্ষণের আদিযুগে এমন সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণ সত্যিই বিস্ময়ের ব্যাপার।

অবশেষে দূরবীক্ষণের সংস্কার হতে লাগল। নতুন দর্শন, নতুন পদার্থবিদ্যার জ্ঞান উত্তরকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের নিরীক্ষণকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে লাগল। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে সত্যও যেমন ছিল, মাঝে মাঝে কিছু যে গল্পও থাকত না, তা নয়ঃ যেন বাস্তব চাঁদের চেয়ে রূপকথার চাঁদ বিজ্ঞানীদের কাছেও প্রিয়। অবাক হতে হয়, ১৮৩৩-এ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী হার্সেলকেও বলতে শোনা গেছে তিনি নাকি নিজের চোখে চাঁদের বুকে দেখতে পেয়েছেন সবুজ উপত্যকা, নীল পাহাড়, নীল হ্রদ, তার পাশে সাদা বালির বেলাভূমি। এমন কি বিংশ শতাব্দীর আরও একজন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী নাকি চাঁদের বুকে পতঙ্গের ঝাঁক উড়ে বেড়াতে দেখেছেন।

আজ থেকে আড়ইশ বছর আগে ফনটেনেল তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'অ্যানটিয়েনস সার লা প্লুরালাইট ডেস মনডেস'-এ চাঁদ সম্পর্কে লেখেন ঃ চাঁদের বুকে সূর্য কোন ধুঁয়ো বা বাষ্প সৃষ্টি করে না। চাঁদ শুধু পর্বত এবং নুড়িতে ভরা। তারাও বাষ্প সৃষ্টি করে না। আর যেহেতু বাষ্প নেই তাহলে জলও নেই। এমন পরিবেশে চাঁদে অন্তত উচ্চ পর্যায়ের কোন প্রাণী বাস করতে পারে না।

তবু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও হার্সেল এবং স্রুওটারের মত প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদেরও বিশ্বাস ছিল চাঁদের বুকে জীবনের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্রুইথুইসেন, যিনি চাঁদের জ্বালামুখ বা গহ্বরের উৎপত্তির কারণ তাঁর

বিখ্যাত উল্কাতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন তিনিও ঘোষণা করেন, চাঁদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সাইনাস মেডিয়ার পাশ বরাবর একটি শহর আবিষ্কার করেছেন তিনি। শহরটির একটি মনোগ্রাহী বর্ণনাও দিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই গল্পটি আর ধোপে টিকল না। সবচাইতে মজার ব্যাপার মাত্র এক শ কুড়ি বছর আগেও অনেকেই বিশ্বাস করতেন চাঁদে মানুষের মত জীব না থাকলেও অন্য কোন ধরনের প্রাণী বাস করে।

আর এই বিশ্বাসকে কিভাবে কোন কোন লোক নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতেন এখানে তার একটি নজির দিচ্ছি। এটি একটি রোমাঞ্চকর গল্প। লেখক জনৈক মার্কিন সাংবাদিক, লেখার উদ্দেশ্য, কিছুটা চমক সৃষ্টি করে সম্ভবতঃ বাহাদুরী নেওয়া।

তখন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ জন হার্সেল গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখান থেকে পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধের নক্ষত্রগুলির উপর তিনি সন্ধান চালাচ্ছিলেন। সাংবাদিকটি এই ঘটনাকে অবলম্বন করে একটি গল্প ফেঁদে বসলেন। লিখলেন, হার্সেল তাঁর কুড়ি ফুট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে চাঁদের বুকে অদ্ভুত ধরনের প্রাণী দেখতে পেয়েছেন। আকারে এদের বেশ বড় দেখাচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে বেশ স্পষ্টও। এদের কাউকে দেখতে বানরের মত। সঙ্গে পাখা, কেউবা দেখতে বাদুড়ের মত। এমনকি অদ্ভুত গোলাকার এক ধরনের প্রাণীও নাকি সেখানে দেখা যাচ্ছে। তারা প্রচণ্ড বেগে সেখানকার পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নামা ওঠা করে। ছাপা হল নিউইয়রক সান পত্রিকায়।

গল্পটি কল্পনাপ্রবণ পাঠক-পাঠিকাদের এত বেশি রোমাঞ্চিত করে তুলেছিল যে, অল্পদিনের মধ্যে পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা দারুণ ভাবে বেড়ে যায়। আর সবচাইতে মজার ব্যাপার নিউইয়রক টাইমস এবং দি উইয়রকার এর মত বিখ্যাত কাগজও তার প্রশংসায়

পঞ্চমুখ হয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাতে বলা হয়, এই আবিষ্কারের ফলে হার্সেল জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যাবেক্ষণ ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করলেন। অবশ্য আফ্রিকা থেকে ফেরার পর হার্সেল যখন সমস্ত কিছু শুনলেন, তখন এক কথায় এর সব কিছু অস্বীকার করে বসলেন।

এমন কি পিটারসবুর্গেরও একজন সাংবাদিক চাঁদের অধিবাসীদের বর্ণনা দিয়ে রুশ ভাষায় একটি বই প্রকাশ করেন। হার্সেলের ব্যাপারে তাঁর গল্প মার্কিন লেখকটির থেকে আরও চমকপ্রদ হল। পরে ভি বেলিনসকি বইটির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর কাছে বইটিকে বিজ্ঞানকে নিয়ে একটা বড় কৌতুক করা ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি।

তবে উন্নত ধরনের প্রাণীর কথা বাদ দিলেও মাত্র কয়েক দশক পূর্বেও অনেকে মনে করতেন নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী অথবা উদ্ভিদ চাঁদে বাস করতে পারে। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে অ্যাপেনাইন পর্বতের কাছে অবস্থিত এরাটসথেনস গহ্বরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম পিকেরিং অদ্ভুত ধরনের কতকগুলি কালো দাগ দেখতে পান। তাঁর মতে এই দাগগুলি আসলে পোকা মাকড়ের ঝাঁক। চাঁদের বুকে কোন কোন সময় কিছু আলো আঁধারি অংশের পরিবর্তন দেখা যায়। এনডাইমিওন, গ্রাইমালদি এবং রিক্কিওলি গহ্বরে এই পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর দেখা যেতে থাকে। এ থেকে অনেকে মনে করেন, হয়ত সেখানে ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ জন্মায়। তখন স্থানগুলি ধূসর বা কালো হয়ে ওঠে। তারপর তারা যখন মরে যায় তখন জায়গাগুলি আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পিকেরিংও এটা বিশ্বাস করতেন।

মেয়ার ইমব্রিয়াম বা ঝঞ্ঝা সাগরের আর একটি গহ্বর এরিসটাইলিসে পিকেরিং দুটি দাগ দেখতে পান। পরস্পর

সমান্তরাল। চাঁদের দিগন্ত রেখা ছেড়ে সূর্য যতই উপরে উঠে আসে দাগগুলি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এতে তাঁর ধারণা হয় এগুলি খাল ছাড়া কিছু নয়। সম্প্রতি চাঁদের বুকের সবচাইতে বেশি ছায়াঘন স্থান এরিসটারকাস গহ্বরে মুরও নাকি অনুরূপ লম্বা দাগ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু চাঁদের বুকে জীবনের অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমেই সকলে হতাশ হতে লাগলেন।

চাঁদে জীবনের সম্ভাবনা খোঁজার আগে তার গঠন এবং পরিবেশ সম্পর্কে ১৯৬০ এর পূর্বে বিজ্ঞানীদের কি রকম ধারণা ছিল ঐতিহাসিকতার দিক দিয়ে তা আলোচনা করা যাক। খালি চোখেও চাঁদের বুকে কতকগুলি স্পষ্ট বা অস্পষ্ট দাগ বা কলঙ্ক দেখা যায়, এদেরই বলা হয় চাঁদের সমুদ্র। এরা আসলে কঠিন লাভার স্তূপ ছাড়া কিছু নয়। দেখতে কতকটা কাচের মত। গ্যালিলিওর অন্যতম ছাত্র রিক্কিওলি চাঁদের একটি মানচিত্র তৈরি করে সর্বপ্রথম এই কলঙ্কগুলির নামকরণ করেছিলেন। এবং সেই নামের অনেকগুলিই পৃথিবীর সাগর, পর্বত বা সমভূমির নাম। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চাঁদের পিঠকে কোথাও আলো আঁধারি মনে হয়েছে। কোথাও বা মরুভূমির মত বিস্তৃত অঞ্চল। তার মাঝে গহ্বর অথবা বিরাট আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের মত খাদ। অনেকের ধারণা হয়েছিল হয়ত এগুলি হ্রদ। অথবা আগ্নেয়গিরি। এদের মাঝখানে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শিরদাঁড়ার মত এঁকে বেঁকে পাহাড়ের শ্রেণী। এমন কি বেশ কিছু ফাটলের মত অংশও অনেকের চোখে ধরা পড়ে।

এখানে একটা কথা বলে রাখি, গ্যালিলিওর পর পরবর্তী তিন শতাব্দীরও বেশি সময় চাঁদ সম্পর্কে মানুষ যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে তার মূল উৎস দূরবীক্ষণ যন্ত্র। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রের যথেষ্ট সংস্কার সাধন করা হলেও মহাকাশ

নিরীক্ষণের ব্যাপারে বেশির ভাগ সময় অনেক কিছুই যথাযথ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নি। এর সবচাইতে বড় কারণ, পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডল।

প্রথমতঃ হাল্কা মেঘ ছাড়াও বাতাসের মধ্যে যে ভাসমান জলীয় বাষ্প সবসময়ই মিশে থাকে, প্রতিফলন বা প্রতিসরণের দ্বারা তারা দূরাগত আলোক রশ্মিকে যথাযথ ভাবে চিনতে অসুবিধে সৃষ্টি করে। অর্থাৎ লক্ষ্য বস্তু থেকে যে আলো বেরিয়ে আসে, মাঝপথে ঐ জলীয় বাষ্প বিচ্যুরিত করে কখনও সেই আলোকে ভেঙ্গে দেয়। ঠিক রামধনুর ব্যাপারে যেমন হয়ে থাকে। একথা সকলেরই জানা, রামধনুর সাত রং আসলে সূর্যরশ্মিরই বিক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ। সেই সাত রং দেখে নিশ্চয়ই কেউ সূর্যের স্বাভাবিক আলোর রঙ সম্পর্কে কিছুই ধারণা করতে পারবেন না। চাঁদের বুক থেকে এইমাত্র যে আলো বিকিরিত হল মাঝপথে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলে এসে তার প্রকৃতি পালটে যায়। ফলে সেই আলো যে বস্তু থেকে প্রতিফলিত বা বিকিরিত হয়ে এসেছে তার সঠিক রঙ বা চেহারা ভিন্নতর মনে হতে পারে। যাকে আমরা কলঙ্ক বা আবছা ছায়া মনে করছি হয়ত আদৌ সেটা ছায়া নয়। আসলে ঐ অঞ্চলে তখন সূর্যের আলো ঠিক মত পড়ে নি তাই অমনটি মনে হয়েছে।

এ ছাড়াও চাঁদের আবর্তন, ভূ-প্রকৃতি, দীর্ঘ রাত্রি এমন অনেক কিছু সম্পর্কে যথাযথ সংবাদ সংগ্রহ করা গত দু তিন দশক আগেও প্রায় অসম্ভবই ছিল। ফলে সেদিনকার দূরবীক্ষণের মাধ্যমে চাঁদ সম্পর্কে যে টুকু ধারণা আমরা করেছিলাম তার বেশির ভাগই কিছুটা ভুল পর্যাবেক্ষণ, কিছুটা যুক্তি খাড়া করেই করেছিলাম। তবু ভাবলে বিস্মিত হতে হয় আধুনিক বেতার-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে অঙ্ক কষে, পুরনো পদ্ধতিতে পর্যাবেক্ষণ চালিয়ে এবং কিছুটা অনুমানের উপর নির্ভর করে চাঁদ সম্পর্কে যে

সমস্ত তথ্য সে দিনের বিজ্ঞানীরা দাঁড় করিয়েছেন আজকের আধুনিকতম ব্যবস্থাপনার তুলনায় তারা শুধু অভূতপূর্বই নয়, যেন মনে হয় অসাধ্যকে তাঁরা সাধন করে গেছেন।

ওঁরা মেয়ার কথাটার অর্থ ধরেছেন সাগর। চাঁদের কলা যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তার সেই থালার এক পাশে ডিম্বাকৃতি অংশ দেখা যায়। কতকটা সাগরের মত। এর নাম দেওয়া হয়েছে মেয়ার ক্রিসিয়াম। দেখা গেছে সমুদ্রের মত দেখতে গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি এই অঞ্চলগুলি মুখ্যত চাঁদের উত্তর গোলার্ধেই খুব বেশি চোখে পড়ে। যদি মেয়ার ক্রিসিয়াম চাঁদের থালার মাঝ বরাবর থাকত হয়ত তার ধারটিকে গোলাকার দেখাত। ঠিক একই কথা বলা চলে মেয়ার ইমব্রিয়াম সম্পর্কে। পৃথিবী থেকে এটাকে মনে হয় বিস্তৃত একটি সমতল ভূমির মত। এর দক্ষিণ পাড় ঘিরে রয়েছে চাঁদের সবচাইতে উঁচু পাহাড় আপেনাইনের শৃঙ্গাবলী। পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে ককেসিয়ান এবং আলপস পর্বতমালা। আর আছে কিছু গহ্বর এবং বলয়ের মত ঘেরা পাহাড় উত্তর দিকে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্লেটো এবং খাড়াই পাহাড় সাইনাস ইরিডিয়াম। পূব দিকে ঐ সমতল আরও যেন বিস্তৃত হয়ে নেমে পড়েছে মহাসাগরের মত গহ্বরে। নাম ওসেনাস প্রোসেল্লেরাম। কি অপূর্ব বর্ণনা। সাধারণ দূরবীক্ষণে দেখে এ ধরনের মানচিত্র আঁকা যেন দুঃসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হয়। বিশেষ করে কোন রকম যন্ত্র ছাড়াই নিজের চোখকেই যেখানে বিচার-বুদ্ধির একমাত্র মাপকাঠি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল।

মেয়ার ট্র্যানক্যুইলিটাটিস বা তন্দ্রা সাগর, মেয়ার সেরেনাইটাটিসের এবং কিছুটা অনুরূপ আরও আরও কিছু কিছু অংশের ধারগুলি বলয়ের মত এবং সমুদ্রের পাড়ের মত উঁচু। এবড়ো খেবড়ো অবস্থায় বিক্ষিপ্ত এই ধরনের খাদই চাঁদের বেশির ভাগ

অঞ্চলে দেখা যায়। কোন কোন সাগরের ব্যাস প্রায় এক হাজার কিলোমিটারের মত। কোথাও খাড়া উঠে যাওয়া পর্বত শ্রেণী অথবা গর্ত। এই নিয়েই যেন তৈরি হয়েছে চাঁদের প্রকৃতি। একটা মাঝারি ধরনের দূরবীক্ষণ যন্ত্রে প্রায় চল্লিশ হাজারের মত গহ্বর বা গর্ত ধরা পড়ে।

গহ্বর, জ্বালামুখ বা পাহাড়ের চূড়া ছাড়াও যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহলে একটি সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলেও চাঁদের বুকে আর এক ধরনের বস্তু দেখা যায়। তা হল কতকগুলি ফাটল। এই ফাটল একটি বিরাট অংশ জুড়ে অবস্থান করছে। কখনও বিক্ষিপ্ত ভাবে, কখনও বা নিয়মিত নক্সার মত। কখনও বা কোন গহ্বরের বুকের উপর দিয়ে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে গেছে। ট্রাইয়েসনেকার গহ্বরের কাছে একটি সাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চাঁদের বুকে কে যেন ফাটলের জাল বুনে রেখেছে। তার থালার মাঝ বরাবর যখন সূর্যের আলো এসে পড়ে তখন ঐ ফাটল গুলি আরও স্পষ্ট রূপে দেখা দেয়। সম্ভবতঃ চাঁদের ভূ-কেন্দ্রিক কোন প্রতিক্রিয়াই তার বুকেব ঐ বৈচিত্র্য পূর্ণ গঠনের প্রধান কারণ।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও চাঁদের গঠন বা উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা যা কিছু আলোচনা করে এসেছেন তার বেশির ভাগই করেছেন তাঁদের এই পৃথিবীতে লব্ধ জ্ঞানেরই সাহায্যে। দীর্ঘকাল ধরে একটি তত্ত্ব মানুষ যেন কখনই ভুলতে পারে নি। সেটা হল চাঁদ পৃথিবীর অংশ। এবং যেহেতু পৃথিবীর অংশ অতএব তার ভূ-প্রকৃতিও পৃথিবীর অনুরূপ হবে। আর এ প্রসঙ্গে এতটুকু প্রশ্নও মনের কোণে ঠাঁই দেওয়াটা তাঁরা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

তবু গত কয়েক দশকে ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অনেক

বেড়ে গেলেও চান্দ্র পৃষ্ঠের গঠন সম্পর্কে একটা যুক্তি সম্মত ব্যাখ্যা এই সেদিনও বিজ্ঞানীদের কাছে অজানাই ছিল। ১৮২৪ এ গ্রুইথুইসেন সর্ব প্রথম চাঁদের গহ্বরের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে ব্যাখা করেন তাঁর উল্কা-তত্ত্বের দ্বারা। এখন এই তত্ত্বটি সম্পর্কে অনেকেই পুরোপুরি আস্থাভাজন নন। গ্রুইথুইসেনের পরবর্তী কালে সাময়িক ভাবে এটিকে অনেকে বিস্মৃত হন। পরে ইংরেজ জ্যোতি-র্বিজ্ঞানী প্রোকটর কিছুদিন নাড়াচাড়া করে নিজেই এটাকে বাতিল করে দেন। বর্তমান শতাব্দীতে অবশ্য বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী এই তত্ত্বটিকে সমর্থন করেছিলেন। এমন কি বলডুইনও তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি ফেস অব দি মুন' এ এঁর স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি দেখিয়েছেন।

উল্কা তত্ত্বতে বলা হয়েছিল, বাইরে থেকে এসে উল্কাপিণ্ড চাঁদের বুকে ছিটকে পড়ে বড় বড় গহ্বরে তৈরি করে। উল্কার আঘাতে পৃথিবীর বুকেও যে গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল তার অবশ্য নজির আছে। তবে এক্ষেত্রে ঠিক চাঁদের বুকে যেমন বলয়, বা পাহাড় পর্বত দেখা যায় ঠিক তেমন কিছু চোখে পড়ে না।

উল্কা তত্ত্বের সমালোচনা করে মুখ্যত যে কয়টি মতামতের অবতারনা করা হয় তারা হল এক, চাঁদের বুকে গহ্বর বা জ্বালা-মুখগুলি যে ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে তাতে তাদের মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য ভাব চোখে পড়ে। ঠিক এলোপাথাড়ি বিক্ষিপ্ত নয়। সাধারণতঃ সবচাইতে ছোট গহ্বরটি শুরু হয়েছে কোন একটি বলয়ের মত খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে। কোন কোন ক্ষেত্রে পরপর কতকগুলি গহ্বর ছড়িয়ে রয়েছে ঠিক যেন মালার মত। একটা নিয়মিত শৃঙ্খলা তাদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু উল্কা নিয়মমাফিক আছড়ে পড়ে নিশ্চয় অমন নির্দিষ্ট ভাবে তাদের সাজাতে পারে না? কোন কোন গহ্বরের পাড়গুলি দেখলে মনে হয় তারা

যেন একই সময়ে তৈরি হয় নি। কারণ তারা স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। ব্যাপারটা প্রখ্যাত ভূ-তত্ত্ববিদ স্পার কোপারনিকাস গহ্বরের ক্ষেত্রে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। কোন কোন গহ্বরের মধ্যে যে পাহাড়ের চূড়া আছে সেই চূড়ায় কিছু কিছু গর্ত



আরব মরুভূমির রাব আল্ খালি-তে সাতানব্বই মিটার ব্যাসের
এই গহ্বরটি উল্কার আঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল

দেখা যায়। এগুলি কোন মৃত আগ্নেয়গিরিই হওয়া যুক্তি সঙ্গত বলে অনেকে মনে করেন। উইলকিনস এবং মুর মিউডন এবং কেমব্রিজ মানমন্দির থেকে যথাক্রমে ৮২ সেনটিমিটার এবং ৬২ সেনটিমিটার ব্যাসের দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এ ধরনের নতুন কয়েকটি গর্ত আবিষ্কার করেছিলেন।

চাঁদের বুকে একদিন যে আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ প্রকম্পন সরব হয়েছিল তার বহু প্রমাণ ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা সংগ্রহ করেছেন। এরাটসথেনস অঞ্চলে প্রচুর আগ্নেয় ভস্মের সন্ধান পাওয়া গেছে। তবে সেখানে সঞ্চিত লাভা খুব কমই চোখে পড়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আজও সেখানকার কোন কোন অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির

কাজ অব্যহত রয়েছে। যাঁরা বিভিন্ন সময়ে চাঁদের উপর সন্ধান চালিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই চাঁদের ভূখণ্ডে মাঝে মাঝে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। চাঁদের বুকে মৌমাছির চাকের মত যে পঞ্চভুজ বা ষড়ভূজ অঞ্চল দেখা যায় তার নাম দেওয়া হয়েছে সারকাস। পিকেরিং প্লেটোসারকাস, এরাটসথেনস এবং আরিসটারকাস এবং আরও কিছু অঞ্চলে এই ধরনের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। হাল্কা ধরনের কুয়াশা বা পরস্পর দুটি অঞ্চলের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এমন ব্যাপারও তাঁর চোখে পড়েছিল। তবে কেউ কেউ মনে করেন হয়ত এর সমস্তটাই তাঁর দৃষ্টি ভ্রম।

কিন্তু ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়াও শক্ত। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখ গিয়ে পড়ল লিনে জ্বালামুখের উপর। মেয়ার সেরেনিটাটিসের মধ্যে এই জ্বালামুখটি সহজেই চোখে পড়ে। লোরম্যান, মডলার এবং বিশেষ করে স্মিড বেশ কয়েকবার এটির উপর পর্যবেক্ষণ চালান। দেখা গেল এর মুখের ব্যাস প্রায় ছয় মাইলের মত। ১৮৪১ থেকে ১৮৪৩ সাল, এই তিন বছর সময় নিয়েছিলেন স্মিড এর মানচিত্রটি তৈরি করতে।' এর গহ্বরে কোন পাহাড়ের মত চূড়া দেখা যায় নি ও এই জায়গাটির উপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে মনে হয়েছে চাঁদ এখনও পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে জমে যায় নি। তার অভ্যন্তরে এখনও ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তন কাজ অবাধে চলেছে।

হঠাৎ একটা মজার ব্যাপার ঘটে গেল অক্টোবর ১৬, ১৮৬৬ তে। স্মিড সেবার নতুন করে খুঁটিয়ে দেখছিলেন মেয়ার সেরেনিটাটিসকে। কিন্তু এ কি ব্যাপার? সেই লিনে জ্বালামুখটিকে তো সেখানে কোথাও চোখে পড়ছে না? যেন ভোজবাজীর মত উড়ে গেছে। একটি গভীর গর্তের পরিবর্তে সেখানে পড়ে রয়েছে সাদা অঞ্চল। এটিকে আগে যাঁরা দেখেছিলেন তাঁদেরও অনেকে স্বীকার করলেন সত্যিই একটা সাদা দাগ ছাড়া আর কিছুই তাঁদের চোখে পড়ছে না।

স্মিডের খবরটি ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁদের কেউ কেউ বললেন, লিনেকে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন। তার হাঁ-টা আগের মতই আছে। তবে উচ্চতায় বেশ খাটো হয়ে পড়েছে। পরে থরনটন তাঁর শক্তিশালী দূরবীক্ষণে অনুসন্ধান চালিয়ে সেখানে একখণ্ড সাদা জমি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। আজও পর্যন্ত দেখা যায় নি। এতে করে মনে হয় কিছু কিছু সক্রিয় জ্বালামুখ ১৮৪৩ থেকে ১৮৬৬-র মধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। এর যথাযথ কারণ এখনও জানা যায় নি। তবে অনেকের অনুমান, হয়ত ভূগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরিই এই পরিবর্তনটি ঘটিয়ে থাকবে।

আর এক ধরনের জ্বালামুখ বিজ্ঞানীদের মনে বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সেটা হল জোড়া-জ্বালামুখ বা গহ্বর। দুপাশে দুটি গহ্বর। তাদের মাঝখানে একটি পাহাড়ের প্রাচীর। একেই বলে জোড়া-জ্বালামুখ। এ ধরনের একটি জোড়া-জ্বালামুখ হল মেজাইয়ার। বর্তমানে এর একটি মুখের নাম রাখা হয়েছে পিকেরিং। মেয়ার ফোসানডিটাটিস-এ অবস্থিত। ধূমকেতুর লেজের মত একটি অংশ এখান থেকে বেরিয়ে বেশ কিছুটা দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে দেখা যায়। এই অভিনবত্বটুকু বিশেষজ্ঞদের কাছে আজ একটি বড় প্রশ্ন। নিনিনজার সম্প্রতি একটি অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করেছেন জোড়া-জ্বালামুখের মুখ দুটি সম্পর্কে। এঁর বক্তব্য, যে পাহাড় ঐ মুখদুটির মাঝখানে প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে তার মধ্যে আছে একটি সুড়ঙ্গ পথ। আসলে ঐ মুখ দুটি সেই সুড়ঙ্গেরই দুটি বাইরের দিক, সম্ভবতঃ পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে এক পাশ থেকে অপর পাশে একটি উল্কা সবেগে ভেদ করে চলে যাওয়ায় অমনটি হয়েছে।

চাঁদের বুকে যে চিরন্তন একটা পরিবর্তন ঘটে এসেছে এবং এখনও ঘটছে তার স্বপক্ষে আরও অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়।

অনেকে এ কথাও বলছেন মেজাইয়ার এবং বিয়ার গহ্বর দুটিকে আগে নাকি সমান আয়তন বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে মোটেই তারা সমান নয়। সম্ভবতঃ চাঁদের কলার হ্রাস বৃদ্ধির সময় সম পরিমাণ আলোক রশ্মি এদের থেকে প্রতিফলিত না হওয়ায় দৃষ্টি ভ্রমের দরুন এমনটি ঘটেছে। তবে ক্লাইন-এর মতে, এই অঞ্চলটি নাকি কখনও কখনও কুয়াশার মত কোন কিছুর ধূঁয়োয় আচ্ছন্ন থাকে। ফলে গহ্বর দুটিকে আলাদা করে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা সম্ভব হয় না। অগাস্ট ২০, ১৯৫০ মুর এই অঞ্চলে একটি চকচকে সাদা জায়গা দেখতে পেয়েছেন যেটিকে আগে কখনও দেখা যায় নি।

অতএব ধরে নেওয়া চলে চাঁদের দেশে এখনও আগ্নেয়গিরির কার্যাবলী সক্রিয় হয়ে রয়েছে। আর এরই জন্যে তার বুকে বর্ণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কখনও সাদা, ধূসর অথবা কলো রঙের এই পরিবর্তনের মূল কারণ তারাই। চাঁদের ভূ-প্রকৃতির কোথাও উঁচু হয়ে যাওয়া বা বসে যাওয়া ঐ একই কারণে সাধিত হয়ে থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য, এই ধারনাগুলির আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ হওয়া দরকার।

চাঁদের গভীরে যে আগ্নেয়গিরির প্রতিক্রিয়া আজও বর্তমান সম্প্রতি দুজন সোভিয়েত বিজ্ঞানী কোজিরেভ এবং ইয়েজেরসকি তার সপক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। নভেম্বর ৩, ১৯৫৮ তারিখে ক্রিমিয়ার মানমন্দিরের বিরাট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা চাঁদের পিঠের ছবি তোলেন। সেই সঙ্গে তার বর্ণালী নিয়েও পরীক্ষা চালান। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি, বর্ণালী-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়েছে।

কোজিরেভ এবং ইয়েজেরসকি ঐদিন বিশ্ব-সময় রাত আড়াইটে

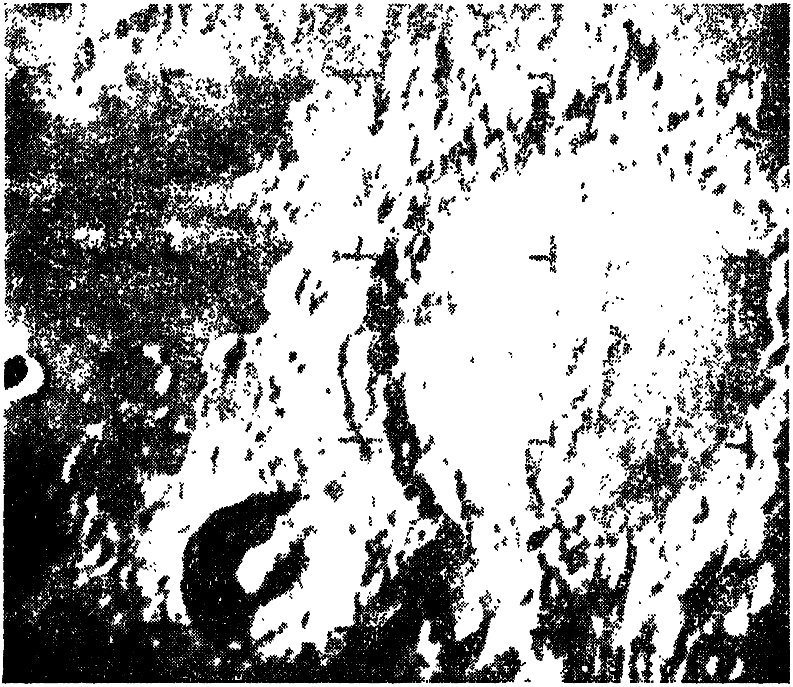
থেকে তিনটের মধ্যে চাঁদের আলোর বর্ণালী লক্ষ্য করলেন। দেখলেন সেই বর্ণালীর অন্যান্য রঙের মধ্যে বেগুনী রঙটি যেন বেশ কিছুটা



ডঃ নিকোলাই কোজিরেভ

ফিকে। তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যেকার বর্ণালীতে চাঁদের বুকে কার্বন অণু (C_2)-র অস্তিত্ব পাওয়া গেল। এর মানে সেখানে কোন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। হঠাৎ আলফোনসাস পর্বতমালার মধ্যবর্তী একটি চূড়ায় দেখা গেল ধূমকেতুর ডগার মত উজ্জ্বল আলোর শিখা। যেন সেখানটা জ্বলছে। ঐ একই সময়ে তার মুখ দিয়ে লালচে রঙের ধুঁয়ো বেরিয়ে এল। বর্ণালীতে যে রঙটি ঐ ধুঁয়োকে

সূচিত করেছিল সেটা এই এক ঘণ্টায় ক্রমে প্রায় দুই ইঞ্চি সরে গেল। তার মানে ধূঁয়ো ছড়িয়ে পড়ল প্রায় চার কিলোমিটার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে।



আলফোনসাস গিরিগহ্বরে গোল দাগ দেওয়া জায়গায় রেনজার-৯ আঘাত হেনেছিল। অদূরে সেই পাহাড়ের চূড়াটি

ঘটনাটি সাধারণের মনে যথেষ্ট কৌতুহল সৃষ্টি করে। পরে অনেকেই এই অঞ্চলটিতে সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ চালান এবং ঐ দুই বিজ্ঞানীর স্বপক্ষে মতামত দেন। ১৯৫৬র অক্টোবরে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডিসমদ অলটার নীল এবং অবলোহিত রশ্মির মাধ্যমে ছবি তুলে আলফোনসাসের চূড়ায় একটা ফিকে ধরনের আভা দেখতে পান। যেন ধূঁয়োর স্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে। তবে তার

নিকটবর্তী গহ্বর আরজাহেলে তেমন কিছু ঘটনা চোখে পড়ে নি। এ থেকে কারুর কারুর মনে এমন বিশ্বাসও জন্মায়, চাঁদের বুকে এখনও জীবন্ত আগ্নেয়গিরির লীলাখেলা সমানে চলেছে।

নিকোলাই কোজিরেভ বর্তমানে সোভিয়েত দেশের পুলকোভ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পদে আসীন। কিছুদিন আগে নভেম্বর ৩, ১৯৫৮ তারিখে তাঁর আবিষ্কার প্রসঙ্গে এ. পি. এন সাংবাদিক ওলেজ কোরোটসেভ তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। রীতিমত চমকপ্রদ উত্তর দিয়েছেন ডঃ কোজিরেভ। সেই সঙ্গে অভিনবও। আপনাদের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্যে মূল সাক্ষাৎকারটি এখানে উদ্ধৃত করলাম।

প্রঃ আলফোনসাস-এর সেই আলো সম্পর্কে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কি ধারনা ?

উঃ আলফোনসাস জ্বালামুখের মাঝ বরাবর ঢিবির চূড়া থেকে ধূঁয়ো বেরিয়ে আসছে—এ কথা যখন আমরা ঘোষণা করলাম তারপরই বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী জায়গাটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। একটি বিশেষ আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি হল। যার উপর দায়িত্ব পড়ল, মাঝে মাঝে চাঁদের বুকে যে সমস্ত অনিয়ত ঘটনা চোখে পড়ে তাদের নথিবদ্ধ করা। এরই মধ্যে এই সংস্থা তার প্রথম রিপোর্টটি পেশ করেছে। এতে প্রায় ছ'শ টির মত ঘটনা উল্লেখ করা হয়। এদের মধ্যে অদ্ভুত একটি ঘটনা হল চোদ্দ শতকের। বলা হয়, ঐ সময় ফ্লোরেন্সের লোকেরা নাকি বাঁকা চাঁদের ডগায় অন্ধকার স্থানে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে দেখতে পায়। এ কথাও বলা হয়, আসলে ওটা ঐ রাতে চাঁদের নিশীথ অঞ্চলে একটি আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণজনিত শিখা। বলে রাখি, এ সময়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয় নি। এর অনেক দিন পর বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হার্সেল বলেন, চাঁদের অ্যারিসটারকাস গহ্বরে তিনি আগ্নেয়-

গিরির অগ্ন্যুৎপাৎ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করতে চান নি। মনে হয় হার্সেল এবং অন্যান্য বিজ্ঞানী যা দেখেছেন বলে দাবী করেন, তা সত্য।

প্রঃ এর স্বপক্ষে কি ধরনের প্রমাণ দেওয়া সম্ভব, সে কথা কি আপনি বলবেন, ডক্টর ?

উঃ উপবৃত্তীয় পথে পরিক্রমণ করার সময় চাঁদ যখন পৃথিবীর খুব কাছে এসে পড়ে তখন তার মধ্যে আমরা অনেক বেশি করে নানা রকমের অনিয়ত ঘটনা দেখতে পাই। এই সময় চাঁদের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। তার ভূ-ত্বকের উপর যথেষ্ট টান পড়ে। তখন তার বুকে জোয়ারের মত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এর ফলে তার ভূগর্ভস্থ গ্যাসও কিছু পরিমাণে বেরিয়ে আসতে পারে।

প্রঃ এ ধরনের জোয়ারের টানে চাঁদের ভূ-ত্বক কতটা সামনের দিকে এগিয়ে আসে ?

উঃ চাঁদ এবং পৃথিবীর মধ্যে দূরত্ব যখন সবচাইতে কম, তখন জোয়ারের ফলে তার সামনেটা ঝুলে পড়তে পারে প্রায় ছয় মিটারের মত। তারপর যতই সে দূরে সরে যেতে থাকে এটা ততই কমে যায়। যখন সবচাইতে দূরে সরে যায় তখন দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে তিন মিটারের মত। পৃথিবীতেও এ ধরনের ব্যাপাব চোখে পড়ে। চাঁদের টানে তারও পিঠ ফুলে ওঠে। তবে অনেক কম। কুড়ি সেনটিমিটারের মত।

ডঃ কোজিরেভের বক্তব্য, পৃথিবীর ভূ-কম্পনের সঙ্গে চাঁদের ভূ-কম্পনের সম্পর্ক রয়েছে। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর এটা তাঁর দৃঢ় অভিমত। চাঁদে আগ্নেয়গিরি আছে এবং এই ভূ-কম্পনের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক বিদ্যমান এটাও তিনি বিশ্বাস করেন।

আরও একটি কথা। সূর্যের আলোয় চাঁদের পিঠ খুব কম

সময়ে দারুন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আবার ঠাণ্ডা হওয়ার সময় অতিক্রুত সেই তাপ মহাকাশে বিকিরিত হয়।

অত্যন্ত সংবেদনশীল তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে পেটিট এবং নিকলসন চাঁদের পিঠের তাপমাত্রা নির্ণয় করেছিলেন কয়েক বছর আগে। তাঁদের বক্তব্য, দুপুরের দিকে চাঁদের নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে একশ ডিগ্রি সেনটিগ্রেডে গিয়ে দাঁড়ায়। সূর্যাস্তের সময় এই তাপমাত্রা নেমে আসে চোদ্দ ডিগ্রি সেনটিগ্রেডে। আবার চাঁদের দীর্ঘ রাত্রে তা আরও নিচে নেমে যায়। গিয়ে দাঁড়ায় শূন্যেরও একশ পঞ্চাশ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড নিচে। এখানে উল্লেখ্য, আরমস্ট্রং এবং অলডরিন চাঁদের বুকে যে ভূকম্পন পরিমাপক যন্ত্রটি রেখে এসেছেন সেখানে একটানা রাত চলার সময় সেটি অচল হয়ে পড়েছিল। কারণ যে সৌর তড়িৎকোষ তাকে সচল রেখেছিল, সূর্য রশ্মির অভাবে তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন, দীর্ঘ রাত্রির সেই ঠাণ্ডা পরিবেশের মধ্যে যন্ত্রটির কলকব্জা এবং তড়িৎ কোষ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। সুখের বিষয়, তা হয় নি। দীর্ঘ রাতের শেষে চাঁদের বুকে সূর্যোদয় হবার পর আবার যন্ত্রটি নিয়মিত কাজ করতে থাকে। নভচরদের পক্ষে এত কম তাপমাত্রায় টিকে থাকার ব্যাপারটাও মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাছে একটা বড় রকমের সমস্যা ছিল।

যাই হোক, এই তাপমাত্রার পরিবর্তন দেখে বোঝা যায় চাঁদের ভূ-ত্বকের তাপ পরিবহন করার ক্ষমতা পৃথিবীর ভূ-ত্বক, বিশেষ করে গ্র্যানাইট, বেলে পাথর প্রভৃতির চেয়ে প্রায় এক হাজার গুণ কম। চন্দ্রগ্রহণের সময় দেখা গেছে যখন পৃথিবীর ছায়া সেখানকার কোন পাহাড়ের চূড়াকে ঢেকে ফেলে তখন তার তাপমাত্রা একঘণ্টার মধ্যেই প্রায় এক'শ চল্লিশ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড নেমে যায়। পেডিংটন এবং মিনে ১৯৪৯ এ আর একটি উপায়ে এই তাপমাত্রা

সম্পর্কে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছান। এঁরা এক'শ কুড়ি সেনটিমিটার ব্যাসের একটি ধাতব প্রতিফলকের সাহায্যে চাঁদের বুক থেকে বিকিরিত বেতার রশ্মি কেন্দ্রীভূত করেন একটি বেতার গ্রাহক যন্ত্রে। দেখলেন পেটিট এবং নিকলসন ভুল করেন নি। আর সবচাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার, চাঁদের বুকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কিন্তু ঠিক মধ্যাহ্নে পরিলক্ষিত হয় না। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দেখা যায় একটি দুপুরের পরবর্তী প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা পর। অনেকে এটাও অনুমান করেন, চাঁদের বাইরের আবরণী কোন ভারী পদার্থ দিয়ে তৈরী নয় এবং বেতার তরঙ্গ সহজেই ভেদ করতে পারে। সোভিয়েত বিজ্ঞানী এ. ওপারিন এবং ভি. ফেসেনকেভ পৃথিবী থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে সেখানকার কোন কোন অঞ্চলের ভূ-ত্বকের গভীরের তাপমাত্রাও নির্ণয় করেছিলেন।

এই সমস্ত পরীক্ষা থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল, চাঁদের পিঠের উপরের অংশ আগ্নেয়গিরির ভস্ম এবং অংশত উল্কা চূর্ণের পাতলা আবরণীতে ঢাকা। এর বেধ কয়েক সেনটিমিটার মাত্র। তার নিচে পড়ে আছে কঠিন শিলার স্তূপ। এদের তাপমাত্রার পরিবর্তন খুবই সীমিত।

এবার দেখা যাক চাঁদের আবহাওয়া মণ্ডল কি রকম হতে পারে। প্রশ্নঃ পৃথিবীর মত সেখানেও কি অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং জলীয় বাষ্প প্রভৃতি নিয়ে কোন বায়ুমণ্ডলের আচ্ছাদন থাকা সম্ভব?

তত্ত্বের দিক দিয়ে বলা হয়েছে সৃষ্টি মুহূর্তে চাঁদে আণবিক অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন ছিল। এখন নেই। সেখানে পৃথিবীর মত কোন গোধূলি দেখা যায় নি। বাতাসে সূক্ষ্ম ধুলো বা ধুঁয়ো মিশে থাকলে তার মধ্যে যখন সূর্য রশ্মি এসে পড়ে তখন যে

আলোর আভা দেখা যায় তারই নাম গোধূলি। যদি সেখানে বাতাস থাকত তাহলে এই গোধূলিও নিশ্চয় দেখতে পেতাম? সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের পূর্বে পৃথিবীতে আমরা গোধূলি দেখে থাকি।

পরবর্তীকালে আরও উন্নত ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে লিপসকি সিদ্ধান্ত করেন চাঁদে আবহাওয়া মণ্ডল আছে। কিন্তু তা অত্যন্ত হাল্কা। তার ঘনত্ব পৃথিবীর আবহাওয়ার দশ হাজার ভাগের এক ভাগ। তবে কয়েক বছর আগেও আলপস পর্বতের তিন হাজার মিটার শিখরে 'পিক ডু মিদি'তে অবস্থিত মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে কোন আবহাওয়া মণ্ডল আবিষ্কার করা যায় নি।

ইতিমধ্যে পদার্থবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হয়ে গেছে। পুরনো পদ্ধতির গবেষণা ছেড়ে বিজ্ঞানীরা এবার আধুনিক পদার্থবিদ্যার সাহায্য নিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানের রহস্য আবিষ্কার করতে। চাঁদের আবহাওয়া নিরূপনের ব্যাপারে এবার এক নতুন সূত্র ধরে তাঁরা অগ্রসর হলেন। এর নাম রেডিও অ্যাস্ট্রোনমি বা বেতার-জ্যোতির্বিদ্যা।

দেখা গেছে পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করার সময় চাঁদ মাঝে মাঝে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণের খুব কাছ ঘেঁষে চলা ফেরা করে। এটি হল টাউরাস নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত ক্র্যাব বা কর্কটরাশি। এই নক্ষত্রমণ্ডল মহাকাশে নিয়ত বেতার তরঙ্গ ছুঁড়ে দিচ্ছে।

ধরা যাক চাঁদের চারপাশে বাতাসের আচ্ছাদন রয়েছে। তাহলে সূর্য থেকে বিকিরিত অতি-বেগুনী রশ্মি সেই বাতাসকে অয়নিত করত। ফলে তার মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রোন কণা ঘুরে বেড়াত। সূর্য. থেকে আগত ঐ রশ্মির জন্যে পৃথিবীর উর্দ্ধ-বায়ুমণ্ডলে যা হয়ে থাকে আর কি। আর সেই ইলেকট্রোনের মধ্যে দিয়ে ক্র্যাব নক্ষত্রমণ্ডল থেকে আসা বেতার তরঙ্গ যদি অগ্রসর হয়

তাহলে সেই বেতার তরঙ্গের গতিপথের পরিবর্তন হওয়ার কথা। কিন্তু তেমন কোন দৃশ্য চাঁদের আকাশে চোখে পড়ে নি। জানুয়ারী ২৬, ১৯৫৬ কেমব্রিজ মানমন্দির থেকে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে সেখানে মুক্ত ইলেকট্রোনের অস্তিত্ব খুবই কম। বি. এলসমোর-এর মতে এই ইলেকট্রোনের পরিমাণ প্রতি ঘন সেনটিমিটার স্থানে এক হাজারটির বেশি কখনই হতে পারে না। এ থেকে একটি সিদ্ধান্তেই পৌছান সম্ভব, চাঁদের বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব পৃথিবীর সমুদ্রতলের বাতাসের এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। অর্থাৎ এক কথায় চাঁদ শুধু কঠিন বেসল্ট, বেলে পাথর অথবা জলহীন এক ভয়ঙ্কর রকমের শুষ্ক পরিবেশ। আর তার বুকের উপরটা দারুণ রকমের শূন্যতায় ভরা। পৃথিবীর গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তেমন শূন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা খুবই শক্ত।

গত শতাব্দী থেকেই চাঁদের থালার উপর কিন্তু অদ্ভুত একটি ব্যাপার অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীই লক্ষ্য করে এসেছেন। শক্তিশালী দূরবীক্ষণে মাঝে মাঝে দেখা গেছে সেখানকার কোন কোন অঞ্চলে যেন আবছা রঙের মত কি একটা জমে রয়েছে। কতকটা কুয়াশার মত। ১৮৯২এ চাঁদ যখন বৃহস্পতি গ্রহের সম্মুখে এসে পৃথিবী থেকে তাকে অদৃশ্য করে, সেই সময় পিকেরিং চাঁদের বুকে অদ্ভুত আবছা একটা কালো দাগ লক্ষ্য করেছিলেন। দাগটি ক্রমেই অগ্রসর হতে থাকে চাঁদের থালার শেষ প্রান্তের দিকে। যদি পিকেরিং-এর এই পর্যবেক্ষণ নির্ভুল হয় তাহলে বলা চলে ব্যাপারটা অত্যন্ত সাময়িক কোন ঘটনা। কারণ পরে ঐ একই অবস্থায় পর্যবেক্ষণ চালিয়ে আর কোন বিজ্ঞানী ঐ ধরনের ঘটনা দেখতে পান নি।

তবে ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৪৯ এ জ্যোতির্বিজ্ঞানী থরনটন চাঁদের হেরোডোটাস উপত্যকায় একটা আবছা আলো আঁধারি অংশ লক্ষ্য করেন। পঁয়তাল্লিশ সেনটিমিটার ব্যাসের একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে

অনুকূল আকাশের ভেতর দিয়ে সেদিন তাঁর দৃষ্টি ভ্রম হওয়ার কোন আশঙ্কাই ছিল না। থরনটন দেখলেন, এক মুঠো সাদা মেঘ যেন চাঁদের আকাশে ঝুলে রয়েছে। ফলে তার নিচের বেশ কিছুটা অঞ্চল ঠিকমত চোখে পড়ছে না। অথচ তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি যথাযথ স্পষ্ট এবং বেশ ভালভাবেই দেখা যাচ্ছিল।

মুর এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন থরনটন যা দেখেছিলেন সেটা সিকার্ড জ্বালামুখ। তার উপরটা সাদা ধূঁয়োর মত সামগ্রীতে ঢাকা থাকায় তিনি নিচের অংশটির কিছুই দেখতে পান নি। এ থেকে মনে হয় তখনকার পর্যবেক্ষকরা যখনই চাঁদের কোন অঞ্চলকে তার আশপাশের অঞ্চল থেকে কিছুটা অস্পষ্ট বলে মনে করেছেন তখন এই সিদ্ধান্তই করেছেন, হয়ত ঐ অঞ্চল কুয়াশা বা অনুরূপ কোন কিছুতে ছেয়ে আছে। এই ধরনের আবছা অঞ্চল শুধু সিকার্ডেই নয়, প্লেটো, টিমোকারিস প্রভৃতি জ্বালামুখেও দেখা গেছে।

অতএব একটি সিদ্ধান্তে আমরা পৌছতে পারি। বড় বড় সাগর অঞ্চলে ফোকর ওয়ালা পাহাড়, জ্বালামুখ এবং কঠিন জমাট যে সমস্ত শিলা দেখা গেছে তা অতীতের আগ্নেয়গিরির অস্তিত্বই প্রমাণ করে। সম্ভবতঃ আজও চাঁদের ফাটল বা আগ্নেয়গিরির মধ্যে দিয়ে কিছু কিছু বায়বীয় পদার্থ নির্গত হয়ে চলেছে। এক সময়ে চাঁদের বুক হয়ত সহস্র আগ্নেয়গিরি সমাবেশ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাদের সকলেই হয়ত আজ নিভে গেছে অথবা মৃত্যুর শেষ প্রহরে এসে ধিকি ধিকি জ্বলে চলেছে।

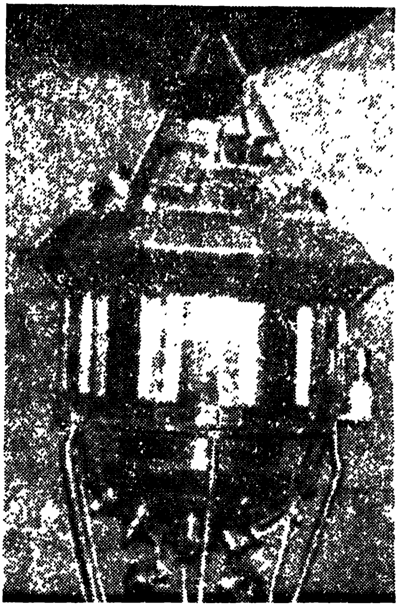
সুদূর অতীতে আমাদের এই উপগ্রহটি যথেষ্ট উত্তপ্ত ছিল। তাপমাত্রা কয়েক হাজার ডিগ্রির মত। ফলে তার গর্ভ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ বায়বীয় পদার্থ নির্গত হতে থাকে এবং মহাশূন্যের মধ্যে

ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ চাঁদের এসকেপ ভেলোসিটি বা মুক্তিবেগ। সেখানে এই মুক্তিবেগটি সেকেণ্ডে মাত্র তুই কিলোমিটার। একথা আগেই বলেছি, কোন বস্তুকে পৃথিবী পৃষ্ঠের সমান্তরাল করে কোন উঁচু জায়গা থেকে যদি সেকেণ্ডে প্রায় পাঁচ মাইল বেগে ঠেলে দেওয়া যায় তা হলে সেই বস্তুটি পৃথিবীর চারপাশে নিয়ত একটি উপগ্রহের মত পরিক্রমণ করবে। আর ঐ গতিবেগ যদি সেকেণ্ডে প্রায় সাত মাইল হয় তাহলে বস্তুটি পৃথিবীর কক্ষপথ ছেড়ে দূরে চলে যাবে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই সাত মাইল হল যে কোন বস্তুর মুক্তিবেগ। চাঁদের ক্ষেত্রে এই মুক্তি বেগ সে তুলনায় অনেক কম। সেই সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণও। ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, এমন কি অক্সিজেন অথবা নাইট্রোজেনের পক্ষেও পৃথিবীর আবহাওয়ার মত চাঁদের বুক আঁকড়ে থাকা সম্ভব নয়। চাঁদ ঘুরছে। সেই সঙ্গে তার বুকের ওপরকার আবহাওয়াও ঘুরছে, যা সহজেই সেখানকার মুক্তি বেগ পেয়ে যায়। অতএব এ ক্ষেত্রে সেখানে কোন বায়বীয় পদার্থের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয়। ঐ গতিবেগ পেয়ে তারা মহাশূন্যের দিকে চলে গেছে।

প্রশ্নঃ তাহলে কি চাঁদের দেশে কোন বাতাসই নেই? এই পৃথিবীর মত না হলেও অন্তত অন্য কোন রকমের আবহাওয়া?

গত এক দশক পূর্ব পর্যন্ত এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানা রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। সেই সঙ্গে হাজারো জল্পনা। আর এর যাবতীয় সূত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল চান্দ্রভূমির শুধু সেই অঞ্চলটি থেকে যেটি সর্বদা পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির অভিনব কৌশল এবং সেই সঙ্গে রকেট পরিচালনায় অভূতপূর্ব অগ্রগতির ফলে সোভিয়েত দেশ সর্বপ্রথম চাঁদের অপর পৃষ্ঠে, যা এর আগে মানুষ কোন দিনই দূরবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে দেখতে পায় নি, মহাকাশযান পাঠাতে সমর্থ হল।

সেটা ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৯। সোভিয়েত দেশের মহাকাশযান লুনিক-৩ সেই প্রথম চাঁদের বিপরীত পিঠের উপর বিচরণ স্থরু



লুনিক-৩

করল। উদ্দেশ্য, চাঁদের চির-অদৃশ্য ভূ-ভাগের ছবি তুলে পাঠান। এই ছবিগুলি ফটো-টেলিভিশন যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর গবেষণাগারে সংগ্রহ করা হয়েছিল।

চাঁদের বিপরীত পিঠের এই ছবিগুলি মোটামুটি পরিষ্কার উঠেছিল। এমন কি ছোট বড় গহ্বরের খুঁটিনাটি অংশগুলিও ক্যামেরা এড়িয়ে যায় নি। এই দিকটায় মাঝ বরাবর যে দুটি উঁচু পাহাড়ের চূড়া আছে ছবিতে তারা পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এদের নাম রেখেছেন যথাক্রমে লোমোনোসভ এবং জিওলকভসকি। এই সময় চাঁদের দৃশ্যমান পিঠে তখন পূর্ণিমার জোয়ার চলেছে। আর ছবি তোলার ক্যামেরাটি ছিল চাঁদ এবং

সূর্যের সমরেখা বরাবর। ফলে চাঁদের ঐ দিকের পুরোপুরি অংশের ছবি তোলা তখন সম্ভব হয় নি।

সে আর এক উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত! তাইতো? মানুষ এতদিন একথা তো কখনই ভাবে নি যে, অনাদিকাল থেকে সে শুধু তার একটি পিঠকেই দেখে এসেছে? সাধারণের কাছে ব্যাপারটা কম রোমাঞ্চকর নয়।

আর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ভূতাত্ত্বিকদের কাছে এ যেন হাতে চাঁদ পাওয়া। এই প্রথম তাঁরা চান্দ্রভূমির গঠন সম্পর্কে নতুন ভাবে ভাবতে সুরু করলেন। দেখা গেল চাঁদের উভয় পিঠের মধ্যে মিল যেমন আছে, অমিলও বড় কম নেই। এ পাশের গহ্বর বা জ্বালা-মুখগুলি, বিশেষ করে পূর্ণিমার সময় যেমন মসৃন এবং চকচকে দেখায় ও পাশের গহ্বর বা জ্বালামুখে তেমন কিছু চোখে পড়ল না। এতে মনে হয় সেখানে হয়ত কোন আগ্নেয়গিরি নেই।

তা ছাড়া চাঁদের বিপরীত দিকটায় এ পাশের মত অত বেশি কালো দাগ নেই। এর অর্থ চাঁদে দৃশ্যমান অঞ্চলে যাদের আমরা সাগর বা মহাসাগর বলে বর্ণনা করেছি, তেমন ধরনের কোন অঞ্চল তার অদৃশ্য অঞ্চলে খুব কমই আছে। আর সবচাইতে অদ্ভুত ব্যাপার চাঁদের ও পিঠের চেহারাটি যেন পৃথিবীরই অনুরূপ। পৃথিবীর বিষুব রেখার দক্ষিণাঞ্চলে ভূ-ভাগের চেয়ে জলভাগের পরিমাণ যেমন বেশি, চাঁদেও এপাশে যত সাগরের মত নিচু অঞ্চল বিরাজ করছে, ওপাশে সে ধরনের অঞ্চল তত বেশি নেই। পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে যেমন সবচাইতে উঁচু পর্বত চূড়া, দীর্ঘ পর্বতমালা, মালভূমি প্রভৃতির ভিড় সবচাইতে বেশি, চাঁদেরও ওপাশটায় তেমনি এ পাশের তুলনায় অনেক বেশি উঁচু পাহাড়, মালভূমি প্রভৃতি দেখা গেছে।

এই যে পার্থক্য, এটাকে নিছক একটি আকস্মিক ঘটনা বলে

কেউ উড়িয়ে দিতে চান না। অনেকেই জানেন, চাঁদের আকৃতি পুরোপুরি ঠিক গোলকের মত নয়। এর উপরিভাগ পৃথিবীর দিক বরাবর বেশ কয়েক মাইল এগিয়ে এসেছে কতকটা নারকেলের মত। যেন একটি বিরাট বন্যার ঢেউ হঠাৎ উৎক্ষিপ্ত হয়ে স্থির হয়ে থেমে গেছে। অতএব অনুমান করা শক্ত নয়, চাঁদের ভূত্বকের সব দিকটা ঠিক সমান ভাবে বিস্তৃত নয়। তাই মনে হয়, সেখানে যখন গহ্বর বা বলয়ের মত পাহাড়গুলি প্রায় গঠিত হয়ে গেছে তখনও সেখানে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরিগুলি সক্রিয় ছিল। তখনও তার বুকের বিরাট একটি অংশ গলিত অবস্থায় ছুটোছুটি করেছে। অবশেষে শীতল হয়ে সৃষ্টি করেছে কঠিন বন্ধুর উপত্যকা বা সাগরের মত নিম্নভূমি।

১৯৬০ পর্যন্ত চাঁদ সম্পর্কে এই ছিল মোটামুটি ধারনা।

তবে গত দশকেই বিশেষজ্ঞরা চাঁদ সম্পর্কে দুটি ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন। এক, বাইরে থেকে এই উপগ্রহটিকে একটি মৃত, শীতল এবং ঊষর ভূগোলক বলে মনে হলেও এর অভ্যন্তর ভাগ এখনও তপ্ত। সেখানে আজও ভাঙ্গা-গড়ার খেলা থেমে যায় নি। দুই, এর বুকে জৈবিক প্রাণের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

স্পুতনিক-১ উৎক্ষেপনের পরবর্তী সাত বছরের মধ্যে মহাকাশ অভিযানের যাবতীয় সমস্যা মানুষের আয়ত্বের মধ্যে এসে গেল। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করে সুদূর আকাশে বিচরণ করার মত শক্তিশালী রকেট সম্পর্কে এতদিন যে অনিশ্চয়তা বিজ্ঞানীদের মনে কিছুটা জিজ্ঞাসার জাল সৃষ্টি করে রেখেছিল ক্রমে সেটাও অপসৃত হল। দূর আকাশে পরিক্রমণরত মহাকাশযানের গঠন, তাদের উপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার মত ব্যবস্থা, পৃথিবীর সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ এবং নির্দিষ্ট কক্ষপথে তারা যাতে বিচরণ করে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে পারে, এমন অনেক

সমস্যারই বেশ কিছুটা সমাধান হয়ে গেল। প্রশ্ন উঠেছিল, একটি জড়-কৃত্রিম উপগ্রহ বা মহাকাশযানের পক্ষে দূরাকাশে বিচরণ হয়ত বা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর পক্ষে দূর গগন বিহার আদৌ কি সম্ভব?

এ প্রশ্নেরও সমাধান হয়ে গেল ১২ই এপ্রিল, ১৯৬০। সোভিয়েত দেশের মানুষ ইউরি গ্যাগারিন ঐ দিন মহাকাশের কক্ষপথে বিচরণ করে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে বসলেন। দূরাকাশে মানুষ পাঠিয়ে তাকে যে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করল। আর সেই মুহূর্তেই পুরনো স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার ব্যাপারে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা উঠে পড়ে লাগলেন। সেদিনের সেই প্রয়াস বিস্তৃত নদীর বুকে সেতু বন্ধনের মত। প্রথমে এক পাড় থেকে সুরু করে ধীরে ধীরে একটি একটি করে স্তম্ভ গেঁথে যাওয়া। এ পাড়ের সঙ্গে প্রথম স্তম্ভের যোগ। সেই যোগ ধরে এগিয়ে গিয়ে আর একটি স্তম্ভ গেঁথে নিয়ে তার সঙ্গে প্রথম স্তম্ভের সংযোগ স্থাপন। এমনি করে ওপাড়ের দিকে অগ্রগতি। অতি সন্তর্পণে, যথেষ্ট লক্ষ্য রেখে।

একদিকে চলল মহাকাশ গবেষণা। কি ভাবে সেই গবেষণাকে মানব কল্যাণে কাজে লাগান যায় তার পরিকল্পনার রূপায়ন। তৈরি হল কসমস, প্রোটন, মলনিয়া, নিম্বাস, টাইরস, টেলস্টার প্রভৃতি কৃত্রিম উপগ্রহ। এরা কেউ আবহাওয়া সংবাদ যোগাতে সুরু করল। কেউবা দূর দেশের মধ্যে বেতার সংযোগ স্থাপন করে বার্তা বিনিময় অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করল। সে কথা আগেই বলেছি।

আর তারই মাঝে চাঁদের হাতছানি যেন স্পষ্ট এবং আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। কল্পকথার চাঁদকে মানুষের স্পর্শের মধ্যে চাই। চাঁদ দূরাকাশ যাত্রার প্রথম পান্থশালা হবে। রূপকথা উপকথার চাঁদকে চাই মানুষের চাঁদ হিসেবে। শুধু দূর থেকে

দেখা নয়, চাই চাঁদের বুকে পা ফেলে চলা। আশা নিরাশার দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে এই আকাঙ্খাই তখন প্রবল হয়ে উঠল সকলের মনে।

কিন্তু তারও আগে চাই সেই লক্ষ্য বস্তুটি সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ। এ পর্যন্ত চাঁদ সম্পর্কে যত কিছুই আমরা জেনে থাকি বা ভেবে থাকি, সেটাই সব নয়। মানুষকে চাঁদে পাঠানর আগে তার নিরাপত্তার জন্যে সম্ভাব্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাই সেই ১৯৬০ র পর থেকেই সোভিয়েত দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথক ভাবে চাঁদের উপর বিশেষ ধরনের গবেষণা সুরু করলেন। আর এর জন্যে সাহায্য নেওয়া হল পুরোপুরি মহাকাশযানের।

১৯৫৯ থেকে ১৯৬০ র মধ্যে এই এক বছরে মার্কিন দেশ চাঁদের দেশে পাঠালেন তিনটি মহাকাশযান। রেনজার ১, ২, ৩। এরা প্রত্যেকেই সেখানে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তবে ধ্বংস হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একান্ত অনুগতের মত এরা প্রয়োজনীয় তথ্য পাঠিয়ে গেছে। সেই সঙ্গে চাঁদের নিকটতম অঞ্চল থেকে চাঁদের দেশের সতের হাজার ছবি। এর পরই সোভিয়েত দেশের মহাকাশযান লুনা-৯ সর্বপ্রথম চাঁদের বুকে নেমে একটি ব্যাপক অঞ্চলের অত্যন্ত খুঁটিনাটি বস্তুর আরও পরিস্কার ছবি পাঠাল ১৯৬০ তে। আর তার কিছুদিন পর ছবি তুলল মার্কিন মহাকাশযান সারভেয়ার-১। পরবর্তী কয়েক মাসে আরও কয়েক হাজার ছবি পাওয়া গেল লুনা এবং অরবিটার-১, ২ ও ৩, এর সাহায্যে। এই সমস্ত মহাকাশযান বহু কাছ থেকে ছবি তোলায় এবার চাঁদ সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য যোগাড় করা সম্ভব হল।

মানুষের চোখে চন্দ্রলোক ফুটে উঠল আরও পরিস্কার ভাবে। এমন কি কোন ছবিতে এক মিলিমিটারের চেয়েও সূক্ষ্ম বস্তুর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল। প্রশ্ন উঠল আবার। চাঁদের পিঠের

আসল স্বরূপটি তাহলে কেমন হতে পারে? অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্ন। দূর থেকে সাহারার বুক একটি পুরু বালির আস্তরণের মত মনে হলেও তারই নিচে কোথায় যে চোরাবালির গহ্বর আড়ি পেতে আছে মরুযাত্রীর কাছে এটা যেমন একটি বড় প্রশ্ন, চন্দ্র-যাত্রীর কাছে চাঁদের ভূমিও তেমনই এক বিরাট প্রশ্ন। এর পূর্বে দূরবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়ে নানা রকম মতবাদ তৈরি হয়েছে। এবার একেবারে কাছ থেকে তোলা এই সমস্ত ছবি দেখে ঠিক করে নিতে হবে পুরনো দিনের সেই মতবাদের কতটা গ্রহণযোগ্য, কতটা নয়। চাঁদের গঠন সম্পর্কে ঐ ছবি কি নতুন কোন উত্তর যোগাতে সক্ষম হবে? অথবা, চাঁদের জন্ম সম্পর্কে অভিনব কোন বার্তা? এ সম্পর্কে আধুনিক মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কি ধারনা সেটা কিছু পরে আলোচনা করছি।

মার্কিন দেশের মহাকাশযান রেঞ্জার সারভেয়ার বা অরবিটারের মূল লক্ষ্য কিন্তু ছিল ১৯৬০ এর পূর্বে মানুষ যাতে চাঁদে অবতরণ করতে পারে তারই সম্পর্কে নিশ্চিত এবং নির্ভরযোগ্য পথের সন্ধান যোগান। তাই শুধু কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহ করার মত উপযুক্ত করেই এই সমস্ত মহাকাশযান তৈরি করা হয় নি। ওঁরা চেয়েছিলেন ওদের সাহায্যে মহাকাশ ভ্রমণের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করতে এবং নতুন ধরনের যান তৈরির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। যা মানুষের চন্দ্রযাত্রাকে সুগম করে তুলবে। আর সেই সঙ্গে চাঁদের যে অঞ্চলটিতে মানুষবাহী অ্যাপলো মহাকাশযান অবতরণ করবে তার সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবর জেনে নিতে। দেখতে হবে জায়গাটা যাতে মসৃন হয়। তার ভূমির আস্তরণ যেন কঠিন হয়।

ফলে সোভিয়েত এবং মার্কিন দেশের ঐ সমস্ত যান সেদিন

চাঁদ সম্পর্কে যে তথ্যাবলী পাঠিয়েছিল মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তাদের উপর নতুন ভাবে গবেষণা সুরু করে দিলেন। এর মূল লক্ষ্য ঃ এর বাইরের তলটিকে জানা, এর আভ্যন্তরিক গঠন, ইতিহাস এবং নতুন করে তার সৃষ্টিতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা। ১৯৬০ র পূর্বে বিগত একশ বছর চাঁদ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান মোটামুটি একই ছিল। মেঘ, কুয়াশা, বায়ুমণ্ডল অথবা ধূলিকণায় আচ্ছন্ন আকাশের বুক ফুঁড়ে সেদিন আমাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ঝাপসা দৃষ্টির সাহায্যে চন্দ্র-রহস্যের যা কিছু তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম, এবার মহাকাশের বায়ুহীন পরিবেশে এবং লক্ষ্য বস্তুর নিকটতম স্থান থেকে ছবি তোলায় তা আরও পরিস্কার, আরও সহজ হয়ে দেখা দিল বিজ্ঞানীদের চোখে। এই ছবিগুলি অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য এবং আগের তুলনায় এক লক্ষ গুণ উন্নত হয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত দেশের মহাকাশযান সেদিন চাঁদের বুকের যে ছবি পাঠিয়েছিল তা থেকে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল। বস্তুত তারা গত পাঁচ বছরের সীমিত সময়ে অতীতের সমস্ত ধারনার মূলে যেন কুঠারাঘাত হেনেছে। সেই তথ্য সম্পর্কে কথা বলার আগে চাঁদের সৃষ্টি তত্ত্বের উপর সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা যাক।

প্রশ্ন ঃ চাঁদ কি সত্যিই পৃথিবী থেকে সৃষ্ট হয়েছিল ?

বিজ্ঞানীরা দ্বিধাগ্রস্ত। চাঁদের সৃষ্টিরহস্য নিয়ে নানা রকম মতবাদ প্রচলিত থাকলেও তাদের সকলকে পাশে ঠেলে দিয়ে আজ তাঁরা এক ত্রিমুখী সঙ্গমে এসে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন। চাঁদের জন্ম-ইতিহাস সম্পর্কে আজ তিনটি মত প্রচলিত। তিনটিই যথেষ্ট যুক্তি সম্মত।

প্রথম মতবাদটি এই ঃ চাঁদ পৃথিবীরই অংশ ছিল। সৃষ্টির সেই আদিম যুগে পৃথিবী তার অক্ষের চারপাশে আরও বেশি জোরে পাক খেত। হঠাৎ কোন এক আবর্তন মুহূর্তে পৃথিবীর খানিকটা অংশ ছিটকে বেরিয়ে যায়। এক সময়ে সেই অংশ ক্রমে দূরে সরে এসে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করতে সুরু করে। এটাই সেই চাঁদ।

দ্বিতীয় মতবাদ ভিন্নতর। এতে বলা হয়েছে পৃথিবী যে ভাবে গঠিত হয়েছে, চাঁদও সেই ভাবেই গঠিত। কেউ কারুরই অংশ নয়। মহাকাশের ধূলিকণা এবং বায়বীয় পদার্থ একত্রিত হয়ে জমাট বেঁধে পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছিল। যে ভাবে নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়ে থাকে। চাঁদেরও সৃষ্টির মূলে ঐ একই কথা। তবে কোন কারণে সে পৃথিবীর কাছে এসে পড়ে এবং অবশেষে তার প্রবল মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে একদিন সে উপগ্রহরূপে পৃথিবীর চারপাশে বিচরণ করতে সুরু করে।

কিন্তু একেবারে ভিন্নমত পোষণ করে তৃতীয় মতবাদটি। এর বক্তব্য, বর্তমানের চাঁদ মুখ্যত একটি স্বাধীন গ্রহের মতই একদিন মহাকাশে বিচরণ করত। নিজস্ব কক্ষপথে পরিক্রমণ করার সময় কোন কারণে সে পৃথিবীর কাছে চলে আসে এবং তার প্রবল আকর্ষণ বলের মধ্যে বন্দী হয়ে যায়। গ্রহ তখন একটি উপগ্রহে পরিণত হয়ে যায়।

প্রথম দিকে সহজ মনে হলেও এই তিনটি মতবাদের প্রত্যেকটিই শেষ পর্যন্ত একেবারে যে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পেরেছে সে কথা বলা চলে না। ঘূর্ণায়মান একটি বস্তুর কিছুটা অংশ যখন বিচ্ছিন্ন হতে থাকে তখন তার দশাটি কেমন হতে পারে সেটা হিসেব করা অবশ্য খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয়। অন্ততঃ ঠিক যে মুহূর্তে তারা পরস্পর বিভক্ত হয় সেই মুহূর্তে তো বটেই। অতএব মনে করুন চাঁদ এক সময়ে পৃথিবীর অংশ ছিল। তখন পৃথিবীর ভরও নিশ্চয় বর্তমানের চেয়ে বেশি ছিল। কোন বস্তু যখন তার অক্ষের চারপাশে ঘোরে তখন তার যান্ত্রিক শক্তি এবং কৌণিক ভর-বেগ বের করাটা মোটেই শক্ত ব্যাপার নয়। ধরুন তারপর সেই আদি পৃথিবী থেকে খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্তমান চাঁদ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই চাঁদ এবং পৃথিবীর আবর্তন বেগ আমাদের জানা। অতএব তাদের পৃথক পৃথক যন্ত্রিক শক্তি এবং কৌণিক গতিবেগও সেই সঙ্গে আমরা বের করে নিতে পারি।

অবিনাশিতার সূত্র থেকে অনেকেই জানেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে শক্তি বা ভরবেগকে কখনও ধ্বংস করা যায় না। তারা শুধু স্থানান্তরিত বা রূপান্তরিত হতে পারে। অতএব আমরা বলতে পারি বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পৃথিবী এবং চাঁদের যান্ত্রিক শক্তি ও কৌণিক ভরবেগ একত্রে সেই আদিম পৃথিবীর যান্ত্রিক শক্তি বা কৌণিক ভরবেগের সমান হওয়া উচিত? কিন্তু বাস্তবে এই হিসেবটি মোটেই মিলছে না। দেখা গেছে

এদের মিলিত শক্তির বর্তমান পরিমাণ অবিভক্ত পৃথিবীর শক্তির পরিমাণের চেয়ে শতকরা প্রায় চুরানব্বুই ভাগ কম। আর কৌণিক ভরবেগের ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ শতকরা প্রায় তিয়াত্তর ভাগ।

প্রশ্নঃ এত বেশি পরিমাণ শক্তি বা ভরবেগ গেল কোথায়? বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় বা পরে ঘর্ষণ অথবা তাদের গলিত বা বায়বীয় পদার্থের প্রচণ্ড স্ফিতির ফলে কিছু পরিমাণ শক্তির অপচয় হওয়া অসম্ভব নয়। হয়ত এর জন্যেই হিসেবের এমন গরমিল। কিন্তু সে অপচয়েরও তো সীমা আছে? এখনও পর্যন্ত এমন কোন সঠিক ভৌতিক কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নি যাতে করে নিশ্চিতভাবে বলা চলে কেন এবং কিভাবে এত বেশি পরিমাণ শক্তি হারিয়ে গেল। কৌণিক ভরবেগের ক্ষেত্রেও ঐ একই প্রশ্ন আসে। এ থেকে মনে হয় চাঁদ কোনদিনই পৃথিবীর অংশ ছিল না।

দ্বিতীয় মতবাদ। এতে বলা হয়েছে, একই ধরনের মহাজাগতিক ভস্ম বা বায়বীয় পদার্থ থেকে পৃথক ভাবে পৃথিবী এবং চাঁদ জন্ম লাভ করেছিল। কিন্তু মুস্কিল হল চাঁদের বর্তমান গড় ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের ষাট শতাংশ মাত্র। তাহলে চাঁদের মাটি, ধুলো বা পাথর পৃথিবীর চেয়ে হাল্কা। তাই বা কি করে সম্ভব হতে পারে? কেউ কেউ মনে করেন সৃষ্টির পর চাঁদের দেশে সম্ভবতঃ কোন পরিবর্তন ঘটে যায়। সে কারণেই এমনটি ঘটেছে। কিন্তু এটাও তেমন কোন স্পষ্ট বক্তব্য হতে পারে না।

তুলনামূলক ভাবে তৃতীয় মতবাদকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। গতিতত্ত্বের দিক দিয়ে এটির ব্যাখ্যা করা কিছুটা জটিল। সীমিতও বটে। তবে প্রথম মতবাদের চেয়ে অনেকটা পরিস্কার। যেটুকু অস্পষ্ট সেটা হল, কিভাবে ভিন্ন পরিক্রমণ পথের একটি গ্রহকে পৃথিবী নিজের আকর্ষণের প্রভাবে নিজের একটি উপগ্রহতে পরিণত

করল তার সঠিক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া। সম্প্রতি লস অ্যানজেলেসের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ গর্ডন জে. এফ. ম্যাক-ডোনাল্ড এবং আরও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ মিলিত ভাবে হিসেব করে দেখিয়েছেন, ব্যাপারটা অসম্ভব নয়। এঁরা নতুন দুটি পরিক্রমণ পথের ছক এঁকে দেখিয়েছেন, যদি ঐ পথে পৃথিবী এবং চন্দ্র পরস্পর গ্রহরূপে পরিক্রমণ করে তাহলে কোন এক সময়ে চাঁদের পক্ষে পৃথিবীর সান্নিধ্যে চলে আসাটা খুব অসম্ভব ব্যাপার নয়। এবং যদি তা ঘটে তাহলেই চাঁদের পক্ষে বর্তমান কক্ষপথে পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করা সম্ভব।

চাঁদের জন্ম সম্পর্কে এই তিনটি মতবাদ ছাড়াও তার জীবন ইতিহাসের উপরও বিভিন্ন সময়ে নানারকম মতামত পোষণ করা হয়েছে। সৃষ্টির পরবর্তীকালে চাঁদের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে তিনটি তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তপ্ত তত্ত্ব, উষ্ণ তত্ত্ব এবং হিম তত্ত্ব।

তপ্ত তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, অতীতকাল থেকে চাঁদের অভ্যন্তরে তপ্ত গলিত পদার্থের নিয়মিত আলোড়ন ঘটে এসেছে। ঘটেছে তার বাইরের ভূ-প্রকৃতিতেও। এমন কি কেউ কেউ মনে করেন সেখানকার বেশির ভাগ গহ্বরই সৃষ্টি হয়েছিল আগ্নেয়গিরির কার্যাবলীর ফলে। এই তত্ত্বের সবচাইতে লক্ষণীয় প্রতিপাদ্য, চাঁদের বুকে যাদের আমরা সাগর বলে চিহ্নিত করেছি, সেগুলি তৈরির মূলে ছিল লাভা বা ভস্মের নিয়মিত সঞ্চারণ।

গলন্ত পদার্থের প্রবাহ চাঁদের বুকে যে বিচরণ করেছে তার কিছু কিছু প্রমাণও আমরা পেয়েছি। উদাহরণ, মেয়ার ইমব্রিয়ামে অবস্থিত যে নিচু পাহাড়গুলি রয়েছে তাদের দেখলে মনে হয় গলন্ত কোন বস্তুর প্রবাহ যেন হঠাৎ স্থির হয়ে ফুলে ফেঁপে ঐ পাহাড়গুলির মত উঁচু হয়ে জমে গিয়ে তৈরি করেছে অচঞ্চল শিলাস্তূপ। সম্প্রতি ফিলটার বা আংশিক আলো প্রতিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণ করে

অতিবেগুনী বা অবলোহিত রশ্মির মাধ্যমে চাঁদের বিভিন্ন ধরনের ছবি তোলা হয়। সেই সমস্ত ছবি পরীক্ষা করে দেখা গেছে গলন্ত পদার্থের প্রবাহের চিহ্ন পরিস্কার তার বুকে ফুটে রয়েছে।

হিম তত্ত্বের প্রবক্তরা কিন্তু ভিন্ন কথা বলছেন। এঁদের.বক্তব্য, চাঁদে দারুন রকমের আগ্নেয়গিরির প্রতিক্রিয়া কোনদিনই তেমন ছিল না। বিশেষ করে তার পৃষ্ঠদেশে তো নয়ই। বাইরের জগত থেকে ক্রমান্বয়ে উল্কা বা অনুরূপ কোন বস্তুর নিয়মিত আঘাতের ফলেই চাঁদের পিঠে কোথাও বা পাহাড়, কোথাও গহ্বর। এই মতাবলম্বীদের কারুর কারুর ধারনা, এর ভূ-ত্বকের বাইরের আবরণী মুখ্যত বরফ দিয়ে তৈরি। পুরু ধুলোর আস্তরণ তাকে ঢেকে রেখেছে। ফলে সূর্যের উত্তাপ তার কোন ক্ষতিই করতে পারছে না। তবে আভ্যন্তরীণ উত্তাপের ফলে কিছুটা বরফ সেখানে বাষ্পে পরিণত হয়ে থাকে।

পূর্বের দুই তত্ত্বের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে উষ্ণ তত্ত্ব। এতে বলা হয়েছে, চাঁদে প্রচণ্ড আগ্নেয়গিরি যেমন তার গঠন বা প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করেছে, তেমনি বাইরে থেকে ঝরে পড়া উল্কাও প্রচুর সংখ্যক জ্বালামুখ বা গহ্বর সৃষ্টি করে তার চেহারাটিকে বর্তমানের মত করে তুলেছে।

কিন্তু এত সবের পরও আরও একটি জটিল তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন ডঃ হ্যারল্ড সি· ইউরে। চাঁদের ইতিহাস এবং তার রাসায়নিক ও ধাতব প্রকৃতির কারণ সম্পর্কে একটি নতুন ধরনের চিন্তার আশ্রয় নিয়েছেন ডঃ ইউরে। তাঁর বক্তব্য, সৃষ্টির আদিকালে মহাজাগতিক ভস্ম এবং বায়বীয় পদার্থ জড়ো হয়ে এক সময়ে চাঁদেরই আকারের অনেকগুলি বড় বড় পিণ্ডের সৃষ্টি করে। পরে এই পিণ্ডগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষের সুরু হয়। এর ফলে তাদের বেশির ভাগই ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই ভগ্নাংশের কিছু কিছু তৈরি করে

উল্কাপিণ্ড। আর অবশিষ্ট অংশগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে তৈরি করেছে যাদের আমরা আজ গ্রহ বলি তাদের।

ডঃ ইউরের মতে, চাঁদ প্রথম তৈরি সেই পিণ্ডেরই একটি। পূর্বে আলোচিত তত্ত্ব অনুযায়ী এটাই শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর আকর্ষণ বলের মধ্যে এসে পড়ে এবং তার বন্দীত্ব গ্রহণ করে উপগ্রহ রূপে আবর্তন সুরু করে। এই মতবাদে একটি সমস্যার কিন্তু সমাধান হয়ে গেল। সেটা হল, চাঁদ এবং পৃথিবীর গড় ঘনত্বের প্রশ্ন। প্রথম তৈরি সেই প্রাথমিক পিণ্ড এবং পরে সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট অংশ দিয়ে তৈরি গ্রহের ঘনত্বের মধ্যে পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। প্রাথমিক পিণ্ডগুলির এক একটি স্বতন্ত্র ভাবে তৈরি হওয়ায় তাদের পারস্পরিক ঘনত্বের মধ্যে প্রভেদ থাকা সম্ভব। আর গ্রহগুলি বিভিন্ন পিণ্ডের খণ্ডিত অংশ দিয়ে তৈরি বলে তাদের ঘনত্ব নিশ্চয় স্বতন্ত্র হবে। অতএব চাঁদ এবং পৃথিবী যদি এক একটি নক্ষত্রের মত পৃথক পৃথক ভাবে তৈরি হয় তাহলে তাদের ঘনত্বও পৃথক হতে পারে। সেই সঙ্গে শক্তি এবং গতিতত্ত্বের হিসেব অনুযায়ী তাদের গতি শক্তি এবং কৌণিক ভরবেগও।

চাঁদের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা নির্ণয় করাও আজকের দিনে তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। সাধারণ অঙ্ক কষেই সে হিসেব বের করে নেওয়া সম্ভব। তবে তার ফলাফল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই গণনা চালনার সময় আমাদের জানা দরকার চাঁদে ঠিক কতটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে তার হিসেব। সেই সঙ্গে চান্দ্র-পদার্থের তাপ-পরিবাহিতা। অর্থাৎ তার ভূত্বকের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে কতটা পরিমাণ উত্তাপ শক্তি প্রবাহিত হয়, তাই। ধরা যাক চাঁদের প্রারম্ভিক তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রি সেনটিগ্রেড। সেখানে যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, সাধারণতঃ কঠিন উল্কা

পিণ্ডের মধ্যে যে হারে তা পাওয়া যায়, তারই অনুরূপ। উল্লেখ্য, এই পরিমাণ, পৃথিবীর কঠিন স্তরের মধ্যে অবস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের চেয়ে অনেক কম। আর ধরা যাক চাঁদের তাপ পরিবাহিতা মোটামুটি সিলিকন গঠিত পাথরের অনুরূপ। এই অনুমানের উপর নির্ভর করে বলা চলে চাঁদের কেন্দ্রভাগে গত তিন শ কোটি বছরে ঠিক সেই পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার দ্বারা লোহাকে গলিয়ে ফেলা সম্ভব। লোহার বিগলনের তাপমাত্রা প্রায় পনের শ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় প্রায় দেড়শ কোটি বছর আগে চাঁদের তাপমাত্রা ছিল ছ শ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড তাহলে ইতিমধ্যে তার ভূ-পৃষ্ঠ থেকে তিনশ মাইল অভ্যন্তরেই ঐ পনের শ ডিগ্রি সেনটিগ্রেড তাপমাত্রা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া সম্ভব। বলে রাখি, চাঁদের ব্যাসার্ধ প্রায় দু হাজার এক শ যাট মাইল। অতএব চাঁদের হৃৎপিণ্ড এখনও হিম শীতল একথা বলা চলে না।

এই তাপমাত্রা নির্ণয়ের পেছনে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। মনে রাখতে হবে পৃথিবীতে ভূ-কম্পনের অন্যতম কারণ তার অভ্যন্তর ভাগের গলিত তপ্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়া। আজও পৃথিবীর ভূত্বকের নিচে কোথাও সেই তরল পদার্থ জমে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সঙ্গে তার আয়তন হচ্ছে সঙ্কুচিত। পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন এবং সম্প্রসারণের ফলে কোথাও ভূত্বক বসে যাচ্ছে বা হঠাৎ ফুলে উঠছে উপরের দিকে। এরই ফলে ভূকম্পন। চাঁদের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রার পরিবর্তনের এই হিসেব থেকে জানা যাবে পৃথিবীর মত সেখানেও কতটা সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন চলতে পারে। কি ধরনের ভূ-কম্পন সেখানে হয়ে থাকে। এই ভূ-কম্পন নিশ্চয় তার পিঠের উপর তার চিহ্ন এঁকে দেবে। এবং তাদের সহজে আমরা চিনেও ফেলতে পারি। কিন্তু গহ্বর বা জ্বালামুখগুলির চেহারা দেখে মনে হয় না আদৌ ঐ ধরনের কম্পন সেখানে ঘটেছিল।

চাঁদের তাপমাত্রার উপর হিসেব চালিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জন্মের পর প্রথম তিনশ কোটি বছর চাঁদের আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিগত দেড়শ কোটি বছর এই বৃদ্ধি পাওয়াটা বন্ধ হয়ে আছে। অর্থাৎ আজকের চাঁদ যত বড়, গত দেড়শ কোটি বছর ধরে সে তত বড়ই থেকে গেছে। এখানে অবশ্য ধরে নেওয়া হয়েছে চাঁদ এবং পৃথিবীর বয়েস সমান। প্রায় সাড়ে চার শ কোটি বৎসর।

যদি তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ সেখানে বেশি থাকত তাহলে তার অভ্যন্তর ভাগে আরও বেশি পরিমাণ লোহা বা সিলিকন ঘটিত পাথরের চিহ্ন ধরা পড়ত। তাহলে চাঁদের বাইরের দিকটা আজ লক্ষ লক্ষ আগ্নেয়গিরি বা গলিত লাভার জোয়ারে মুখরিত হয়ে থাকত। ফলে বাইরে থেকে ঝরে পড়া বড় বড় উল্কার চাঁই এর আঘাতের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া সেখানে সম্ভব হত না। গলিত লাভার আস্তরণে তারা মিলিয়ে যেত। আর পৃথিবীর মত বড় বড় পর্বত এবং কঠিন ভূ-ত্বকের খাঁজে ভরে থাকত চন্দ্রলোক। এ থেকে মনে হয় চাঁদের সৃষ্টির ব্যাপারে তপ্ত-তত্ত্ব বিশেষ অনুকূল নয়। অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে বিভিন্ন তত্ত্বকে যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত মনে হলেও শেষ পর্যন্ত চাঁদের জন্ম ইতিহাসের বহু জিজ্ঞাসাই অমীমাংসিত হয়ে রয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার সত্যিকারের ভূ-তাত্ত্বিক প্রশ্নও।

সবই যেন অন্ধকারে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে পথ চলা। চাঁদকে নিয়ে মানুষের নিত্য নতুন জল্পনার শেষ নেই। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দূর আকাশের স্বপ্ন জড়ান উপগ্রহটির দিকে যত বার চাওয়া গেছে তত বারই মনে হয়েছে এ যেন আরও কোন নতুন জিনিস। জল্পনা কল্পনার মাকড়সার জালকে কাটিয়ে তত্ত্বও তৈরি হয়েছিল অনেক। রীতিমত কৌতুহলোদ্দীপক সেই তত্ত্ব শুধু বিজ্ঞানী নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। প্রতিবারই মনে হয়েছিল এই বুঝি সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। চাঁদকে সত্যি সত্যিই আমরা জেনে ফেলেছি। আর সব সময় কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই গেছে। এর প্রধান কারণ, চাঁদের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে যত কথাই আমরা বলে থাকি না কেন, একটি কথা আমরা কখনই ভুলতে পারিনি, বরং বলা চলে যেন আমরা ভুলতে চাই নি। সেটা হল, চাঁদ পৃথিবীরই অংশ। পৃথিবী থেকেই তার উৎপত্তি। তাই চাঁদকে সব সময় আমরা জানতে চেয়েছি পৃথিবীর ছায়াকে অনুমান করে, পৃথিবীর কায়াকে মনের পটে এঁকে রেখে।

সুখের কথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বড় বড় মানমন্দির এমন সব জটিল এবং অদ্ভুত ধরনের যন্ত্রপাতি পেয়ে গেল যার ফলে বিগত হাজার বছরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যা জানতে গিয়ে হিমশিম

খেয়ে গেছেন এবার যেন রাতারাতি তাঁরা সেগুলি জেনে ফেলতে লাগলেন। মগজের জল্পনা নয়, এবার একেবারে প্রত্যক্ষ করার পালা। বড় বড় থালার মত এক একটা বেতার তরঙ্গ গ্রাহক মাটির বুকে মাথা উঁচিয়ে সুদূর আকাশকে আঁতিপাতি করে খোঁজার কাজ সুরু করল। শক্তিশালী এই বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র শুধু লক্ষ্য-বস্তু নয়, সেই বস্তু থেকে যত রকমের আলোক রশ্মি বিকিরিত হয় তাদের ক্ষমতা বা প্রকৃতি অনেক কিছুই জেনে নিতে সাহায্য করল। বর্ণালী বিশ্লেষণের নতুন পদ্ধতি ঐ সমস্ত রশ্মির স্বরূপ এবং নানা রকম বৈচিত্র সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করতেও সাহায্য করল। সুরু হল আধুনিক বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। এর সাহায্যে চাঁদের গঠন এবং তার পিঠের ওপরকার সঠিক চেহারাটা আরও সুন্দর ভাবে খুঁটিয়ে দেখতে খুব বেশি অসুবিধে হল না।

বেশ কয়েক বছর আগেই একটা ব্যাপার আমরা জেনে ফেলেছিলাম। সেটা হল, পূর্ণিমার সময় প্রতি একক ক্ষেত্র থেকে চাঁদ যতটা সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে, আংশিক উজ্জ্বল চাঁদ কিন্তু ততটা করে না। এ থেকে অনেকে মনে করেন চাঁদের পিঠটি হয়ত ছোট বড় অসংখ্য ছিদ্রে ভরা। অথবা আঁশের মত। তাই সূর্য যখন এক পাশ থেকে খানিকটা বাঁকান ভাবে তার বুকে রশ্মি ঢেলে দেয়, তখন সেই ছিদ্র তাদের ফাঁকে ফাঁকে ছায়া সৃষ্টি করে। ফলে আলোর উজ্জ্বলতা অনেক কম দেখায়। কিন্তু পূর্ণিমার সময় কতকটা খাড়া ভাবে অর্থাৎ আমরা যে বরাবর চাঁদকে দেখি সূর্যের আলো তার সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চাঁদে গিয়ে পড়ায় ঐ গর্তগুলির ভেতরের অংশও আলোকিত হয়ে ওঠে। ফলে শুধু ঐ সময়েই চাঁদের পিঠ সব চাইতে বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

চাঁদের পিঠ থেকে বিকিরিত উত্তাপ অর্থাৎ অবলোহিত রশ্মি

এবং বেতার তরঙ্গ দেখে মনে হয়েছে তার পিঠটি এমন কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি যা তাপ বা বিদ্যুৎ শক্তির অপরিবাহী। ঘনত্বও কম, অর্থাৎ কোন হাল্কা পদার্থ দিয়ে তার ভূ-পৃষ্ঠের আবরণটি গঠিত হয়েছে।

প্রথম দিকে মনে হয়েছিল এই আবরণ এক থেকে দু ইঞ্চির মত পুরু হতে পারে না। কিন্তু পরে রেডারের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেল সেটা ঠিক নয়। রেডারের সাহায্যে চাঁদের পিঠের দিকে যে বেতার তরঙ্গ পাঠিয়ে দেওয়া হয় তার দৈর্ঘ অনেক বড়। সেই তরঙ্গের পক্ষে চাঁদের ভূ-ত্বকের আরও গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়ে থাকে। বিভিন্ন গবেষক পৃথিবী থেকে বিভিন্ন সময়ে রেডারের সাহায্যে পরীক্ষা চালিয়েছেন। এখান থেকে পাঠান সেই তরঙ্গ চাঁদের বুকে গিয়ে আঘাত করার পর কিছুটা তার পিঠের উপর থেকেই প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। কিছুটা উপরের স্তর ভেদ করে গভীর কোন অঞ্চলে গিয়ে আঘাত করে এবং সেখান থেকে প্রতিফলিত হয়। এই উভয় প্রকারের প্রতিফলিত তরঙ্গ পৃথিবীর গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন, চাঁদের পিঠে এক থেকে দুই মিটার গভীর পর্যন্ত সছিদ্র এবং হাল্কা ধরনের পদার্থ বিস্তৃত রয়েছে।

অবশ্য আরও কিছু কিছু অঞ্চল সেখানে পাওয়া গেছে, যেখানকার ভূ-ত্বকের গঠন অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। মনে হয় যেন একেবারে নতুন কোন বস্তু দিয়ে গড়া। তবে তেমন বস্তুর আস্তরণ এক থেকে দু ইঞ্চির বেশি হবে না। তাইচো প্রভৃতি গহ্বরের প্রান্ত ভাগে এ ধরনের বস্তু দেখা গেছে। ১৯৬০ পর্যন্ত চাঁদের পিঠ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারনা, তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগই অদ্ভুত সামঞ্জস্য রেখে প্রায় একই ধাঁচে গড়া। এই পঁচানব্বই ভাগের সবটাই কয়েক ফুট গভীর পর্যন্ত সছিদ্র এবং হাল্কা ভূ-স্তরের আবরণী দিয়ে ঢাকা।

২০শে জুলাই, ১৯৬০ সোভিয়েত দেশের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ;যান জোন্দ-৩ টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে চাঁদের বিপরীত পিঠের



সারভেয়ার-৭ এর ষোল ফুট দূর থেকে তোলা চাঁদের পাথর

আর এক ঝাঁক ছবি তুলে পাঠাল। এর আগে লুনিক-৩ যে সমস্ত ছবি পাঠিয়েছিল তার মধ্যে সেখানকার সামান্য কিছু অংশ দেখার সৌভাগ্য আমরা অর্জন করেছিলান। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং প্রকৃতি তত্ত্ববিদদের কাছে লুনিক-৩ এর সেই ছবিগুলি সেদিন যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর বুকে বসে চাঁদের জমির প্রথম ছবি তোলা হয়েছিল ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে। মানুষ সেই প্রথম চাঁদের

ছবি দেখার সুযোগ পেল। প্রায় এক শ বছর আগে তোলা একটি আলোকচিত্র সেণ্ট পিটার্সবুর্গ অর্থাৎ বর্তমানের লেনিনগ্রাদ থেকে প্রকাশিত ইলুসত্রাৎসিয়া নামে একটি সাময়িক পত্রে একবার ছাপা হয়েছিল। বলা নিষ্প্রয়োজন, ছবিটি চাঁদের সামনের দিকের। সেই ছবির পরিচিতি প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল, 'আমরা চিরকাল চাঁদের শুধু একটি দিকই দেখে আসছি। অপর দিকটি কোন দিনই দেখতে পাব না'। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে বসল লুনিক-৩। অক্টোবর ৭, ১৯৫৯ ; সেই প্রথম চাঁদের বিপরীত পিঠের ৪৯৮ টি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলকে চিহ্নিত করা সম্ভব হল। ছবিগুলি সাজিয়ে সেদিন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা অদৃশ্য অঞ্চলের তিনের দুই ভাগ অংশের একটি মানচিত্র তৈরি করেন। এর নাম দেওয়া হয় লুনার গ্লোব। এই লুনার গ্লোবের প্রায় এক তৃতীয়াংশের মত জায়গা ফাঁকা অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়।

সেই অসম্পূর্ণ কাজটি সম্পন্ন করল জোন্দ-৩। লুনিক-৩ সেদিন চাঁদের বিপরীত দিকের যে অংশটির ছবি তুলতে অসমর্থ হয়েছিল সেই অংশটির নিখুঁত ছবি তুলে পাঠাল জোন্দ-৩। এবার আরও অনেক কাছ থেকে ছবি তোলায় বেশ কিছু খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়াও সম্ভব হল।

কিন্তু আরও যাচাই করে দেখে নেওয়ার কাজ তখনও বাকি। ১৯৬০-র পরই সোভিয়েত দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই ঠিক করে নিলেন চাঁদে তাঁরা মানুষ পাঠাবেনই। পরবর্তী দু তিন বছরের মধ্যে বিভিন্ন নভচরদের নিরাপদে গগন বিচরণ তাঁদের সে সঙ্কল্পকে আরও সুনিশ্চিত করে তুলতে লাগল। তাই চাঁদের গঠন-তত্ত্ব এবং উপাদানের উপর এ পর্যন্ত যত রকমের তত্ত্বগত আলোচনা চলছিল তাদের এক পাশে ফেলে ঠিক করে নিলেন, চাঁদের ভূত্বক সম্পর্কে আরও খুঁটিনাটি তথ্য বা সংবাদ তাঁরা জেনে নেবেন। মাঝে

কথা উঠেছিল, হয়ত চাঁদের পিঠটা এত নরম হবে যে, পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বা কোন মহাকাশযান তার নিচে তলিয়ে যাবে। ব্যাপারটা যাচাই করে দেখা দরকার।

অথচ এতে অসুবিধেও বড় কম নয়। কারণ যা কিছু তাঁরা জানতে চান তার সবটাই জানতে হচ্ছিল কতকগুলি আলোকচিত্রের সাহায্যে। সেই আলোকচিত্র আবার কখনও বা তোলা হচ্ছিল পৃথিবীর মানমন্দিরে বসান কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্র অথবা কোন মহাকাশ যানের বেতার ক্যামেরার সাহায্যে। তখনও চাঁদের বুকে নেমে ছবি তোলার মত অবস্থা হয় নি। ফলে এ ধরনের ছবিতে ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট বেশি। কারণ একই ফিলমের ওপর পৃথিবীর আবহাওয়ার মধ্যে কোন একটি বস্তুর যখন ছবি তোলা হয় তখন সেই ছবির প্রতিটি অংশের রঙ যে ভাবে উঠবে চাঁদের পরিবেশে সেই রঙ ভিন্ন হতে পারে। সেই সঙ্গে উজ্জ্বলতাও। অথচ এই রঙ এবং উজ্জ্বলতার উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানীদের জেনে নিতে হবে বস্তুটি কি ধরনের রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এবং তার গঠন বৈশিষ্ট্যটি কেমন হতে পারে। এ ছাড়াও, চাঁদের বুকে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে কিনা, পৃথিবীর মত ভ্যান-অ্যালেন বেল্ট সেখানকার জগৎকে দূরাগত মহাজাগতিক রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করে কিনা অথবা উল্কাচূর্ণের আঘাত মানুষের কোন ক্ষতি করতে পারে কিনা, সেগুলিও দেখে নেওয়া দরকার। এদের ওপর পর্যবেক্ষণ চালিয়ে ঠিক কোন কোন জায়গা মানুষের অবতরণ করার পক্ষে নিরাপদ হবে সেটা দেখে নিতে হবে। কারণ সকলেই বুঝলেন শুধু দূর থেকে বিক্ষিপ্তভাবে যন্ত্রের সাহায্যে জরিপের কাজ সুরু করলে খরচও যেমন হবে সেই সঙ্গে সময়ও লাগবে অনেক। তাছাড়া সংক্ষিপ্ত ভাবে সামান্য কিছু অঞ্চল দেখে নিশ্চয় পুরো চাঁদটার সবকিছুর হদিস যোগান সম্ভব নয়?

অতএব স্নুরু হয়ে গেল চাঁদে নামার পালা। মানুষ নয়। প্রথমে পাঠাতে হবে যন্ত্রযান। এই যানগুলি ছবি তুলবে, কাছ থেকে। সম্ভব হলে কিছুটা স্থান বিচরণ করে দেখে নেবে চাঁদের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের আসল স্বরূপ। দেখে নেবে সেখানে কোন প্রাণঘাতী তেজস্ক্রিয় রশ্মি ওত পেতে অপেক্ষা করছে কিনা। উল্কার ঢিল কোন কিছুকে ভেঙে চুরমার করার জন্যে আনাগোনা করে কিনা। সেই সঙ্গে সেখানকার দিন এবং রাতের তাপমাত্রা এবং আরও কিছু কিছু সংবাদ।

স্নুরু হল মার্কিন দেশের রেনজার প্রকল্প। অবশ্য এর আগে ১৯৫৮ নাগাদ তাঁরা চাঁদের উদ্দেশে চারবার মহাকাশযান পাঠানর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি তা ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে মার্চ ৩, ১৯৫৯ এ তাঁরা পাইওনিয়ার-৪ মহাকাশযান চাঁদের উদ্দেশে উৎক্ষেপ করলেন। এই প্রথম মার্কিন দেশ একটি মহাকাশযানকে মুক্তি-বেগ বা এসকেপ ভেলোসিটি যোগাতে সক্ষম হয়, যা পাইওনিয়ার-৪ কে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমা অতিক্রম করে চাঁদের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। দুঃখের বিষয় এবারও ব্যর্থ হলেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। ছয় কিলোগ্রাম ওজনের এই মহাকাশযানটি চাঁদের প্রায় উনষাট হাজার কিলোমিটার দূরে গিয়ে পাশ ঘেঁষে বহুদূরে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সূর্যকে কেন্দ্র করে একটি কৃত্রিম গ্রহের মত আবর্তন করতে থাকে। অবশেষে ২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬০ রেনজার-৩ কে পাঠান হল চাঁদের উপর পর্যবেক্ষণ চালানর কাজে। উদ্দেশ্য, মুখ্যত কাছ থেকে ছবি তোলা। কিন্তু তিন শ তিরিশ কিলোগ্রাম ওজনের এই মহাকাশযানটিও চাঁদের ৩৬৩০০ কিলোমিটার পাশ ঘেঁষে চলে গিয়ে পাইওনিয়ার-৪ এর মতই সূর্যের দিকে এগিয়ে যায়। এরপর রেনজার-৪। এরও ওজন তিন শ তিরিশ কিলোগ্রাম। এপ্রিল ২৩, ১৯৬০ তারিখে একে উৎক্ষেপ

করা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট কক্ষপথ ছেড়ে এটি দূরে সরে যায় এবং চাঁদের অদৃশ্য একটি অঞ্চলে গিয়ে পড়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। অক্টোবর ২৩, ১৯৫৯ তে এল রেনজার ৫ এর পালা। এই মহাকাশ-যানটি ঠিকমত এগিয়ে যেতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত চাঁদের প্রায় সাত শ পঁচিশ কিলোমিটার কাছে এসে পড়ে। আর তারপরই হঠাৎ লক্ষ্য পথ ছেড়ে সূর্যের দিকে অগ্রসর হয়। ব্যর্থতা! ব্যর্থতা সাময়িকভাবে মার্কিন বিজ্ঞানীদের কিছুটা নিরুৎসাহ করে তুলল। কিন্তু হাল ছাড়লেন না তাঁরা। সুরু হল নতুন করে ভুল শোধরানর পালা। খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন সত্যিকারের ত্রুটির কারণ।

শেষ পর্যন্ত সাফল্য এল। জানুয়ারী ৩০, ১৯৫৯। এবার ৩৬৫ কিলোগ্রাম ওজনের মহাকাশযান চাঁদের বুকে পাড়ি জমানর জন্যে নতুন উদ্যমে যাত্রা সুরু করল। রেনজার ৮। না। এবার ব্যর্থতা নয়। একেবারে সুবোধ বালকের মত রেনজার-৬ ঠিক যেখানে যেমনটিভাবে নামার কথা সেখানে তেমনটি ভাবেই অবতরণ করল। অবশ্য সবেগে। এবং নিজের দায়িত্ব পালন করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল তন্দ্রাসাগরের একটি অঞ্চলে। চাঁদের বুকে অবতরণ করল মার্কিন দেশের মানব আরোহীহীন মহাকাশযান।

সবই হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার নৈরাশ্য। চাঁদে নামার সময় দূর থেকে ছবি তুলতে তুলতে যাতে রেনজার-৬ এগিয়ে যেতে পারে তার জন্যে পৃথিবী থেকে যন্ত্রমগজকে নির্দেশ দেওয়া হল। না। ব্যর্থ হয়েছে যন্ত্রমগজ। টেলিভিশন ক্যামেরা বিকল হয়ে গেছে। ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠানর মত ক্ষমতা তার নেই। অতএব চাঁদের খুব কাছ থেকে চাঁদের ছবি তোলার যে স্বপ্ন বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন তা একেবারে শেষ মুহূর্তে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেল।

এরপর আরও সতর্কতার সঙ্গে পাঠান হল রেনজার ৭, ৮, ৯। সাফল্য। ঠিক হল এই তিনটি মহাকাশযান যখন চাঁদের মাটির খুব

কাছাকাছি এসে পড়বে তখন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চালু করে দেবে তাদের টেলিভিশন ক্যামেরা। অতি দ্রুত এই ক্যামেরা যতগুলি সম্ভব ছবি তুলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে পৃথিবীতে, এবং চান্দ্র ভূমিতে সবেগে ঠিকরে পড়ার আগে পর্যন্ত এই কাজটি তারা করে যাবে। জুলাই ১৯, ১৯৫৯ রেনজার-৭ এবং ফেবরুয়ারি ১৯, ১৯৬০ রেনজার-৮ উৎক্ষিপ্ত হয়। এর কিছুদিন পর আগের তুটি রেনজারের অনুগমন করল রেনজার-৯।

শেষের এই তিনটি মহাকাশযান সবেগে চাঁদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রচুর ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়। রেনজার-৯ তু শ আটান্ন মাইল দূর থেকে আলফনসাস গিরি গহ্বরের কয়েকটি ছবি তোলে। এই সময় এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় পাঁচ হাজার ছ শ মাইল। গহ্বরের ঠিক যে স্থানটিতে ঠিকরে পড়ার কথা রেনজার-৯ তার থেকে মাত্র তিন মাইল দূরে গিয়ে পড়েছিল। ছবিগুলি পরীক্ষা করে মনে হয়েছে এই গহ্বরটির মাঝখানে যে উঁচু পাহাড়ের চূড়োটি রয়েছে তা আগ্নেয়গিরি ঘটিত কোন কারণে তৈরি হলেও হতে পারে। এই ছবিগুলি আগের তোলা ছবি থেকে অনেক স্পষ্ট, নিখুঁত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হাজার গুণ বড় করে চাঁদের ভূখণ্ডকে দেখতে সাহায্য করেছে। কোন ছবিতে আঠারো ইঞ্চি ব্যাসের জ্বালামুখের ছবিও পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে। এর আগে এত স্পষ্ট করে চাঁদের ছবি আর কেউ তুলতে পারেন নি। বিজ্ঞানী মহলে রেনজারদের তোলা ছবিগুলি যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। এই প্রথম যেন তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন চাঁদের প্রকৃত রূপ। তার মুখের আদল।

কিন্তু এও সাময়িক। অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম উত্তেজনার স্ফুলিঙ্গ আবার স্তিমিত হয়ে গেল। ছবি তো তোলা হল এবং বেশ স্পষ্ট করেই যেন তা হল। তাতে ফায়দাটা হল কী? কনের

ছবি দেখলেই তো তার আসল চরিত্রটি সব সময় জানা যায় না? এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঘটল তাই। চাঁদের পিঠের আসল প্রকৃতি, তার গঠন প্রভৃতি সম্পর্কে পুরনো অনেক মতবিরোধের তেমন কোন সমাধান হল না। যাঁরা মনে করতেন চাঁদের পিঠ লাভা এবং ভস্মে ঢাকা, রেনজারের পাঠান ছবি দেখে সে বিশ্বাস তাঁদের অটুটই রইল। যাঁরা বিশ্বাস করতেন লাভা নেই, তাঁরাও নিজস্ব মত আঁকড়ে রইলেন। আর যাঁদের ধারনা ছিল চাঁদের পিঠ টুকরো টুকরো নুড়ি পাথর বা বালির মত বস্তু দিয়ে ঢাকা এবং তার এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত আগ্নেয়গিরি, তাঁরাও ঐ সমস্ত ছবিতে এমন কিছু অভিনবত্ব খুঁজে পেলেন না যাতে করে নিজেদের ধারনাকে নাকচ করতে পারেন। পুরো ব্যাপারটার উপর বড় সুন্দর মন্তব্য করেছেন জনৈক চাঁদ বিশেষজ্ঞ। তাঁর বক্তব্য: 'রেনজারের ছবিগুলি শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল যেন আয়নার মত। ঐ আয়নার মধ্যে সকলেই নিজ নিজ তত্ত্বকে প্রতিফলিত অবস্থায় দেখতে লাগলেন।' ঠিক সেই দুই অন্ধের হাতি দেখার মত। একজন পায়ে হাত দিয়ে বলল, হাতি থামের মত দেখতে। আর একজন তার গায়ে হাত দিয়ে বলল, দেওয়ালের মত। এখানেও ঠিক তাই হল।

এ ধরনের গোলমালের কারণ অবশ্য রেনজার মহাকাশযান অথবা তাদের পাঠান ছবিগুলি নয়। বরং শেষ তিনটি রেনজার যে কয়েক হাজার ছবি তুলে পাঠায় পরিকল্পনাকারীরা তাদের যেমনটি সুন্দর আশা করেছিলেন তেমনটিই হয়েছিল। আসল সমস্যা হল, শূন্যে আকাশ থেকে দেখে বিচার করা শক্ত সত্যিই চাঁদের ভূ-ত্বক কঠিন কিনা, অথবা তার গঠন প্রকৃতিই বা কেমন হতে পারে। এমন কি সেই পিঠ যত কাছ থেকেই দেখা যাক না কেন। তবে রেনজার একটা দায়িত্ব কিন্তু ভালভাবেই পালন করেছিল। এটুকু সংবাদ অবশ্য তারা দিতে পারল, চাঁদের পিঠে মসৃণ অংশও আছে।

যেখানে অ্যাপলো মহাকাশযানে চড়ে মানুষ অবতরণ করতে পারে।

রেনজার-৭ এর ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে কতকগুলি রে ক্র্যাটার বা একটানা রেখার মত ছড়ান ছোট বড় গহ্বরের শ্রেণী। এই বিশেষ ধরনের গহ্বরমালার একটির উৎপত্তি অতিকায় জ্বালামুখ তাইচো থেকে। অপরটি কোপারনিকাস থেকে। ইতিপূর্বে পৃথিবীর মানমন্দির থেকেও এদের ছবি তোলা হয়েছিল। তাতে দেখা গিয়েছিল পর পর সাজান এই গহ্বরের শ্রেণীর মধ্যে মাঝে মাঝে ফাঁকও আছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে কিছু কিছু ঠাসবুননির মত গায়ে গায়ে লাগান নয়, পৃথক। এই ভাঙ্গা অংশগুলি কতকটা পাহাড়ের মত। লম্বায় কখনও কখনও তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটার। রেনজার-এর ছবি পরীক্ষা করে দেখা গেল, এই শ্রেণী-গহ্বরের প্রত্যে-কটি সারির ডগায় একটি বা এক গুচ্ছ বিশেষ ধরনের গহ্বর থাকে, যাদের রঙ সাদা। তাইচো বা কোপারনিকাস যেই হোক, তার কেন্দ্র থেকে যে সমস্ত শ্রেণী দূরে সরে গেছে তাদের সুরুটা পড়ে থাকে ঐ



ডঃ জেরারড পি কুইপার

সাদা রঙের গহ্বরটির কাছে। ডঃ জেরারড পি কুইপার মনে করেন, ধূমকেতুর আঘাতেই হয়ত চাঁদের বুকে তাইচো এবং কোপারনিকাস জ্বালামুখ দুটির সৃষ্টি হয়েছিল। আর এদের কেন্দ্র করে ছোটবড় যে গহ্বরশ্রেণী তৈরি হয়েছে, তারা তৈরি হয়েছে ঐ ধূমকেতুর

অবশিষ্ট অংশের আঘাতে। উল্লেখ্য, ডঃ কুইপারই সর্বপ্রথম ইউরেনাস এবং নেপচুনের চাঁদ আবিষ্কার করেছিলেন।

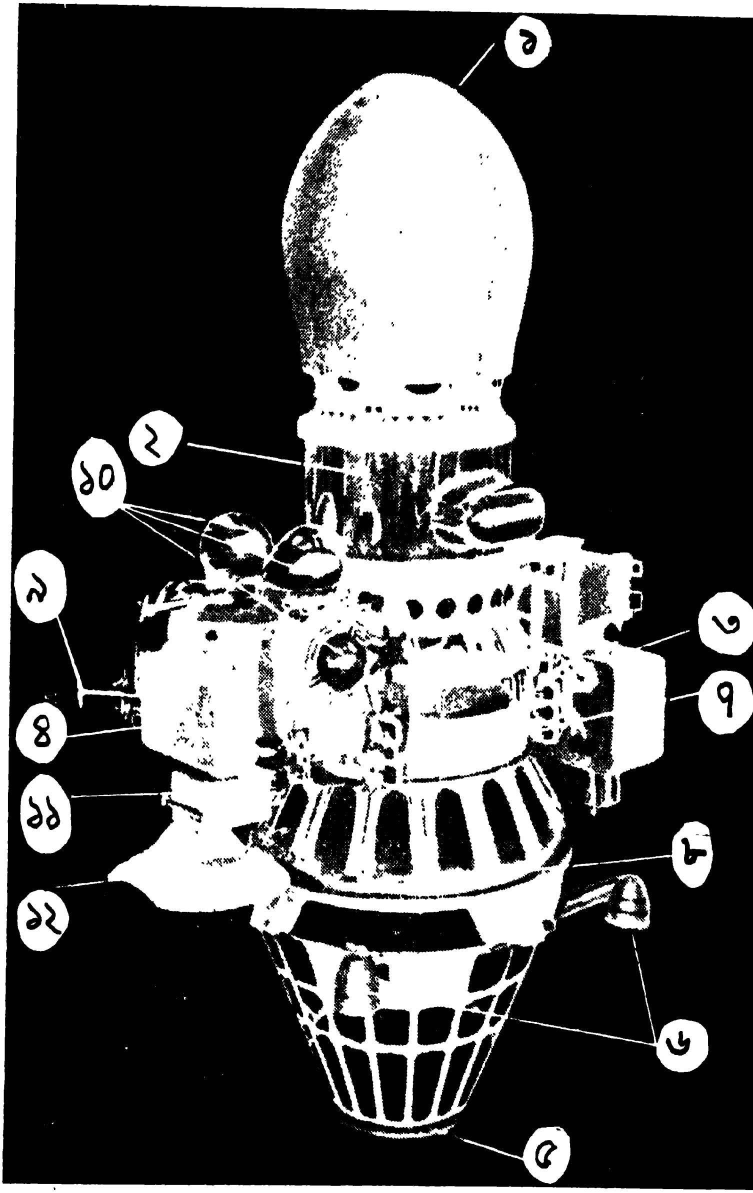
রেনজার-৮ ছবি তুলেছিল তন্দ্রাসাগরের প্রায় পুরো অঞ্চলটার এবং রেনজার-৯ ছবি তুলেছিল কন্যাসাগর বা মেয়ার নিউবিয়াম অঞ্চলের। রেনজারদের তোলা ছবিতে কিছু কিছু পৃথক পর্বতচূড়া লক্ষ্য করা গেছে যাদের দেখতে হাওয়াই দ্বীপের লাইমানা পাহাড়ের মত। লাইমানা আসলে একটি আগ্নেয়জাত পাহাড়। উর্দ্ধপাতন পদ্ধতিতে কিছু কিছু পদার্থ অগ্নুৎপাতের সময় আগ্নেয়গিরির বাইরে মুখের পাশে বা গায়ে এসে জমে। ঠাণ্ডা হলে সেই পদার্থ জমে পাথরের মত শক্ত হয়ে যায় এবং তার রঙটা হয় সাদাটে। এর মূল উপাদান ধাতব সালফেট, সালফাইডস, ক্লোরাইডস, কার্বনেটস এবং অক্সাইডস। চাঁদে জল না থাকায় এ ধরনের পদার্থের পক্ষে গলে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ কম! এর আগে যে জোড়া গহ্বরের কথা বলেছি রেনজার তারও পরিস্কার ছবি তুলে পাঠিয়েছিল।

আবার চমক। মার্কিন দেশের ভাগ্যে মহাকাশ অভিযানে প্রথম হওয়ার সৌভাগ্য যেন প্রত্যেকবারই একটুর জন্যে ফসকে যেতে লাগল। স্পুতনিক-১, গ্যাগারিনের গগন বিহার—রাশিয়া ফার্স্ট! জনসাধারণের মনে তখন খেলার মাঠের উত্তেজনা। কে জেতে, কে হারে সেটা দেখার জন্যে তারা হাঁ করে বসে রয়েছেন। এমন সময়…। সেটা ফেব্রুয়ারী ৩, ১৯৬০। সোভিয়েত দেশের মহাকাশযান লুনা-৯ ধীরে ধীরে চাঁদের বুকে পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটি গিরিগহ্বর রেইনার-এর পাশে গিয়ে অবতরণ করল। এই প্রথম মানুষের তৈরি প্রথম মহাকাশযানের নিরাপদে চাঁদের মাটিতে পা ফেলা। জায়গাটির নাম ওসেনাস প্রোসেল্লেরাম। মাটিতে নেমেই তার স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরাটি তৎপর হয়ে ওঠে। চাঁদের পিঠের প্রায় ষাট

সেনটিমিটার উঁচুতে উঠে খাড়া তলের সঙ্গে কুড়ি ডিগ্রি কোণ করে এই ক্যামেরা ঘুরে ফিরে ছবি তুলতে থাকে এবং সেই ছবি একের পর এক পৃথিবীতে পাঠাতে থাকে।

চাঁদের বুকে পা রাখার পর লুনা-৯ এর পায়ের অত্যন্ত সামান্য অংশ তার মাটির নিচে ডুবে গিয়েছিল। এতে প্রমাণিত হল, চাঁদে হেঁটে বেড়ান যেতে পারে। চোরাবালির ফাঁদের মত তার নিচে কবরস্থ হওয়ার কোন কারণ নেই। এর ক্যামেরাটি চারদিকে ঘুরে ফিরে ছবি তুলেছিল। ফলে দূরের দিগন্ত অঞ্চলের অনেকটা অংশ ভালভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। তবে ছবিগুবি দেখে এটাও মনে হয়, মাটিতে পা রাখলেও সে মাটি হয়ত অত্যন্ত নরম। নরম মাটিতে হেঁটে বেড়ালে যেমন দেহটিকে ঠিক মত সহজে চলাচল করান যায় না, এলোপাথাড়ি বেঁকে যায়, লুনা-৯ ও যেন সেইভাবে দুলে উঠছিল।

লুনা-৯ এর পাঠান ছবিতে খুব ছোট ছোট জিনিসও পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছিল। পাথরের চাঁই, নুড়ি, গর্ত, এমন কি প্রায় এক মিলিমিটার ব্যাসের পদার্থও ঐ সমস্ত ছবিতে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়। ছবিতে আর কতকগুলি ব্যাপার বিজ্ঞানীদের কৌতুহলী করে তুলেছিল। চাঁদের বুকে কোন জায়গা দেখে তাঁদের মনে হয়েছে, অতীতে সম্ভবতঃ সেখানে অন্য কোন পদার্থ ভূ-ত্বকের গায়ে লেগে ছিল। কোন নৈসর্গিক প্রভাবে তারা যেন ক্ষয়ে গেছে। এখন শুধু পড়ে আছে তাদের গোড়ালির সামান্য অংশ মাত্র। অতএব প্রশ্ন উঠেছে, চাঁদের বুকে পৃথিবীর মত ক্ষয়ে যাওয়ার মত কাজ কি কোন দিন ঘটেছিল? পৃথিবীতে নৈসর্গিক প্রভাব বলতে আমরা বুঝি মুখ্যত জল এবং বাতাসের ঘর্ষণ। এদের প্রভাবে কঠিন পাথর থেকে সুরু করে প্রায় সমস্ত কিছুই ক্ষয় হয়ে থাকে। এক জায়গার মাটি ধুয়ে গিয়ে জমা হয় আর এক জায়গায়। এক জায়গার বালি উড়ে গিয়ে জমে বালিয়াড়ি তৈরি করে অন্যত্র। পৃথিবীর বুকে এ অভিজ্ঞতা তো



লুনা-৯ : ১—অনুসন্ধানী যন্ত্রাদির কক্ষ; ২—নিয়ন্ত্রক; ৩, ৪—কাজ চলার সময় যান্ত্রিক উপায়ে এদের সরিয়ে নিতে হয়; ৫—তরল জ্বালানি চালিত ইঞ্জিন; ৬—নিয়ন্ত্রক ইঞ্জিন; ৭—জারকের আধার; ৮—এই আধারে জ্বালানি এবং জারক-কে মেশান হয়; ৯—একটি ক্ষুদ্র মোটর; ১০—গ্যাসপূর্ণ বেলুন; ১১—বেতার-উচ্চতা মাপক যন্ত্র; ১২—উচ্চতা মাপক যন্ত্রের আকাশ তার

আমাদের আছেই। কিন্তু চাঁদের বুকে জল, বাতাস অথবা তেমন কিছু তো চোখে পড়ে না? তাহলে কি মহাজাগতিক চূর্ণ অথবা বালিকণার মত উল্কার ঝড় কোন দিন তার বুকের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল যা ঐ সমস্ত পাথরকে ক্ষয় করে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে? হয়ত এমনও হতে পারে দিনে সূর্য রশ্মির প্রচণ্ড কিরণে এবং রাতে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডায় পদার্থের যে সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন হয় তারই ফলে ধীরে ধীরে তারা ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে? অথবা ঐ পাথরগুলি কি কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে তৈরি ছিল যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন অজ্ঞাত কারণে বিস্ফোরণের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়? কিন্তু তারই বা প্রমাণ কোথায়? এমন কোন ঘটনা ঘটলে তাদের অংশ অথবা চূর্ণ টুকরো আশপাশে পাওয়া যেত? লুনা-৯ এর ছবিতে কিন্তু তেমন চিহ্ন চোখে পড়ে নি। তাহলে কি তারা মহাশূন্যে ছুটে বেরিয়ে গেছে? কিংবা জমাট বেঁধে আশপাশের কোন ফাটল বা গর্তের মধ্যে দিয়ে ভূত্বকের নিচে গিয়ে চাপা পড়ে আছে? তবে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা একটা বিষয়ে দ্বিমত নন। সেটা হল, চাঁদের পিঠ যথেষ্ট শক্ত। লুনা-৯ এর ধীর পদক্ষেপে অবতরণ এটাকেই সেদিন প্রমাণ করেছে।

লুনা-৯ এর পর লুনা-১০। উৎক্ষেপ করা হল মার্চ ৩১,১৯৬০তে। মানুষের চন্দ্রযাত্রার ইতিহাসে এ আর এক পদক্ষেপ। ঐ দিন একটি শক্তিশালী তরল জ্বালানি চালিত রকেট লুনা-১০ কে প্রথমে একটি উপবৃত্তীয় কক্ষপথে স্থাপিত করে। এই সময় এটি একটি উপ-গ্রহ রূপে পৃথিবীর চারপাশে বিচরণ সুরু করে দেয়। বিচরণের সময় এর সুদূরতম অবস্থান ছিল পৃথিবী থেকে দু শ পঞ্চাশ কিলোমিটার। নিকটতম অবস্থান দু শ কিলোমিটার। কয়েকবার এইভাবে ঘোরার পর পৃথিবী থেকে সংকেত পাঠিয়ে লুনা-১০ এর রকেটে ইঞ্জিনটি চালিয়ে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে উপগ্রহটির গতিবেগ ওঠে

সেকেণ্ডে প্রায় এগার কিলোমিটার। অর্থাৎ তাকে মুক্তিবেগ যোগান হল। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর পাশ থেকে সেটি দূরে চলে যেতে থাকে। রকেট ইঞ্জিনটিকে দু বার থামিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে চাঁদের কক্ষপথের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে যে রকেটটি তাকে ঠেলে দিয়েছিল সেটি পৃথক হয়ে গেল। দু শ পঁয়তাল্লিশ কিলোগ্রাম ওজনের মূল মহাকাশযানটি এবার ছুটতে সুরু করল চাঁদের দিকে। অবশেষে এপ্রিল ৩, ১৯৬৬ তারিখে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে প্রবেশ করে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে চাঁদকে ঘিরে প্রদক্ষিণ সুরু করে দিল। মানুষ এই প্রথম আমাদের চাঁদের পাশে স্থাপন করল আর একটি চাঁদ। লুনা-১০ই সেই চাঁদ। প্রতি দু ঘণ্টা আটান্ন মিনিট পনের সেকেণ্ডে এটি একবার করে চাঁদের চারপাশে ঘুরতে থাকে। চলার পথ উপবৃত্তীয়। চাঁদের বিষুব তলের সঙ্গে একাত্তর ডিগ্রি চুয়ান্ন সেকেণ্ড কোণ করে বিচরণ করার সময় লুনা-১০ চাঁদের নিকটতম অঞ্চলে যখন আসে তখন চাঁদের পিঠ থেকে তার দূরত্ব দাঁড়ায় তিন শ পঞ্চাশ কিলোমিটার। সুদূরতম অঞ্চলে গেলে এই দূরত্ব দাঁড়ায় এক হাজার সতের কিলোমিটারে।

লুনা-১০ কে সংক্ষেপে একটি ভ্রাম্যমান গবেষণাগার বলা চলে। এই মহাকাশযানটিতে একটি গামা রশ্মি পরিমাপক যন্ত্র ছিল। এই যন্ত্রটি পাঠানর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘের গামা রশ্মি মেপে দেখা। বিশেষ করে স্ট্রনশিয়াম, ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম থেকে নির্গত গামা রশ্মি। পৃথিবীতে এই পদার্থগুলি পাওয়া যায় গ্র্যানাইট পাথরের মধ্যে।

চাঁদের পিঠ থেকে বিকিরিত গামা রশ্মির বর্ণালী পৃথিবীতে পাঠাল লুনা-১০। এই প্রথম। সেই বর্ণালী পরীক্ষা করে মনে হয়েছে, পৃথিবীর শিলা স্তরে যে ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ দেখা যায় তেমন কোন পদার্থ চাঁদে নেই। অবশ্য সেখানকার গামা রশ্মির প্রাবল্য

প্রায় পৃথিবীরই অনুরূপ। তবে সেই রশ্মির প্রাণকেন্দ্র সেখানকার গ্র্যানাইট পাথর নয়। সম্ভবতঃ মহাজাগতিক রশ্মির সঙ্গে চান্দ্র-ভূমির কোন কোন পদার্থের প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ রশ্মির উৎপত্তি ঘটেছে। সেখানে ইউরেনিয়াম বা থোরিয়ামের অস্তিত্ব কারুর চোখে পড়ে নি। এবং সাগর বা পাহাড় একই ধরনের পদার্থ দিয়ে তৈরি।

গামা রশ্মির উপর এই পরীক্ষা চালিয়ে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ধারনা হয়েছে চাঁদের বুকের উপরের অংশ পৃথিবীর মত বেসল্ট জাতীয় শিলা দিয়ে গঠিত। পৃথিবীতে এই বেসল্ট একদিন গলিত লাভার প্রবাহে তৈরি হয়েছিল। অতএব বলা চলে চাঁদের বুকও ঐ লাভা দিয়েই তৈরি। তবে সেটা আংশিক ঘটনা। সেখানে এমন পদার্থও থাকতে পারে যা আরও পুরনো। চাঁদের গঠন কালের প্রথম যুগের সামগ্রী।

লুনা ১০ চাঁদের চার পাশের মহাশূন্যের মধ্যে উল্কা কণিকার প্রভাবের উপরও পর্যবেক্ষণ চালায়। এর জন্যে এই মহাকাশযানে একটি বৈদ্যুতিক গণনাকারী যন্ত্র রেখে দেওয়া হয়। এই যন্ত্রের কাজ ছিল মহাশূন্যে ভেসে আসা ছোট ছোট উল্কার কণার উপর লক্ষ্য রাখা। এপ্রিল ৩ থেকে এপ্রিল ১২, এই নয় দিন মাঝে মাঝে যন্ত্রটিকে চালু রাখা হয়েছিল। মোট সময় পাঁচ ঘণ্টা ষোল মিনিট। এই সময়ে সে তিপান্নটি উল্কাকণার আঘাতের কথা রেকর্ড করে। যদি আমরা ধরে নিই যে, রেকর্ড করার সময় এটাই গড় উল্কা কণা বর্ষণের পরিমাণ, তাহলে আন্তর্গ্রহ জগতে প্রতি বর্গ মিটার জায়গায় সেকেণ্ডে এই পরিমাণটি এক শ গুণেরও বেশি গিয়ে দাঁড়াতে পারে।

এ ছাড়া লুনা ১০ এর পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, চাঁদেরও চারপাশে পৃথিবীর মত চৌম্বক ক্ষেত্র ঘিরে রয়েছে। তবে সেই ক্ষেত্রের ক্ষমতা পৃথিবীর থেকে অনেক কম। প্রায় এক হাজার ভাগের এক ভাগ। সেখানে আবহাওয়া মণ্ডলও আছে। তবে তা এত পাতলা যে, প্রায়

শূন্যও বলা চলে। অর্থাৎ লুনা-৯ এবং লুনা-১০ চাঁদ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য নতুন ভাবে যাচাই করে নিল।

ওদিকে আতলানতিকের ওপাড়েও তখন স্থুরু হয়ে গেছে রীতিমত তোড়জোড়। রেনজার পরপর যে কয়েক হাজার ছবি তুলে পাঠিয়েছে সে তো তাদের পলক দৃষ্টি মাত্র। সে যেন চলন্ত গাড়ীতে চড়ে আশপাশের দৃশ্য দেখে নেওয়া। বড় বড় গাছপালা, দ্রুত অপস্রয়মান কিছু ঘর বাড়ী অথবা উষর প্রান্তর। চলন্ত গাড়ীতে বসে এদের অনুভব করা চলে। কিন্তু স্পষ্ট করে বোঝা যায় কি ?

অতএব !

জুন ২, ১৯৬৬। হ্যাঁ। সাফল্য ! ওঁরাও সাফল্য অর্জন করলেন। মার্কিন দেশের স্বয়ংক্রিয় মহাকাশযান এই প্রথম ঐ দিন মৃত্বগতিতে চাঁদের বুকে গিয়ে অবতরণ করল। নাম সারভেয়ার ১। নিরাপদে সারভেয়ার ১ গিয়ে নামল ধীরে ধীরে, মৃত্বস্পর্শে চাঁদের পশ্চিম অঞ্চলের বিস্তৃত এক খাদ ফ্লেমস্টিড-এ। এই জায়গাটি নির্বাচনের পেছনে তুটি কারণ ছিল। এক, খাড়া ভাবে নামার ব্যাপারে জায়গাটি আদর্শস্থানীয়। ওঁরা এটাই চাইছিলেন। কারণ এতে ঝক্কি কম। কতকটা হেলিকপটারের মত নিচটা দেখে শুনে মনোমত জায়গায় নামার পক্ষে স্থবিধে। অথচ পাশ থেকে তির্যক পথে প্লেন যেমন রানওয়ের উপর নামে সে ভাবে নামতে গেলে বেশ কিছুটা জায়গার প্রয়োজন। এতে ঘর্ষণজনিত আঘাতে বিপদেরও সম্ভাবনা থাকে। মানুষের অবতরণের সময় যেটা বিপদের কারণ হতে পারে। অতএব সারভেয়ার ১ এর এই খাড়া ভাবে নামার সাফল্য চন্দ্রে পদার্পণের ব্যাপারে একটা মস্ত সাফল্য। আর এই সাফল্যের ফলে মার্কিন দেশ প্রতিপক্ষ সোভিয়েত দেশের উপর টেক্কা মেরে বসল। তুই, ফ্লেমস্টিড-এর চারপাশটা যথেষ্ট মস্থন। তাই সারভেয়ার নামিয়ে

ওঁরা মুখ্যত দেখে নিতে চাইছিলেন ঠিক কি ধরনের জায়গায় অ্যাপলো মহাকাশযানের পক্ষে অবতরণ করা সম্ভব হতে পারে।

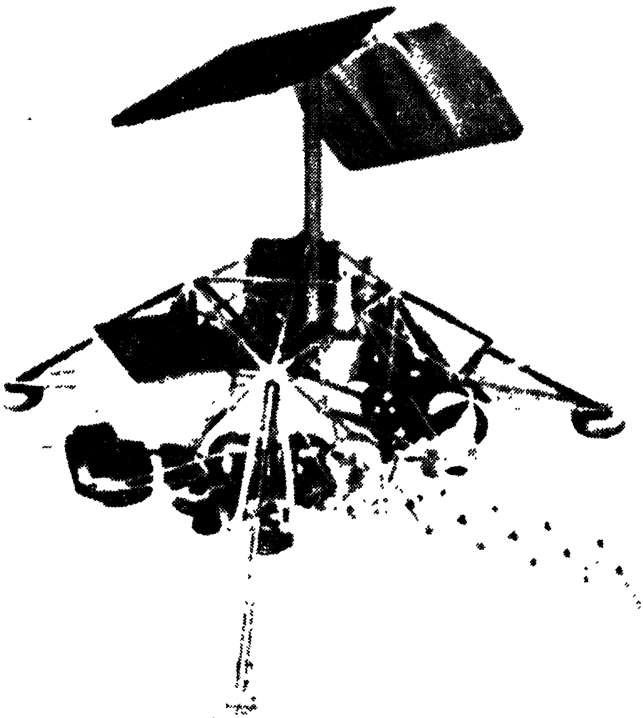
চাঁদের দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘ রাত্রি, সেই সঙ্গে বিভিন্ন আলো আঁধারি মুহূর্তে সারভেয়ারের ক্যামেরা যথাযথ ছবি তুলে গেছে। প্রায় পাঁচ হাজার। এই ছবির কোন কোনটিতে তার সামনের দুটি পায়ের কাছের জমিও ধরা পড়েছে। এমন কি মহাকাশযানটির নিচের দিকের জমিরও, যেখানে পায়ের আঘাতে কিছুটা মাটি সরে গিয়েছিল। ছবিগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঐ অঞ্চলের মাটি গুঁড়ো গুঁড়ো পদার্থ দিয়ে তৈরি।

এরপর চলল একের পর এক সারভেয়ার পাঠানর পালা। সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৬৬ উৎক্ষেপ করা হল সারভেয়ার ২। চাঁদের মাঝামাঝি পথে গিয়ে এক সময় এর তিনটি ইঞ্জিনের একটি বিকল হয়ে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই যাত্রা বিফল হয়ে পড়ে। কিন্তু পরের বছর এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে সারভেয়ার ৩ কে আগের মত ধীর গতিতে চাদের বুকে নামাতে সমর্থ হন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। এবার পরিস্কার বোঝা গেল নিকট ভবিষ্যতে তাঁরা মানব অরোহী শুদ্ধ মহাকাশযানকেও সেখানে নামাতে পারবেন।

সারভেয়ার ৩ এর কার্যাবলী আরও চমকপ্রদ। মাটি খুঁড়ে তোলার মত বিশেষ ধরনের একটি যন্ত্র এতে লাগান ছিল। কতকটা হাতের মত। এই হাত যন্ত্রমগজের সাহায্যে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে যাতে খোঁড়ার কাজ চালিয়ে যেতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়। এই যন্ত্রমগজটিকে নির্দেশ দেওয়া হত পৃথিবী থেকে। ক্যালিফোর্নিয়ার জেট প্রোপালসন ল্যাবোরেটরি মূল পরিকল্পনাটির পরিচালনা করেন।

চাঁদে নামার ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই পৃথিবী থেকে যন্ত্রমগজের প্রতি নির্দেশ গেল, এবার কাজ সুরু করে দাও। সঙ্গে সঙ্গে সারভেয়ার ৩

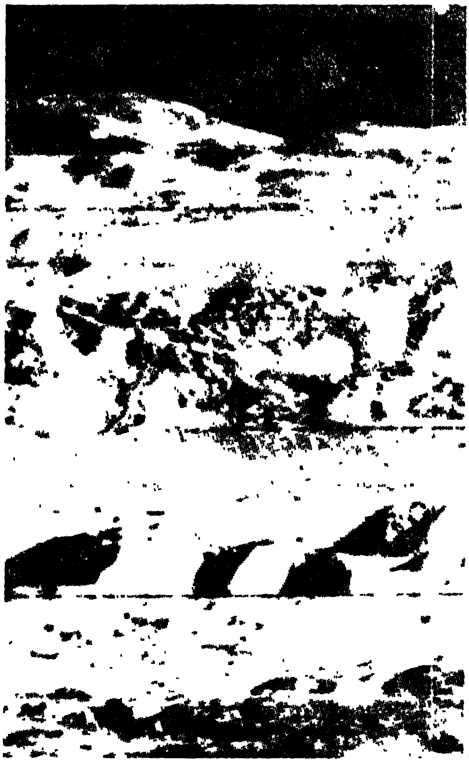
এর যান্ত্রিক হাত স্প্রিং এর সাহায্যে বেরিয়ে এল বাইরে। বেরিয়ে এসেই সে চারদিকে ঘুরে ফিরে কখনও মাটির বুকে আঁচড় কাটতে লাগল, কখনও খুঁড়তে লাগল। অথবা খানিকটা মাটি সরিয়ে সুরু



সারভেয়ার-৩ দু পাশের ডানার মত প্রতিফলক আলো নিয়ন্ত্রিত করে ছবি তুলতে সাহায্য করে

করল গুড়ো করতে। সেই সঙ্গে গর্ত তৈরি করার কাজ। আর প্রত্যেকবার এক একটি কাজ সারার সময় তাকে এমন ভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল যাতে তার কাজের খুঁটিনাটি সারভেয়ারের ক্যামেরা লক্ষ্য করতে পারে এবং সেই সঙ্গে তার ছবি তুলতে পারে। অর্থাৎ ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম। মনে করুন মাটি খোঁড়ার যন্ত্রটি

একটি ছোট্ট পাথরের টুকরো তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি নির্দেশ হলঃ পাথরের টুকরোটি ঠিক মত ক্যামেরার সামনে এনে ধর। যন্ত্রটি অনুগতের মত সামনে এনে ধরল। ক্যামেরা সেই ছবি তুলে পাঠিয়ে দিল পৃথিবীতে। এই ভাবে তার কাজ চলতে থাকে।



কাছ থেকে সারভেয়ারের তোলা চাঁদের পাহাড়

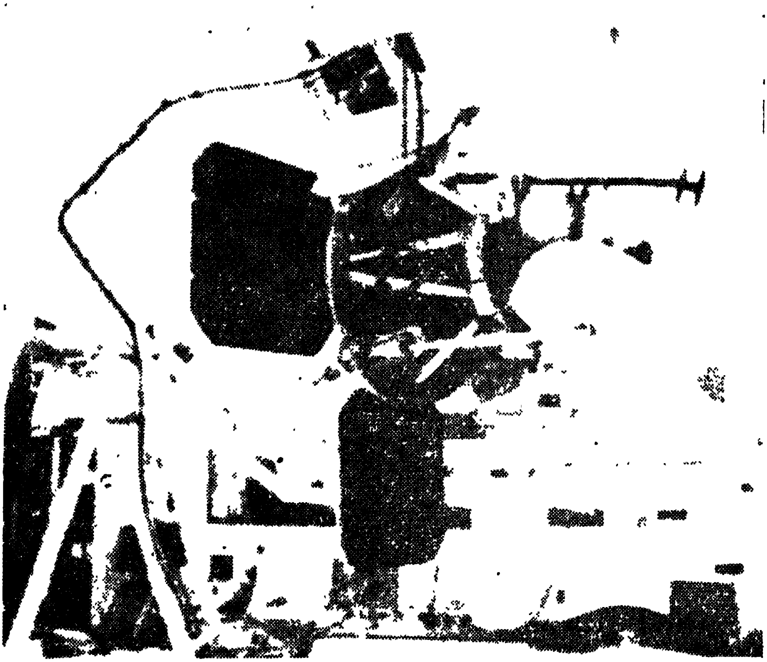
প্রথম ক্ষেপে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শেষ করতে করতে এসে গেল চাঁদের দীর্ঘতম দিন। একটানা পনেরটি চাঁদের দিন ধরে চলে এই দীর্ঘতম দিন। এ সময়ে সেখানকার তাপমাত্রা দারুন ভাবে বেড়ে যায়। তখন দুপুরের দিকে এই তাপমাত্রা দাঁড়ায় দু শ পঞ্চাশ

ডিগ্রি ফার্নহাইটের মত। এত উত্তাপে ক্যামেরাটি খোলা রাখলে অচল হয়ে যেতে পারে। তাই নির্দেশ পাঠিয়ে তখনকার মত তার কাজ বন্ধ রাখা হয়। তবে ইতিমধ্যে মোট ষোল শ টি অত্যন্ত পরিস্কার ছবি পাঠিয়েছিল সারভেয়ার-৩। এই মহাকাশযানটিতে আরও একটি অভিনব ব্যবস্থা রাখা হয়। এর সঙ্গে লাগান ছিল দুটি আয়না। এই আয়না, যে সমস্ত বস্তুর ছবি তোলার কথা তাদের উপর আলো প্রতিফলিত করে টেলিভিশন ক্যামেরাকে স্পষ্ট ছবি তুলতে সাহায্য করে।

কয়েকদিন বিরতি। তারপর মাটি খোঁড়ার কাজ আবার স্থুরু হয় এপ্রিল ২৭ এ। এই সময়ে মাটি খোঁড়ার যন্ত্রটি কিছু কিছু পাথর প্রভৃতি কুড়িয়ে এনে জমা করে মহাকাশযানের পায়ের কাছে। এদের সাদা-কালো ছাড়াও রঙিন ছবি তোলা হয়েছিল। এই ছবিগুলি পরে চাঁদের মাটির বিভিন্ন বর্ণ এবং গঠন সম্পর্কে আরও নতুন তথ্য জুগিয়েছে। পরপর আরও কয়েকটি সারভেয়ার পাঠিয়ে চাঁদের নৈসর্গিক পরিবেশ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ৭ই নভেম্বর ১৯৬৭ তারিখে পাঠান হয় সারভেয়ার ৭। চাঁদে অবতরণ করার পর ১৭ই নভেম্বরে নাটকীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল এই মহাকাশযান। ঐ দিন পৃথিবীর নির্দেশ মত মহাকাশযানটি তার মূল অবতরণস্থল থেকে আটফুট পথ হেঁটে বেড়িয়েছিল। চাঁদের বুকে এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম।

চাঁদের চারপাশের কক্ষপথে লুনা ১০ স্থাপন করার কয়েক মাস পরই মার্কিন বিজ্ঞানীরাও ঠিক অমনি ভাবে তাঁদের নিজেদের মহাকাশযানও সেখানে স্থাপন করতে সমর্থ হন। নাম অরবিটার ১। ঐ একই প্রণালীতে চাঁদকে ঘিরে পরিক্রমণ স্থুরু করে অরবিটার ১। সেই সঙ্গে চলে ছবি তোলার কাজ। কিছুদিন পর অরবিটার ২ কে

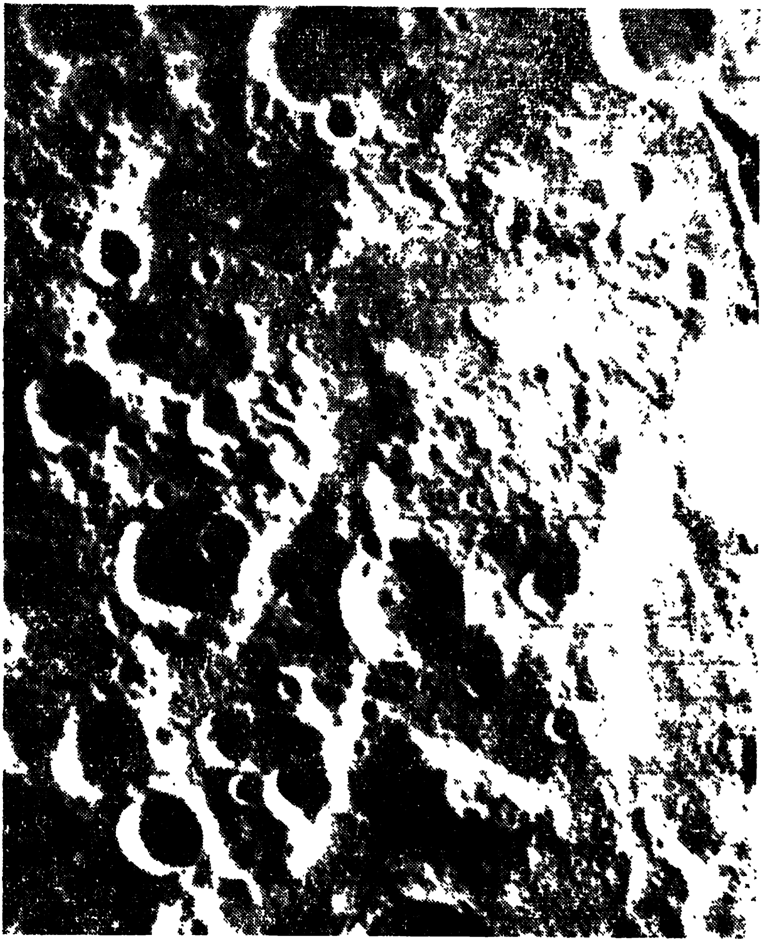
পাঠান হয়। এরা যে সমস্ত ছবি পাঠিয়েছে তাদের দেখে মনে হয়েছে সেখানে পাহাড় বা গহ্বরের ঢাল বেয়ে পাথর বা বস্তু কণা গড়িয়ে নিচের দিকে নেমে আসে। পৃথিবীতে এ ধরনের ব্যাপার হামেশাই ঘটছে। এর ফলে ভু-ত্বক ক্ষয়ে যায়। অতএব বলা চলে এই পদ্ধতিতে চাঁদের বুকেও ক্ষয়ের কাজ সমানে চলেছে। আজও চলেছে। মে ১১,



অরবিটার-৪

১৯৬৭ তারিখে অরবিটার ৪ সর্বপ্রথমে ছবি তুলে পাঠায় চাঁদের দক্ষিণ মেরুর। এই মেরুর অদূরে আর একটি অঞ্চলের ছবিও সে তুলে পাঠিয়েছিল। অদ্ভুত এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রায় এক শ পঞ্চাশ মাইলের মত লম্বা বিরাট একটি ফাটল। ঠিক যেন খালের মত। এই ফাটলের দুপাশ নদীর পাড়ের মত উঁচু। পুরনো কতকগুলি

গহ্বরকে ভেদ করে চলে গেছে। আবার মাঝে মাঝে তার নিজের গহ্বরের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলি নতুন গহ্বর বা জ্বালামুখ।



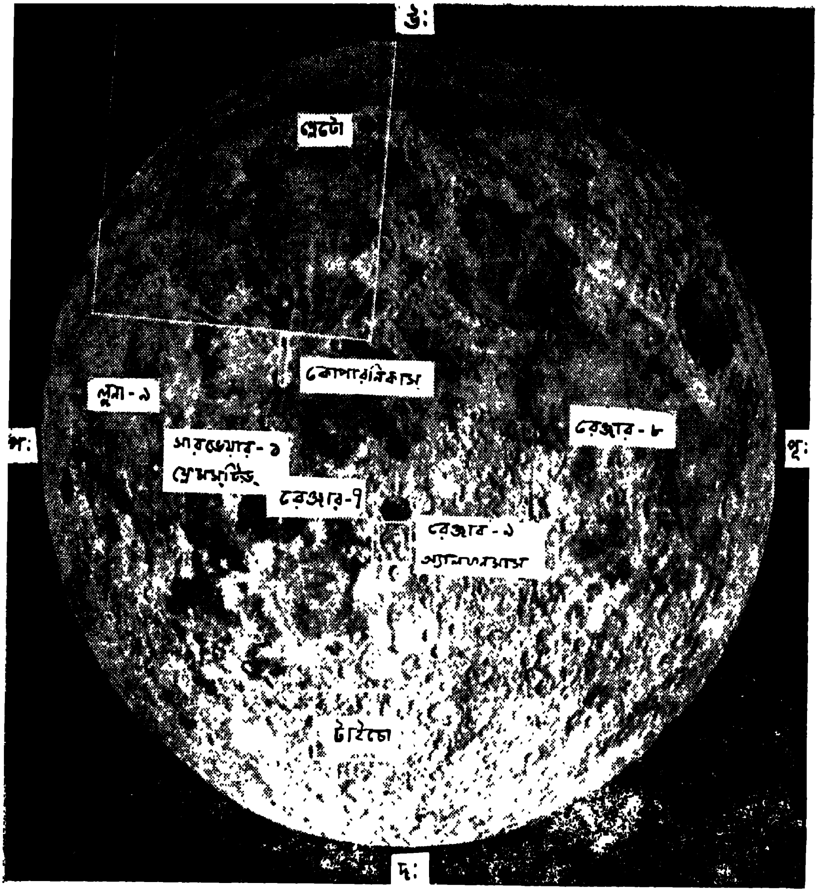
চাঁদের পিঠের পিছন দিকের ছবি তোলে অরবিটার-৪

এর সঠিক কারণ এখনও জানা যায় নি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, চাঁদের উত্তর মেরু ঠিক পৃথিবীর দিকে মুখ করে রয়েছে। আর দক্ষিণ মেরু আছে বিপরীত দিকে। অর্থাৎ পৃথিবীর মেরু অক্ষের

নীরবই রইলেন। কানাঘুষায় শুধু শোনা গেল, তোড়জোড় সেখানেও চলছে। ওঁরা চেষ্টা করছেন মূল মহাকাশযানকেই সরাসরি চাঁদের বুকে নামিয়ে মানুষকে চাঁদের দেশে পাঠাবেন। মার্কিন দেশের মত চাঁদের কক্ষপথে ওঁরা কোন মহাকাশযান স্থাপন করবেন না।



তেইশ হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের ছবি
তুলেছিল অরবিটার-৩



চাঁদের বুকে কে কোথায় নেমেছিল

মানুষ কোন দিনই পৃথিবীর এই সীমিত গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই ভবিষ্যৎ বাণীই করেছিলেন জিওলকভসকি। সেদিন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা এই বিজ্ঞানীকে অনেকেই গ্রহণ করতে চান নি। এমন কি ১৯৩৫ নাগাদ বৃটেনে যে আন্তগ্র্হ বিষয়ক গবেষণা পরিষদটি এ ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন তাঁদের কাছেও মানুষের পক্ষে মহাকাশ যাত্রাটা যেন অলীক এক স্বপ্ন বিলাসের মতই মনে হয়েছিল। এমন কি এই সেদিনও, অর্থাৎ ১৯৫০ সালেও কেউ বিশ্বাস করতে পারেন নি কৃত্রিম উপগ্রহের মত কোন বস্তু মানুষের পক্ষে তৈরি করা কোন দিন সম্ভব হতে পারে। তবু বিশ্বাস অবিশ্বাসের যাবতীয় সংঘাতকে ধুলিস্যাৎ করে স্পুতনিক-১ মহাকাশে কৃত্রিম চাঁদ সৃষ্টি করে বসল। আর তারপরই স্পুতনিক-২ লাইকার মত একটি জীবন্ত প্রাণীকে বহন করে যখন গগন বিহার সুরু করে দিল তখন আশাবাদীর সংখ্যাই যেন বেড়ে উঠতে লাগল দিন দিন। বিশ্ববাসী কৌতুহলে হতভম্ব!

সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৫৯। সোভিয়েত সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' এক সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশন করে জানাল, ঐ দিন মস্কো সময় রাত বারোটা বেজে দুই মিনিটে সোভিয়েত মহাকাশচারী রকেট লুনা-১ চাঁদের বুকে ছোট্ট একটি গোলক ছুঁড়ে দিতে সমর্থ হয়েছে। তার

গায়ে সোভিয়েত সূচক ইউ. এস. এস. আর. লেখা। সম্ভবতঃ ঐ দিনই এই সংবাদ অনেকের মনে একটা প্রচণ্ড বিশ্বাস যোগাতে সমর্থ হয় যে, মানুষের চন্দ্রে পদার্পণের আর বড় একটা দেরি নেই। ১৯৬০-এ খবর পাওয়া গেল সোভিয়েত.দেশ এবার নাকি সত্যি সত্যি একটি জ্যান্ত মানুষকেই মহাকাশে পাঠানর ব্যাপারে তোড়জোড় সুরু করে দিয়েছেন। ঐ বছর ১৫ই মে তারিখে মানুষের মত ভারী বোঝা বইতে পারে এমন ধরনের একটি মহাকাশযানকেও তাঁরা আকাশ বিচরণের জন্যে পাঠিয়ে দিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত এই যানটিকে ধীর গতিতে মাটির বুকে নামিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। তবে এর তিন মাস পর আগস্ট ১৯ তারিখে তাঁরা আর একটি মহাকাশযান মহাকাশে পাঠান। এর যাত্রী ছিল চারটি কুকুর। বেলকা, স্ট্রেলকা, শেরনুসকা এবং জিভওজডস্কা। যাত্রীসহ এই মহাকাশযানটিকে তাঁরা নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হন। এরপর আরও চারটি মহাকাশযানকে তাঁরা অনুরূপ ভাবেই ফিরিয়ে আনেন।

অতঃপর এপ্রিল ১২, ১৯৬১। পৃথিবীর প্রথম মানুষ ইউরি অ্যালেকসিয়েভিচ গ্যাগারিন মহাকাশ পথে এক ঘণ্টা আটচল্লিশ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষীণ করে সুস্থদেহে মাটির বুকে ফিরে এলেন। সুরু হল মানুষের মহাকাশ যাত্রার সুবর্ণময় ইতিহাস।

সোভিয়েত দেশের এই সাফল্য যেমন সারা বিশ্বে একটা দারুন বিস্ময় এবং কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল, ঠিক তেমনই নৈরাশ্যে ঢেকে দিয়েছিল মার্কিন মুলুকের সমস্ত মানুষকে। একথা আগেই বলেছি। ইতিপূর্বে এঁরা যে মার্কারি প্রকল্প চালু করেছিলেন তাতে তাঁদের এই বিশ্বাস জন্মেছিল হয়ত সোভিয়েত দেশের আগেই তাঁরা মহাকাশে মানুষ পাঠাতে পারবেন। কিন্তু একান্ত দুর্ভাগ্য! কার্যতঃ তখনকার মত তাঁরা ব্যর্থ হলেন।

তবে এই পরীক্ষার একটা সুফল কিন্তু কি সোভিয়েত দেশ, কি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই লাভ করলেন। মহাকাশে ভ্রমণের ব্যাপারে একটা প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস উভয় দেশের মধ্যেই পরবর্তী অভিযান-গুলিকে খুবই ত্বরান্বিত করে গেল। বিশেষ করে এর পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে মার্কিন প্রচেষ্টা দারুনভাবে বেড়ে যায়।

ভোস্তক-১ প্রসঙ্গে বিস্তারিত কোন তথ্য সোভিয়েত দেশ প্রচার করেন নি। যেটুকু জানান হয় তা হল, মহাকাশযানে করে উর্দ্ধাকাশে মানুষ পাঠানই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সেই সঙ্গে নিরাপদে তাকে পৃথিবীর মাটিতে ফিরিয়ে আনা। গ্যাগারিন একবার পৃথিবী প্রদক্ষীণ করেন। ফিরে আসার পর তাঁর উপর কিন্তু কিছু ডাক্তারী পরীক্ষা চালান হয়েছিল। তবে তার ফলাফল জানানর ব্যাপারে সোভিয়েত দেশ বাইরের জগতের কাছে নীরবতাই পালন করে এসেছেন।

এদিকে আতলানতিকের ওপারে তখন প্রচণ্ড তোড়জোড় সুরু হয়ে গেছে। মার্কিন দেশের মার্কারি প্রকল্পকে ত্বরান্বিত করে ১৯৬১ র ৫ মে তারিখে প্রথম মার্কিন নভচর অ্যালেন সেপার্ডকে তোলা হল মহাকাশে। তবে তখনও সোভিয়েত দেশের তুলনায় তাঁদের রকেটের ক্ষমতা যে যথেষ্ট কম সেটা বুঝতে অসুবিধে হল না।

ফ্লোরিডার আজকের সেই স্থানটি তখনও কেপ কেনেডি বলে পরিচিত হয় নি। তখন সে কেপ ক্যানাভেরাল। মে ৫, ১৯৬১। প্রক্ষেপক মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে মার্কার প্রকল্পের প্রথম মানুষবাহী মহাকাশযান ফ্রিডাম-৭ দাঁড়িয়ে। হাজারো দর্শকের মধ্যে প্রধান সাক্ষী ছ শ জন সাংবাদিক। তাঁরা দেড় মাইল দূরে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনের মধ্যে দিয়ে শুনে চলেছেন শেষ সংকেত বার্তা : দশ, নয়,…। ফ্রেণ্ডশিপকে ঠেলে তোলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রেডস্টোন-৩ রকেট।

শেষ সংকেতের সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোট্ট আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখা

দিল রকেটের নিচে। তারপর একটু কেঁপে সোজা উঠে গেল আকাশের দিকে, দূরে। আরও দূরে। শেষে মনে হতে লাগল যেন সেটি একটি হিলিয়ামপূর্ণ বেলুন। তার নিচে ঝুলে রয়েছে ছোট্ট একটি লণ্ঠন।

ক্রমে আগুনের শিখা হয়ে এল অস্পষ্ট। মার্কারি রেডস্টোন-৩ চোখের বাইরে চলে গেল। এই প্রথম আতলানতিকের ওপারের মানুষ অ্যালেন সেপার্ড উঠলেন মহাকাশে। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁকে বহন করে রকেটটি কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আতলানতিক মহাসাগরের দিকে মুখ করে খানিকটা ঝুঁকে পড়ে। অবশেষে উৎক্ষেপণের পনের মিনিট বাইশ সেকেণ্ড পর প্রায় তিনশ দুই মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে আতলানতিক মহাসাগরে গিয়ে নিরাপদে অবতরণ করেন। গগন বিহারের সময় ঊর্দ্ধাকাশে তাঁর রেকর্ড দূরত্ব ছিল একশ সাড়ে ষোল মাইল। অক্টোবর ৭, ১৯৫৮ তে সুরু হয়েছিল মাকিন দেশের জাতীয় প্রকল্প মার্কারি। এর মূল লক্ষ্য ছিল তিনটি। এক, পৃথিবীর চারপাশে কোন নির্দিষ্ট কক্ষ পথে মানববাহী মহাকাশযান স্থাপন। দুই, মহাকাশের পরিবেশে মানুষ কতটা স্বাভাবিক অবস্থায় বাস করতে পারে এবং সেখানে তার কর্মক্ষমতাই বা কতটা বজায় থাকে সেটা দেখে নেওয়া। তিন, মহাকাশ থেকে নিরাপদে নভচর এবং মহাকাশযানকে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনা।

সেপার্ডের ক্ষেত্রে কেবল মাত্র তিন নম্বর লক্ষ্যটি কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পন্ন করা গিয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীকে পুরোপুরি বেষ্টন করে তাঁকে বিচরণ করান সম্ভব হয় নি। এর দু মাস পর জুলাই ২১, ১৯৬১ তে ভার্জিল গ্রিসমকেও অনুরূপ ভাবে আকাশে তোলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল একই ধরনের পরীক্ষা চালান। কিন্তু আতলানতিক মহাসাগরে তাঁর মহাকাশযান লিবার্টিবেল-৭ অবতরণ করার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ মহাকাশযানটির দরজা খুলে যায় এবং ভেতরে জল ঢুকে পড়ে।

মহাকাশযানটি জলের মধ্যে ডুবে যায় এবং নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে গ্রিসম কোন রকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসেন। অতএব বলা চলে এই অভিযানটি এক প্রকার ব্যর্থই হয়ে গেল।

আগস্ট ৬, ১৯৬১। এবার সোভিয়েত দেশের দ্বিতীয় চমক। ঐ দিন ওঁরা তাঁদের দ্বিতীয় নভচর ঘেরমান স্তেপানোভিচ টিটভকে পাঠালেন মহাকাশে। মহাকাশযান ভোস্তক-২। এই প্রথম পৃথিবীর চারপাশে আর একজন রুশ দীর্ঘসময় বিচরণ করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করে বসলেন। টিটভকে নিয়ে ভোস্তক-২ সতেরবার পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করেছিল। মোট সময় পঁচিশ ঘণ্টা আঠারো মিনিট।

অতঃপর ভোস্তক-৩ এবং ৪। ভোস্তক-৩ এর নভচর আঁন্দ্রিয়াঁ নিকোলায়েভ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন চৌষট্টিবার। মোট সময় চুরানব্বই ঘণ্টা বাইশ মিনিট। আর নভচর পাভেল পপোভিচ চার নম্বর ভোস্তক যানে ঘুরলেন আটচল্লিশ বার, সময় সত্তর ঘণ্টা সাতান্ন মিনিট।

ইতিমধ্যে মার্কিন দেশও রীতিমত উঠে পড়ে লেগে গেছেন। এ পর্যন্ত মহাকাশ গবেষণাকে যতটা তাত্ত্বিক দিক দিয়েই তাঁরা গ্রহণ করুন না কেন, সোভিয়েত দেশের ক্রমান্বয় সাফল্য যেন জোর করেই তাঁদের কতকটা প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দিল। পরিস্কার তাঁরা অনুভব করলেন বিশ্বের দ্বিতীয় শক্তির কাছে প্রযুক্তির দিক দিয়ে এ যেন তাঁদের মস্ত বড় এক পরাজয়। দ্বিতীয়ত সোভিয়েত দেশের এত দ্রুত সাফল্যতে তাঁরা শঙ্কিতও হলেন কম নয়। নিতান্ত অকারণ যে আশঙ্কা, তাও বলা চলে না। মহাকাশযানের অবাধ বিচরণ, সেই সঙ্গে তার মধ্যে আবার যদি মানুষ বসে থাকে তাহলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাপারটা আর টিকে থাকে কি করে। মুখে না বললেও উভয় দেশের আচরণ থেকেই এই মনোভাবটা সেদিন কারুর কাছে

আর অস্পষ্ট ছিল না। অতএব জোরে, আরও জোরে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁদেরও দেখিয়ে দিতে হবে মহাকাশে তাঁদের দেশের মানুষও অবাধে বিচরণ করতে পারে।

সাফল্য এল। মার্কারি প্রকল্পের তৃতীয় মহাকাশযান ফ্রেনডশিপ-৭কে তাঁরা পৃথিবীর চারপাশের কক্ষপথে স্থাপন করলেন ফেব্রুয়ারী-২, ১৯৬২তে। ঐ দিন মার্কিন নভচর জন গ্লেন চার ঘণ্টা ছাপান্ন মিনিটে পৃথিবীকে তিনবার পুরোপুরি প্রদক্ষীণ করে ফিরে এলেন। এবং তারপরই মে ২৪, ১৯৬২ স্কট কার্পেনটার ঘুরে এলেন আরও তিনবার, চার ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিটে অরোরা-৭ মহাকাশযানে। সিগমা-৭ এবং ফেইথ-৭ এ গগন বিহার করলেন যথাক্রমে ওয়ালটার শিরা এবং গর্ডন কুপার। শিরা ন ঘণ্টা তেরো মিনিটে ছয়বার এবং কুপার চৌত্রিশ ঘণ্টা কুড়ি মিনিটে বাইশ বার। তারিখ অক্টোবর ৩, ১৯৬২ এবং মে ১৫ থেকে ১৬, ১৯৬৩। এই সঙ্গেই মার্কারি প্রকল্পের ঘটল সমাপ্তি। প্রায় সোয়া তিন বছরের মধ্যে যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গেই তাঁদের যাবতীয় লক্ষ্য যে সিদ্ধ হয়ে গেল, তাঁদের পরবর্তী প্রচেষ্টা থেকে তা বোঝা মোটেই কঠিন হল না। এই প্রকল্পের যে তিনটি মূল উদ্দেশ্যের কথা এর আগে উল্লেখ করেছি তাতে তাঁরা সিদ্ধিলাভ করলেন। বিশেষ করে কুপারের দীর্ঘকাল মহাকাশে বিচরণ এবং নিরাপদে প্রত্যাবর্তন তাঁদের যথেষ্ট নিঃশংসয় করে তুলল। বুঝলেন, মানুষের পক্ষে মহাকাশে টিকে থাকা শক্ত নয়। দ্বিতীয়ত মহাকাশ গবেষণায় সরাসরি মানুষের সাহায্য নিলে খরচও পড়বে যথেষ্ট কম। কারণ স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রপাতি তৈরির খরচ এবং তাদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার ঝামেলাও অনেক।

ওদিকে সোভিয়েত দেশ এরই মধ্যে আরও দুটি ভোস্তক মহাকাশযানে দীর্ঘ আকাশ পরিক্রমায় পাঠালেন আরও দুজন

নভচর। বাইকোভস্কি এবং তেরেস্কোভা। জুন ১৪, ১৯৬৩ ভোস্তক-৫ এ যাত্রা করেন ভ্যালেরি বাইকোভস্কি। তার দু দিন পর অর্থাৎ জুন ১৬ তারিখে যাত্রা করলেন পৃথিবীর প্রথম নারী নভচর ভালেনতিলা তেরেস্কোভা। বাইকোভস্কি মোট এক শ উনিশ ঘণ্টা ছয় মিনিটে একাশিবার ভূ-প্রদক্ষিণ করেন। এবং ভালেনতিনা আটচল্লিশবার প্রদক্ষিণ করলেন সত্তর ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিটে। জুন ১৯ এঁরা দুজনেই সাফল্যের সঙ্গে মহাকাশে বিচরণ করে মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এই সঙ্গে সোভিয়েত দেশের প্রথম পর্বের মানব আরোহী মহাকাশ প্রকল্পের পরিসমাপ্তি ঘটল।

এখানে দুটি জিনিস লক্ষ্য করার মত। এক, মহাকাশ প্রতিযোগিতায় প্রথম দিকে দারুনভাবে এগিয়ে থাকলেও ১৯৬৩র মধ্যেই সোভিয়েত দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগের ব্যবধান বেশ কিছুটা কমে এল। দুই, এ পর্যন্ত উভয় দেশ যে সমস্ত মহাকাশযান মহাকাশে পাঠিয়েছিলেন তারা আয়তনে যথেষ্ট ছোট ছিল। তুলনায় অবশ্য সোভিয়েত রকেটের ক্ষমতা তখনও অনেক বেশি। মার্কিন দেশের রেডস্টোন রকেট তার কাছে বালকই বলা চলে। তিন, তখনও পর্যন্ত উভয় দেশের মহাকাশযান ওজন এবং আয়তনে যথেষ্ট কম ছিল। ফলে এক সঙ্গে একাধিক নভচরকে মহাকাশে কেউ পাঠাতে পারেননি।

সোভিয়েত দেশ থেকে বলা হয়, তাঁদের ভোস্তক মহাকাশযান-গুলি পরপর উন্নত ধরনের করে তৈরি করা হয়েছে। নভচরের কক্ষকে যথাযথভাবে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখা, চাপ এবং তার আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত করা, সেই সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের জন্যে নিয়মিত অক্সিজেন সঞ্চারণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বিতাড়ন, এমন অনেক ব্যবস্থারই যথেষ্ট উন্নতি করতে তাঁরা সমর্থ হন। সমস্ত স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নভচর নিজেও যাতে কাজ করতে

পারেন তার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। পরিকল্পনার দিক দিয়ে ভোস্তক-৩ এবং ৪ প্রায় ভোস্তক-১ এবং ২ এর মতই ছিল। শুধু তাদের মধ্যে একটি করে টেপ রেকর্ডার এবং একটি ক্ষুদ্র এবং মাঝারি তরঙ্গের বেতার যন্ত্র স্থাপন করা হয়। এ ছাড়া প্রথম দিকে তুইটি মহাকাশযানেই চালকদের বিশেষ একটি ব্যবস্থার সাহায্যে যানের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ফলে একই জায়গায় তাঁদের প্রায় স্থির হয়ে বসে থাকতে হয়। কিন্তু পরে ভোস্তক-৩ থেকে পরবর্তী যানগুলিতে চেয়ারের মত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে মহাকাশযানের মধ্যে বিভিন্ন গবেষণা প্রভৃতির ব্যাপারে নভচররা ইচ্ছেমত চলাফেরা করতে পারতেন।

একটি প্রবন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে গ্যাগারিন বলেছেন, মহাকাশযানে জীবনটাকে শূন্য মাধ্যাকর্ষণের গহ্বরের মধ্যে রেখে দেওয়া হল। মনে হয়েছিল, হয়ত এই সব কিছু শেষ হতে চলেছে। কিন্তু না। ভিন্ন ভৌত পরিবেশে ভারহীন অবস্থাতেও দেহ তার জৈবিক কাজ সমানে চালিয়ে গিয়েছে।

বর্তমান লেখকেরও কিছুটা সময় ভারহীন পরিবেশে কাটানর সৌভাগ্য ঘটেছিল। ১৯৬৮র গোড়ার দিকে অস্টিনে অবস্থিত টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন চাঁদের ভূ-পৃষ্ঠ বিষয়ক জনৈক বিজ্ঞানী ডঃ কিং। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সারভেয়ার প্রকল্পের সঙ্গে তখন তিনি জড়িত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ বক্তৃতামালায় তিনি যোগদান করতে এসেছিলেন। চাঁদের ভূ-ত্বক সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে ভারহীন পরিবেশ সম্পর্কে অনেক কথা এঁর কাছে শোনা গেল। প্রসঙ্গত জানালেন, সান আন্তেনিও সহরে গলে কিছুটা অভিজ্ঞতা আমরাও পেতে পারি। লোকরঞ্জনের জন্যে সেখানে হেমিস্ফিয়ার মেলায় কোন একটি কোম্পানি ভারহীন পরিবেশ সৃষ্টি করার একটি যন্ত্র বসিয়েছেন।

পরের সপ্তাহেই আমার জনৈক বন্ধু রবার্ট ক্রওফার্ডের সঙ্গে অস্টিন থেকে প্রায় পঁচাশি মাইল দূরে সান আন্তেনিওতে যাই। এবং যথানিয়ত সেই কোম্পানির তৈরি ভারহীন-কক্ষে গিয়ে দাঁড়ালাম। প্রায় কুড়ি ফুট ব্যাসের চোঙের মত একটি ইস্পাতের কক্ষ। মাথার ওপরটা ফাঁকা। পায়ের নিচে লোহার তৈরি মেঝে। মোট জন ত্রিশেক উৎসাহীর ভিড় মেঝের উপর। এক সময়ে আমাদের দেওয়ালের গা ঘেঁষে স্থির হয়ে দাঁড়াতে বলে সেই কক্ষটিকে প্রচণ্ডবেগে ঘোরাতে সুরু করা হল।

আট সেকেণ্ড। হঠাৎ পায়ের নিচের ইস্পাতের মেঝে সশব্দে পা থেকে খসে গিয়ে প্রায় পনের ফুট নেমে গেল। দেওয়ালের গায়ে আমরা সেঁটে রয়েছি। আর সেই সঙ্গে শূণ্যে ঝুলছি সকলেই। প্রায় দশ সেকেণ্ড এই ভাবে আমাদের রেখে দেওয়া হয়। পরে ঘর থেকে যখন বেরিয়ে আসি মাথার ভেতরটা ঘুরছে। প্রচণ্ড বমি বমি ভাব। হাত পা'র মধ্যে প্রবল আচ্ছন্নতা। কণ্ঠস্বর যেন যথেষ্ট ক্ষীণ হয়ে এসেছে। দৃষ্টি শক্তিও।

দশ সেকেণ্ডেই যদি এমন অবস্থা হয়, তাহলে বুঝতেই পারছেন যাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারহীন পরিবেশে থাকবেন তাঁদের দৈহিক অবস্থাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্যে কি প্রচণ্ড নিরাপত্তা গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ সোভিয়েত দেশের ভোস্তক প্রকল্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কারি প্রকল্প মোটামুটি ভাবে নভচরের দৈহিক এবং মানসিক দিকের উপরই খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

সেই সঙ্গে স্পেশ নেভিগেশন বা মহাকাশযান পরিচালনার ব্যাপারেও।

অতঃপর দ্বিতীয় পর্ব। ১৯৬৩র মে মাসে কুপারের বাইশবার ভূ-প্রদক্ষিণের পর 'নাসা' তাঁদের মার্কারি প্রকল্পের পরিসমাপ্তির কথা

ঘোষণা করলেন। আর তার পর মুহূর্তেই সুরু হয়ে গেল চন্দ্রযাত্রার তোড়জোড়। সেই প্রথম বিজ্ঞানীরা সামগ্রিকভাবে চন্দ্রাভিযানের পরিকল্পনাটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা সুরু করে দিলেন। সেই প্রথম সোচ্চার হয়ে উঠল চাঁদের ভেলার কথা। প্রথম দিকে ছবি-ছড়ার মত মনে হলেও মার্কিন বিজ্ঞনীরা বুঝলেন, মানুষকে যদি নিরাপদে চাঁদে অবতরণ করতে হয় তাহলে ঐ রকম একটি ভেলার অবশ্য প্রয়োজন আছে।

বস্তুতঃ এ ব্যাপরটার উপর বেশ কিছু সময় যথেষ্ট বিতর্কেরও সূচনা হয়েছিল। ১৯৬১তে যুক্তরাষ্ট্র সরকার হঠাৎ ঘোষণা করে বসলেন, বর্তমান দশকের মধ্যে অবশ্যই তাঁরা চাঁদের দেশে মানুষ পাঠাবেন। এবং সেই মত 'নাসা' এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশও দেওয়া হল। কিন্তু সরকার মস্ত বড় একটি প্রশ্নের কথা সম্ভবতঃ তখনও খেয়াল করেন নি। যাকে বলে মূল প্রশ্ন। সেটা হল, অতদূরে কি ভাবে মানুষকে নিরাপদে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। তারপর চাঁদের বুকে নামিয়ে আবার তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা? 'নাসা', বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা সমবেত ভাবে বার বার বিষয়টি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে সুরু করলেন।

সেটা ১৯৬১র শেষাশেষি। কিভাবে মানুষকে চাঁদে অবতরণ করান হবে এ নিয়ে তিনটি দল তখন রীতিমত মাথা ঘামাতে সুরু করলেন। একটি দলের প্রধান ছিলেন ডঃ ম্যাকসিম ফ্যাজেট। ইনি মার্কারি মহাকাশ কক্ষ বা ক্যাপস্যুলের প্রধান পরিকল্পক। ইনি বললেন, সরাসরি পৃথিবী থেকে একটি রকেটের সাহায্যেই মানুষকে চাঁদের দেশে পাঠান যেতে পারে।

কিন্তু রীতিমত বির্তর্কের সম্মুখীন হতে হল ফ্যাজেটকে। তাঁর সমালোচক বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদরা বললেন, সেটা প্রায় অসম্ভব

ব্যাপার। যদি রকেটের সাহায্যে মানুষকে সরাসরি চাঁদে নামাতে হয় তাহলে সেই রকেটের আয়তনটা একবার ভেবে দেখুন। কারণ সে ক্ষেত্রে তেমন একটি রকেটকে কম করেও বারো লক্ষ পাউণ্ডের মত ঘাত সৃষ্টি করতে হবে। আর সে ধরনের একটি রকেটকে চাঁদের মাটি থেকে আবার ফিরিয়ে আনার কাজটাও খুব একটা সহজ কিছু হবে না।

এবার এলেন দ্বিতীয় দল। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ ছাড়াও এ দলের অন্যতম ব্যক্তিটি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত রকেট-বিজ্ঞানী ডঃ ওয়ারনহার ফন ব্রাউন। ডঃ ফন ব্রাউনের পরিকল্পনায় বলা হল, চাঁদে যেতে গেলে একটি অতিকায় রকেটের পরিবর্তে ছোট আয়তনের দুটি মাঝারি ধরনের রকেট নিলেই কাজ চালান যেতে পারে। একটি বহন করবে নভচরবাহী কক্ষটিকে। অপরটি বহন করবে অতিরিক্ত পরিমাণ জ্বালানি। পৃথিবী থেকে কিছু দূরে পর পর রকেট দুটিকে পাঠান হবে নির্দিষ্ট কক্ষ পথে। পরে এরা পরস্পর মিলিত হবে। মহাকাশে মিলনের পর উদ্বৃত্ত জ্বালানীবাহী রকেটটির সঙ্গে মানুষবাহী ক্যাপস্যুলটী জুড়ে দিয়ে তৈরি করা হবে চন্দ্রযান। সেই যান গিয়ে নামবে চাঁদের বুকে।

কিন্তু এ পরিকল্পনাটিও শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না। কারণ মানুষকে বহন করতে হলে চাই আরও ভারী এবং বড় আকারের কক্ষ। এর মধ্যে বিভিন্ন গবেষণার যন্ত্রপাতি ছাড়াও থাকবে মানুষকে নিরাপদে রাখার জন্যে নানা রকম যন্ত্রপাতি। ফলে মহাকাশযানটির ওজন আরও বেড়ে যাবে। প্রযুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে সে রকম যানকে চাঁদের মাটি থেকে ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে। তা ছাড়া ঐ সময়ে এখনকার মত বড় রকেট তৈরি করতে গেলে যে ধরনের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সুযোগ সুবিধে থাকা দরকার মার্কিন দেশে তেমন সুযোগ সুবিধে তখনও গড়ে ওঠে নি।

বরং ১৯৬২ নাগাদ সোভিয়েত দেশ ওঁদের চেয়ে অনেক বড় রকেট তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

অবশেষে যাচাই করে দেখা হল তৃতীয় দলের কথা। এঁদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন ক্যালিফোর্নিয়ার জেট প্রোপালসন ল্যাবোরেটরির কয়েকজন বিজ্ঞানী। উল্লেখ্য, এঁরাই সারভেয়ার এবং আরবিটার চন্দ্রযানের পরিকল্পক ছিলেন। এঁরা বললেন প্রথমে প্রয়োজনীয় জ্বালানি এবং অন্যান্য সরবরাহ ভিন্ন ভিন্ন মানব আরোহী-হীন যানের সাহায্যে চাঁদে পাঠান হোক। তারপর এদেরকে চাঁদের চারপাশের কক্ষপথে এমন ভাবে স্থাপন করা হোক যাতে চাঁদের উপগ্রহের মত তারা সেখানে আবর্তন করে। ঠিক অরবিটারের ক্ষেত্রে যেমনটি করা হয়েছিল তেমন। চাঁদে অবস্থান করার সময় এবং পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্যে নভচর ঐ জ্বালানি এবং অন্যান্য সরবরাহ সেখান থেকে নিয়ে খরচ করবেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা হল এইরকম। মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী চাঁদের কক্ষপথে ঘুরতে লাগল। ভিন্ন মহাকাশযানে চড়ে মানুষ গিয়ে নামল চাঁদে। সেখানে থাকার সময় তার যখন-যা প্রয়োজন হবে চাঁদের চারপাশে পরিক্রমণরত যান থেকে তা তাঁরা সংগ্রহ করবেন। তারপর পৃথিবীতে ফেরার যখন প্রয়োজন হবে তখন সেখান থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে তাঁরা কাজ চালাবেন।

এবারও সমালোচকের সংখ্যা কম হল না। দুটি বিষয়ে এঁরা দারুন বিরোধিতা করলেন। বললেন, এ ভাবে কাজ চালাতে গেলে ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির মত অবস্থা হবে। প্রত্যেকবার প্রচুর রকেট ছেড়ে জ্বালানি, খাবার দাবার প্রভৃতি পাঠাও। তারপর হয়ত চাঁদে গিয়ে নামলেন দুই বা তিনজন মানুষ। অত রকেট পাঠানর খরচটা কোথায় দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখুন। তাছাড়া, যদি এমন হয়, নভচররা হয়ত গিয়ে নামলেন এমন জায়গায় যেখান থেকে

সেই সমস্ত সরবরাহবাহী মহাকাশযানের দূরত্ব অনেকটা হয়ে গেল। তখন? এমন হাওয়াটা অসম্ভবও নয়। তখন তাঁদের পক্ষে চাঁদ থেকে অতটা পথ উড়ে এসে সেই সরবরাহ যোগাড় করা শক্তও হতে পারে।

ইতিমধ্যে চমক ঘটালেন 'নাসা'র বিমান-বিজ্ঞান শাখার ইনজিনিয়ার ডঃ জন সি· হাওবোল্ট। হঠাৎ পেন্সিল দিয়ে এক টুকরো প্যাডের কাগজের উপর একটি ছক এঁকে ফেললেন তিনি। বলা হল চাঁদে অবতরণ করার এটিই হল চতুর্থ পরিকল্পনা। এবং নিঃসন্দেহে আগেরগুলির চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য।

ডঃ হাওবোল্ট গোড়ার দিকে যে ছবিটি আঁকেন তার পরিকল্পনা আজকের লুনার মড্যুল বা চাঁদের ভেলার মত। মাকড়সার পায়ের মত সব পা-বিশিষ্ট এই যানটি জোড়া থাকবে মূল মহাকাশযানের সঙ্গে। চাঁদের কাছে গিয়ে যখন ভেলাটি খসে বেরিয়ে আসবে তখন মূল যানটি চাঁদের চারপাশে একটি কক্ষপথে বিচরণ করতে থাকবে। নভচরকে নিয়ে ভেলা নামবে চাঁদে। তারপর কাজের শেষে সেখান থেকে সেটা ফিরে এসে হাজির হবে মূল মহাকাশযানে। তারপর ফেরৎ যাত্রা পৃথিবীর দিকে।

প্রথম দিকে ডঃ ফন ব্রাউন এবং ডঃ ফ্যাজেট উভয়েই এই পরিকল্পনাটিকে বড় একটা সাদরে গ্রহণ করতে পারেন নি। পরে অবশ্য এঁরাই যথেষ্ট আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং এঁদের প্রচেষ্টায় ঠিক হয়ে যায়, ডঃ হাওবোল্টের পরিকল্পনাটিকেই কার্যকর করা হবে।

এরপর থেকেই মার্কিন বিজ্ঞানীরা তিনটি প্রধান লক্ষ্য ধরে অগ্রসর হতে সুরু করেন। এক, ওঁরা ১৯৬২ থেকেই চাঁদের ভেলাটির মোটামুটি পাকা ছক তৈরি করে পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজে হাত দিলেন। দুই, হাত দিলেন আরও বড় মহাকাশযান তৈরি করায়, যাতে করে একাধিক নভচরকে দীর্ঘকালের জন্যে তাঁরা

মহাকাশে বিচরণের অভিজ্ঞতা যোগাতে পারেন। সেই সঙ্গে ভারী রকেট তৈরির কাজও। তিন, সারভেয়ার এবং অরবিটার নামে মানব আরোহীহীন স্বনিয়ন্ত্রিত মহাকাশযান চাঁদের দেশে পাঠিয়ে চাঁদ সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগ্রহ এবং চাঁদে মানুষের অবতরণ করার মত উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধানের কাজ। এদের কথা পূর্ববর্তী অংশে আলোচনা করেছি।

অতএব সুরু হয়ে গেল আরও জটিল পরীক্ষা। সুরু হল মার্কিন দেশের মহাকাশযাত্রার মধ্যপর্ব। নাম জেমিনি প্রকল্প। মানুষের চান্দ্রযাত্রার মধ্য প্রস্তুতি দশা।

এদিকে সোভিয়েত দেশ। ভোস্তক পর্বের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর পরিস্কার বোঝা গেল দারুন একটা কিছু ওঁরা করবেনই। এবং তা করবেন অতি নিকট ভবিষ্যতেই। এই সময়ে মানব আরোহীহীন মহাকাশযান লুনা পাঠিয়ে একের পর এক চাঁদ সম্পর্কে যে সমস্ত অভিনব তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হন সেগুলির দিকে চেয়ে প্রত্যেকেই ধরে নিয়েছিলেন খুব অল্পদিনের মধ্যেই ওঁরা চন্দ্রযাত্রার প্রস্তুতি পর্ব শেষ করে ফেলবেন।

এ ধরনের অনুমানের পেছনে যুক্তিও ছিল। কারণ মার্কিন মুলুকে যখন জেমিনি প্রকল্পের ব্যাপারে তোড়জোড় সুরু হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে অবিশ্বাস্য রকমের চমক সৃষ্টি করে বসলেন ভল্গা নদীর মানুষ। আতলানতিকের ওপারের মানুষের কাছে সে যেন মাথায় হাতুড়ীর আঘাত পড়া।

অক্টোবর ১২, ১৯৬৪। ঐ দিন সোভিয়েত দেশ পৃথিবীর মহাকাশের কক্ষ পথে স্থাপন করলেন আরও বড় মহাকাশযান। আরও উন্নত ধরনের এবং যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। ভোস্খদ-১। একেবারে তিনজন আরোহী এতে চেপে বসলেন। এঁরা হলেন ঝানু বিমান

চালক ভ্লাদিমির কোমারোভ, কনসতানতিন ফিওকতিসতভ এবং বোরিস ইয়েগোরভ। চব্বিশ ঘণ্টা সতের মিনিটে এঁরা সতেরবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। এই প্রথম এক সঙ্গে তিনজন মানুষ মহাকাশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। কোমারোভের উপর দায়িত্ব ছিল ভোস্খদ-১ কে চালিয়ে নেওয়ার। ফিওকতিসতভ হলেন বিজ্ঞানী। ইয়েগোরভ ডাক্তার। নতুন এই মহাকাশযানটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এটিকে অতি সন্তর্পণে মাটির বুকে অবতরণ করান সম্ভব হয়। আকাশ থেকে নেমে আসার সময় পাঁচ কিলোমিটার উচ্চতায় এর গতিবেগ এসে দাঁড়ায় সেকেণ্ডে দু শ কুড়ি মিটার। প্যারাস্যুট এবং বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে সেই গতিবেগ মাটির কাছে কমিয়ে আনা হয় সেকেণ্ডে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি।

এই সঙ্গে আর একটি ব্যাপারেও সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে যথেষ্ট এগিয়ে যান। সেটা হল নভচরের শরীর বিষয়ক দিক। শূন্য-মাধ্যাকর্ষণ, শব্দহীণ পরিবেশ, স্বল্প পরিসরের মধ্যে হাজারো যন্ত্রপাতির সঙ্গে তাল রেখে কাজ করা, শরীরের দিক দিয়ে মোটেই তারা অনুকূল নয়। বিশেষ করে মহাকাশের পরিবেশে একটি মিষ্টি ঘুমকে পাওয়া বিরাট এক সমস্যা। যাঁরা প্লেনে পৃথিবীতেই এক জায়গা থেকে কোন দূর দেশে গিয়ে থাকেন এ অভিজ্ঞতা তাঁদেরও আছে। দিন রাত্রির সঙ্গে আমাদের দেহের জৈবিক ঘড়িটি যেন এক সূত্রে বাঁধা। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আমরা ঘুমই। আবার ভোরের আলো জাগার সঙ্গে আমরা জেগে উঠি। পৃথিরীর বুকে দিবা-রাত্রির সময় সব জায়গাতেই এক নয়। কলকাতায় যখন সকাল ইউরোপে তখন অন্ধকার। সেখানকার মানুষ তখন হয়ত মধ্যরাত্রির স্বপ্ন দেখছে। ধরুন সেখান থেকে কলকাতার স্থানীয় সময়ের ব্যবধান ছয় ঘণ্টা। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তাদের

সঙ্গে আমাদের ঘুম বা জেগে থাকার সময়ের পার্থক্যও ঐ ছয় ঘণ্টা। ফলে কলকাতা থেকে যদি আপনি হঠাৎ লণ্ডনে গিয়ে পড়েন তখন সেখানকার সময় মত ঘুমতে গিয়ে দেখবেন আপনার আর ঘুম আসছে না। স্থান পরিবর্তনের জন্যে এই যে অনিদ্রা এটা শুধু দেহের পক্ষেই নয়, মেজাজের পক্ষেও ক্ষতিকর।

নভচরের ক্ষেত্রে এটা সবচাইতে বড় সমস্যা। পৃথিবীর উর্দ্ধাকাশে প্রায় দু শ থেকে আট শ কিলোমিটার দূরে চলে গেলেই তার কাছে দিবারাত্রির কাব্যের শেষ। আলো এবং অন্ধকার দিয়ে দিন-রাত্রি গড়া, একথা সেখানে অর্থহীন। কখনও সেখানে, আলো, শুধু আলো। আলোয় ভুবন ভরা। অথচ পৃথিবীর ঘড়ি দেখে যখন সে ঘুমোয় ঠিক সেই সময়ে সেখানেও তাকে যদি ঘুম পাড়ান যায় তাহলে তার দেহ বা মনের সতেজভাব কমে না। অর্থাৎ পৃথিবীর ঘড়ি দেখে তার চিরাচরিত অভ্যেসমত সময়ে তাকে ঘুম পাড়াতে হবে অথবা জাগিয়ে রাখতে হবে।

সোভিয়েত দেশ টিটভের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে সাফল্যমণ্ডিত হন। পৃথিবী থেকে বেতার ব্যবস্থার সাহায্যে তাঁকে ঠিক সাড়ে সাত ঘণ্টা ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। পরে নিকোলায়েভের ক্ষেত্রেও তাঁর জৈবিক ঘড়ি যথাযথভাবে কাজ করে। অর্থাৎ পৃথিবীতে ঠিক যে সময়ে তিনি ঘুমোন মহাকাশযানেও সেই সময়ে তাঁর ঘুম আসে। এমন কি পৃথিবীর সময় ধরে তাঁর খিদে এবং তৃষ্ণাও। এতে করে মহাকাশে থাকা কালে নভচরের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে নি।

এ ধরনের বহু খুঁটিনাটি ব্যাপারের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গেল ভোস্খদ-১ মহাকাশ যানের অভিযাত্রী-দের ক্ষেত্রে।

মার্চ ১৮, ১৯৬৫ মহাকাশে উঠল ভোস্খদ-২। নভচর দুজন। পাভেল বেলিয়ায়িভ এবং আলেকসি লিওনভ। মহাকাশ অভিযানে

এটাও একটা নতুন রেকর্ড। মোট ছাব্বিশ ঘণ্টা দু মিনিটে এই দুই নভচর সতেরবার পৃথিবীকে বেষ্টন করে পরিক্রমণ করেন। আর তার সঙ্গে প্রথম মানুষ লিওনভ সরাসরি মহাকাশযানটির জানালা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে উন্মুক্ত মহাকাশে বিচরণ করেন।

মানুষের ইতিহাসে সে যেন চরমতম এক মুহূর্ত। অবিশ্বাস্য দুঃসাহসিক এক ঘটনা। একথা ঠিক, মহাশূন্যে বায়ুহীন পরিবেশে তাঁর দৈহিক ক্ষতির কোন কারণ ছিল না। ঐদিন মস্কো থেকে সেখানকার স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে এগরটায় 'তাস' এর খবরে বলা হয়, ভোস্খদ-২ এর দ্বিতীয়বার পৃথিবী পরিক্রমণের সময় লিওনভ বিশেষ চাপসহ মহাকাশ পোশাক পরে মহাকাশযান থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং যান থেকে পাঁচ মিটার দূরে থেকে ভেসে চলতে লাগলেন। প্রথম দু এক মিনিট তাঁর দেহের কিছুটা অংশ ভেতরে কিছুটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। পরের দশ মিনিট তিনি ভাসমান অবস্থাতেই থেকে যান। মোট কুড়ি মিনিট তাঁর দেহটি যানের বাইরে ছিল। টেলিভিশনে তাঁর গগন বিচরণ সোভিয়েত দেশের সর্বত্র দেখান হয়। এই পরীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল মহাকাশে বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশ সম্পর্কীত কিছু মৌলিক গবেষণা চালান এবং ঐ পরিবেশে প্রয়োজনে মহাকাশযান সারানর কাজ করার কৌশল রপ্ত করা। ভবিষ্যতে যখন মহাকাশ ষ্টেশন তৈরী করা হবে তখন এই কৌশল যথেষ্ট প্রয়োজনে আসবে। যাই হোক লিওনভের এই সাফল্য সেদিন সারা পৃথিবীতে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের আসন রীতিমত নমস্য করে তুলেছিল।

কিন্তু তারপরই আবার এক দীর্ঘ নীরবতা। যাকে বলে একেবারে রুশী নীরবতা। মহাকাশে এরপর দীর্ঘদিন তাঁরা আর কোন নভচরকে পাঠান নি। এমন কি চাঁদের দেশের উদ্দেশে কোন মানব আরোহীহীন যানও নয়। বরং বুধ, শুক্র এবং অন্যান্য

মহাজাগতিক বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণার ব্যাপারে তাঁরা মেতে ওঠেন। যেঁন চাঁদের ব্যাপারে তাঁদের কোন উৎসাহই নেই। তবে মাঝে শোনা গিয়েছিল ওঁরা নাকি সরাসরি চাঁদে মানুষ পাঠানর চেষ্টা করছেন। আবার কেউ কেউ ভাবছেন মহাকাশে মাঝে মাঝে ষ্টেশন তৈরি করে থেমে থেমে তাঁরা চাঁদের মাটিতে গিয়ে উপস্থিত হবেন। তবে সেবারে সঠিক কোন সংবাদ তাঁরা প্রচার করেন নি। বৈকানোর মহাকাশ ঘাঁটিতে তখন পাথরের নীরবতা বিরাজ করছে।

ঠিক এই সময়ে পুরনো ত্রুটি বিচ্যুতি অতিক্রম করে মহা সমারোহে সুরু হয়ে গেল জেমিনি প্রকল্পের কাজ।

জেমিনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ভাষায় এর বাংলা প্রতিশব্দ মিথুন রাশি। স্থূল অর্থ যুগল বা জোড়া। আসলে এটি একটি ভিন্ন নক্ষত্র জগত। কাস্তর এবং পল্যাকস তারই অন্তর্গত দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। পৃথিবী থেকে মনে হয় পাশাপাশি দুই যমজ কালের বিধানে এক অভিন্ন আত্মা হয়ে দূরের সেই নক্ষত্র জগতের মধ্যে বিচরণ করছে। এদেরই নাম জেমিনি। এদেরই নামে ঐ নক্ষত্র জগতের নামকরণ হয় জেমিনি।

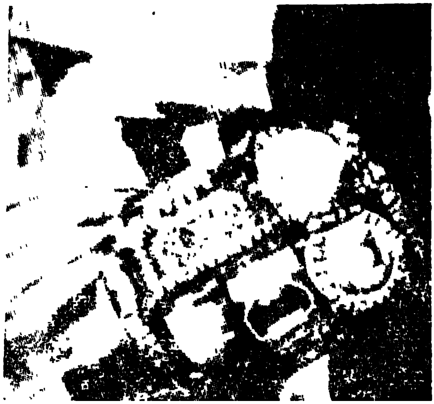
ন্যাশনাল এরোনটিকস অ্যাণ্ড স্পেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা সংক্ষেপে 'নাসা'ই প্রকল্পটির নাম রাখলেন জেমিনি। কারণ এবার থেকে নতুন এই মহাকাশযানের যাত্রী বিগত মার্কারির মত আর একজন থাকবেন না, থাকবেন দুজন। জেমিনির কক্ষে এঁরা পাশাপাশি ঐ যমজ নক্ষত্রের মতই বসে বিচরণ করবেন পৃথিবীর মহাকাশে। আকারে মার্কারির মত দেখতে হলেও এর নিচের অংশটিকে আরও দেড় ফুট চাওড়া করা হল। সেই অনুপাতে লম্বাও। ভেতরে পরিসরও বেড়ে গেল শতকরা পঞ্চাশ ভাগ। মার্কারিতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছিল নভচরের ক্যাবিনেই। এবার

তাদের রাখা হল পাশের ক্যাবিনে। এমন ভাবে তাদের সাজান হয় যাতে সহজেই নভচররা সেগুলিকে নিজেদের ইচ্ছে মত কাজে লাগাতে পারেন। উদ্দেশ্য, পৃথিবীর সংকেত ছাড়াও নভচরকে মহাকাশে তার নিজের বুদ্ধিমত কাজ করার মত কুশলী করে তোলা। প্রয়োজনে অন্য কোন রকম সাহায্য না নিয়েই যাতে নভচররা মহাকাশযানটির গতিবেগ এবং বিভিন্ন পরিচালন ব্যবস্থা চালিয়ে নিতে পারেন সে দিকটার দিকেও নজর রাখা হল।

এ ছাড়াও আরও নতুন কতকগুলি ব্যবস্থা এ যানগুলিতে কাজে লাগান হয়। এঁরা ঠিক করেন জেমিনিকে মহাকাশে পাঠানর পূর্ব মুহূর্তে একটি করে মানব আরোহীহীন মহাকাশযান পৃথিবীর চার-পাশের কক্ষ পথে স্থাপন করবেন। তারপর জেমিনিকে উৎক্ষেপ করা হবে ভিন্ন আর একটি কক্ষপথে। পরে নভচর এবং পৃথিবীর ওপরকার নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র থেকে যুগ্মভাবে চেষ্টা করে জেমিনিকে তার নিজস্ব পরিক্রমণ পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে মানব আরোহীহীন ঐ যানের পরিক্রমণ পথে। তখন কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে জেমিনি এবং ঐ যানটি একই কক্ষপথে পৃথিবীকে ঘিরে পরিক্রমণ করবে কৃত্রিম উপগ্রহের মত। দ্বিতীয় যানের নাম রাখা হল অ্যাজেনা। একই কক্ষ পথে এভাবে দুই বা ততোধিক যানকে স্থাপন করার মূল লক্ষ্য, অনুরূপভাবে চাঁদের চারপাশের কক্ষপথে দুটি যানকে স্থাপন করার চেষ্টা।

এ ছাড়াও পরস্পর দুটি যানকে মহাকাশে ভিড়িয়ে দেওয়া অথবা এক যান থেকে অপর যানে প্রবেশ, সেই সঙ্গে পাশাপাশি বা সামনা সামনি করে ভেড়ান যানকে সরিয়ে নিয়ে অন্য কোন লক্ষ্যের দিকে চলে যাওয়া, এসবের উপরও পরীক্ষা চালানর ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য, এই যানগুলিতে এই প্রথম বিশেষ এক ধরনের কমপ্যুটার বা যন্ত্রগণক ব্যবহার করা হয়। এই একটি যন্ত্রগণকই নিয়ন্ত্রণ করে

মহাকাশ চালনার গতিপথ, বেগ, ভিন্নযানের সঙ্গে মিলনের পদ্ধতি, নিরাপদে বায়ুস্তর ভেদ করে পৃথিবীর বুকে অবতরণ, এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উৎক্ষেপের সময় রকেটে কোন গোলমালের দরুন



জেমিনির সেই যন্ত্রগণক

যদি তাঁদের বিপদের আশঙ্কা থাকে অথবা পৃথিবীতে অবতরণ করার পর মহাকাশ কক্ষের মধ্যে যদি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন তাঁদের উদ্ধার করার জন্যে স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার সাহায্য নেয়া হয়েছিল। তেমন কোন ঘটনা ঘটলে যে আসনে তাঁরা বসে থাকবেন সেই আসনই তাঁদের ঝটিতে যানের বাইরে নিক্ষেপ করে দেবে এবং বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁরা আস্তে আস্তে নিরাপদ স্থানে অবতরণ করতে পারবেন।

আর ছিল বিভিন্ন ধরনের খাদ্য ব্যবস্থা, দীর্ঘ সময় মহাকাশে কাটালে নভচরের দৈহিক কোন অসুবিধে হয় কিনা সেটা দেখে নেওয়া, মহাকাশযানের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পরীক্ষা করে নেওয়া, মহাকাশের শূন্যের মধ্যে যানের বাইরে এসে অবাধ বিচরণ, প্রভৃতি। অর্থাৎ এক কথায় বলা চলে, জেমিনির মূল লক্ষ্য ছিল, চাঁদে যাবার উপযোগী করে মহাকাশযান তৈরি করার কৌশল

অর্জন, চাঁদে অবতরণ এবং নিরাপদে ফিরে আসার ব্যবস্থাটি রপ্ত করা এবং যাঁরা প্রথমদিকে চন্দ্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের উপযুক্তভাবে পারদর্শী করে তোলা। সেই সঙ্গে মহাকাশ-যানকে সুবিধে মত নিয়ন্ত্রিত করে অবতরণ করান।

এবার রকেট ব্যবস্থাতেও খানিকটা পরিবর্তন আনা হল। এর আগে মার্কারি উৎক্ষেপের জন্যে ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যাটলাস-ডি রকেট। এতে ছিল তিনটি ইঞ্জিন। উৎক্ষেপের সময় এই ইঞ্জিন তিনটি একসঙ্গে চালু করলে মোট ঘাত দাঁড়াত তিন লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাউণ্ড। এটাকে বলা হয় দেড় স্তরের রকেট। পাঁচ হাজার পাউণ্ড ভারী পর্যন্ত বস্তুকে ঠেলে তোলার ক্ষমতা এর ছিল। যা তিন হাজার পাউণ্ডের মার্কারিযানকে অনায়াসেই কক্ষ পথে স্থাপন কয়তে সমর্থ হয়। কিন্তু জেমিনির ন্যূনতম ওজন ছয় হাজার পাউণ্ড। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন কোন যানের ওজন আট হাজার পাউণ্ডেও গিয়ে দাঁড়াত। তাই এবার তাঁরা তৈরি করলেন আরও বড়, আরও শক্তিশালী রকেট। পুরো দু স্তরের রকেট টাইটান-২। আর তরল অক্সিজেনের পরিবর্তে জারক হিসেবে এতে ব্যবহার করা হয় নাইট্রোজেন টেট্রোকসাইড। কারণ তরল অক্সিজেনকে একই জায়গায় দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষিত রাখা কঠিন হয়। অথচ মূল জ্বালানি ডাই মিথাইল হাইড্রাজিনের পাশের কক্ষে নাইট্রোজেন টেট্রোকসাইডকে কোন রকম বিস্ফোরণের ঝক্কি না নিয়ে রেখে দেওয়া চলে।

নতুন এই জারকটিকে কাজে লাগানর পেছনে যুক্তিও ছিল। আগেই বলেছি, জেমিনি প্রকল্পের বিজ্ঞানীরা জেমিনি মহাকাশ-যানকে মানব আরোহীহীন মহাকাশযান অ্যাজেনার সঙ্গে মহাকাশে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। এটা খুব যে একটা সহজ কিছু ছিল তা বলা চলে না। ভেবে দেখুন, যে যানটির সঙ্গে মিলন ঘটান হবে তাকে আগে থেকেই পৃথিবীর চারপাশের একটি কক্ষপথে স্থাপন

করতে হবে। তখন একটি উপগ্রহের মত পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সে চলতে সুরু করবে। এদিকে পৃথিবীও প্রচণ্ড গতিবেগে ঘুরে চলেছে সূর্যের চারপাশে, সেই সঙ্গে নিজের অক্ষের চারপাশেও আবর্তন করছে। এর ফলে কোন উপগ্রহই পৃথিবীর চারপাশে একই দূরত্ব বজায় রেখে আবর্তন করতে পারে না। মার্কারির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল প্রতিবারই পরিক্রমণ করার সময় আগের পথ থেকে পরবর্তী পথে সে শত শত মাইল দূরে সরে এসেছে। অর্থাৎ আগের বারে মহাকাশের যে স্থানটিতে সে ঘুরছিল, পরের বারে যেহেতু পৃথিবী সেখানে অবস্থান করেনা, দূরে সরে যায়, সেও সেই সঙ্গে সরে গেছে।

অতএব অ্যাজেনাকে মহাকাশে তুলে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে জেমিনির উৎক্ষেপের অপেক্ষায়। তারপর উভয়ের গতিবিধির নিখুঁত হিসেব কষে জেমিনিকে ছুঁড়ে দিতে হবে অ্যাজেনার উদ্দেশে। অ্যাজেনা তখন বহুদূর থেকে হয়ত এগিয়ে আসছে তার নিজের কক্ষপথ ধরে। সবেগে। আর সেই মুহূর্তে জেমিনিও এগিয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যের মধ্যে এমন একটি অদৃশ্য বিন্দুর দিকে, যে বিন্দুতে অ্যাজেনা উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও গিয়ে মিলিত হবে তার কাছে। এর জন্য নিখুঁত গণনা চাই। চাই পরিপূর্ণ তৎপরতা। সময়ের সামান্যতম ত্রুটি হলে কেউ আর কারুর কাছে গিয়ে ভিড়তে পারবে না। তারা তখন মহাশূন্যের ভিন্ন পথে অজানা লক্ষ্যের মধ্যে হারিয়েও যেতে পারে।

তাই এমন জ্বালানি টাইটান-২ এ ব্যবহার করা হল যাতে ইচ্ছে মত মহাকাশযান উৎক্ষেপের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করতে পারেন। অন্ততঃ জ্বালানিকে তাড়াতাড়ি ব্যবহারের তাগিদে ব্যস্ত হয়ে উঠতে না হয়।

অতএব।

এপ্রিল ৮, ১৯৬৪। সুরু হল মার্কিন দেশের ঐতিহাসিক জেমিনি প্রকল্প। ঐদিন ওঁরা জেমিনি-১ মহাকাশযানকে উৎক্ষেপ করলেন। তাঁদের এই প্রথম প্রচেষ্টায় কোন নভচর অংশ গ্রহণ করেন নি। জেমিনি মহাকাশযানের কার্যকারিতা দেখে নেওয়াই ছিল এবারকার পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সেই সঙ্গে দেখে নেওয়া, উৎক্ষেপের সময় টাইটান-২ এর মত রকেট ঠিক মত কাজ করতে পারে কিনা। সুখের কথা মহাকাশে উঠে জেমিনি-১ যথানিয়ত প্রত্যেকটি দায়িত্ব পালন করেছে। দীর্ঘ চারদিন ধরে এটি পৃথিবীর চারপাশে আবর্তন করে এবং নিয়মিতভাবে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণাগারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। চারদিন পর এর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। যানটিকে অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কোন চেষ্টা ওঁরা আর করেন নি।

এর প্রায় নয় মাস পর ঐ একই রকম পরীক্ষা চালান হল। জানুয়ারী ১৯, ১৯৬৫ উৎক্ষেপ করা হল জেমিনি-২। এবারেও এতে কোন নভচর ছিল না। এই যানটি পুরোপুরি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে নি। উৎক্ষেপের পর এটি আতলানতিক মহাসাগরে সবেগে অবতরণ করে এবং সেখান থেকে এটিকে উদ্ধার করা হয়। এবারকার পরীক্ষার মূল লক্ষ্য ছিল পৃথিবীতে অবতরণ করার সময় বাতাসের সঙ্গে ঘষর্ণের ফলে যে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হয়, জেমিনি ক্যাপস্যুলের ডগায় লাগান তাপ-সহ আবরণ তা সহ্য করতে পারে কিনা তা দেখে নেওয়া। এতে তাঁরা সফল হলেন।

মার্চ ২৩, ১৯৬৫। জেমিনি-৩। এই প্রথম দু জন মার্কিন নভচর একসঙ্গে জেমিনি মহাকাশযানের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে মহাকাশে উঠলেন। মূল পরিচালক ভার্জিল আই গ্রিসম এবং চালক জন ডব্লু ইয়ং। চার ঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিটে এঁরা মোট তিনবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করেন। ঊর্দ্ধাকাশে ওঠার কিছু পরই গ্রিসম

নিজেই তাঁর মহাকাশযানটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্বহস্তে কাজ চালিয়ে প্রথমে একটি উপবৃত্তীয় পথ থেকে প্রায়-বৃত্তীয় কক্ষপথে এটিকে স্থাপন করা হয়। এর জন্যে তিনি ঘাত সৃষ্টি করার মত একটি ছোট রকেট ব্যবহার করেছিলেন। এই সময়ে মাঝে মাঝে মহাকাশযানটিকে, রাস্তায় কোন মোটর চালক যেমন সামনের কোন গাড়ীর ডান বা বাঁ পাশে সরে গিয়ে পাশ কাটিয়ে নিয়ে চলেন, ঠিক তেমনি ভাবে মূল পরিক্রমণ পথ থেকে উভয় পাশে কিছুটা দূরত্ব পর্যন্ত সরিয়ে নিয়ে পাশ কাটাতেও সমর্থ হন গ্রিসম। এ ছাড়া প্রাণীকোষের উপর 'ভারহীনতার কি ধরনের প্রভাব তারও ওপর পরীক্ষা চালান হয়েছিল। এর জন্যে তাঁরা সঙ্গে নিয়ে যান সমুদ্র-শজারু নামে এক ধরনের জলজ প্রাণীর শুক্র-কোষ এবং ডিম্ব কোষ। পৃথিবী পরিক্রমণের সময় কৃত্রিম উপায়ে ঐ উভয় কোষকে মিলিয়ে গর্ভধান করার চেষ্টা করেন। দেখা গেছে পৃথিবীতে যতটা সময়ে বা যে ভাবে এই কাজটি হয়ে থাকে, এখানেও অনুরূপ ভাবেই সেটি সংঘটিত হয়েছে। এ ছাড়া মানুষের রক্তের শ্বেত কণিকার উপর ভারহীনতা এবং বিভিন্ন বিকিরণ কতটা প্রভাব বিস্তার করে তারও ওপর পরীক্ষা চালান হয়েছিল। অবশেষে যথেষ্ট নিরাপদে এবং আগের চেয়েও সহজে এই মহাকাশযানটিকে পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনা হয়।

জুন ৩, ১৯৬৫। জেমিনি-৪। এই মহাকাশযানটির পরিচালনার দায়িত্ব ছিল জেমস এ. ম্যাকডিভিট-এর উপর। সহকারী এডোয়ার্ড এইচ. হোয়াইট। যানটি সাতানব্বই ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিটে বাষট্টিবার পৃথিবীর চারপাশ পরিক্রমণ করে আগেরই মত পৃথিবীর বুকে অবতরণ করে। এবারকার অভিযানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মূল যানটির বাইরে বেরিয়ে এসে হোয়াইটের একুশ মিনিট ধরে মহাকাশে সাঁতার কেটে বেড়ান। একটি নাইলনের দড়ি দিয়ে তাঁর দেহটি মহাকাশ-

যানের সঙ্গে আটকান ছিল। সাঁতার কাটার সময় এই প্রথম তিনি রকেটের মত ছোট্ট একটি যন্ত্র ব্যবহার করেন। যন্ত্রটি টর্চের মত। বোতামে চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর জ্বালানি পুড়তে সুরু করে এবং জেটের মত ধাক্কা মেরে তাঁকে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াতে সাহায্য করে। ভারহীন পরিবেশে শূন্যে বিচরণ করার এই কৌশলটির উপর এই প্রথম পরীক্ষা চালালেন হোয়াইট।

আগস্ট ২১, ১৯৬৫। জেমিনি-৫। এবারকার অভিযানের নভচর এল. গর্ডন কুপার এবং চার্লস কনরাড। দীর্ঘ সাতদিন বাইশ ঘণ্টা ছাপ্পান্ন মিনিটে এক শ কুড়িবার ভূ-প্রদক্ষিণ করে এই প্রথম মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে তাঁরা রেকর্ড সৃষ্টি করে বসলেন। দীর্ঘ সময় ভারহীন পরিবেশে বাস করলে মানুষের দেহের এবং মনের অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে এবং কি ভাবে চলাফেরা করলে স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা মহাকাশের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও জটিল যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতে অথবা বিভিন্ন গবেষণা করতে সক্ষম হতে পারেন এবারকার অভিযানে সে সম্পর্কে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। জেমিনি প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক উদ্দেশ্যই সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে নভচররা ফিরে এলেন আগস্ট ২৯ তারিখে।

ডিসেম্বর ৪, ১৯৬৫। এইদিন জেমিনি-৭ কে উৎক্ষেপ করা হয় দু জন ঝানু নভচর ফ্রাঙ্ক বোরম্যান এবং জেমস লোভেলকে মূল সারথী করে। এবার আরও দীর্ঘযাত্রা। এর আগে কেপ কেনেডির উনিশ নম্বর উৎক্ষেপ মঞ্চ থেকে অক্টোবর মাসে জেমিনি-৬ কে মহাকাশে পাঠানর কথা ছিল। ঠিক হয় ঐ সময় প্রথমে একটি মানব আরোহী-হীন অ্যাজেনা মহাকাশযানকে সুদূর কোন কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। পরে জেমিনি-৬ গিয়ে মিলিত হবে তার সঙ্গে। কিন্তু যান্ত্রিক গোলযোগ বশতঃ অ্যাজেনাকে সময় মত উৎক্ষেপ করা সম্ভব হল না।

সঙ্গে সঙ্গে কার্যসূচীর কিছু পরিবর্তন করে নিলেন 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা। ঠিক করলেন, এই ত্রুটির জন্যে মোটেই তাঁরা পরবর্তী পরীক্ষাগুলির সময়সূচীর পরিবর্তন করবেন না। তাই উৎক্ষেপ-মঞ্চ থেকে তাড়াতাড়ি জেমিনি-৬কে সরিয়ে স্থাপন করলেন জেমিনি-৭। ঠিক হল জেমিনি-৭ উৎক্ষেপ করার পর পরই আগামী নয় দিনের মধ্যে তাঁরা জেমিনি-৬কেও মহাকাশে পাঠাবেন এবং উভয় মহাকাশযানকে একই কক্ষপথে স্থাপন করার চেষ্টা করবেন। দীর্ঘ এই বিচরণের সময় বোরম্যান এবং লোভেলের শারীরিক অবস্থাকে অটুট রাখার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। শরীরের রক্ত চালনার জন্যে তাঁদের মহাকাশযানের কক্ষের মধ্যে নিয়মিত ব্যায়াম করার ব্যবস্থা করা হয়। পরে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল দীর্ঘকাল ভারহীন পরিবেশে থাকার দরুন তাঁদের দেহে ক্যালসিয়াম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ কতটা কমে গেছে। এর জন্যে তাঁদের পায়ের গোড়ালি এবং আঙ্গুলের হাড়ের একস-রে ছবি তোলা হয়।

হঠাৎ এই ব্যাপারটার উপর দৃষ্টি পড়েছিল চিকিৎসকদের। ওঁরা লক্ষ্য করেন এর আগে যে সমস্ত নভচর দীর্ঘ সময় ভারহীন পরিবেশে কাটিয়ে ফিরে এসেছিলেন তাঁদের দেহের খনিজ পদার্থের পরিমাণ অনেকটা কমে গিয়েছে। দীর্ঘকাল রোগে শয্যাশায়ী থাকলে যেমন হয়, ঠিক তেমন। সম্ভবতঃ ভারহীনতার সঙ্গে দেহকে খাপ খাইয়ে নিতে গিয়েই এমনটি হয়েছিল। তাই এই পরীক্ষার আয়োজন। এ ছাড়াও ঐ একই কারণ অনুসন্ধানের জন্যে তাঁদের প্রস্রাবও পরীক্ষা করা হয়। সেই সঙ্গে রক্ত এবং রক্তের মধ্যেকার অ্যাড্রেনালিন, এপিনেফ্রিন এবং নোরপিনেফ্রিন হরমোন। মহাকাশে প্রচণ্ড মানসিক চাপ এবং দৈহিক প্রতিকূলতার মধ্যে বোরম্যান এবং লোভেলের দেহে কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা জানাই ছিল এই হরমোনগুলি পরীক্ষা করার অন্যতম কারণ।

এবারকার অভিযানে নভচরদের পোশাক ছিল যথেষ্ট হাল্কা। তিনদিন মহাকাশে বিচরণ করার পর যখন তাঁরা দেখলেন তাঁদের কক্ষের মধ্যেকার বায়ুচাপ স্বাভাবিক এবং সাম্য অবস্থায় এসে গেছে তখন সেই পোশাকও তাঁরা খুলে ফেলেন। পরিবর্তে তাঁরা পরেন লম্বা-পা-ওয়ালা অন্তর্বাস। অর্থাৎ এক কথায় মহাকাশযানের প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও তাঁদের জীবনযাত্রা আরও সহজতর করে তোলা হল।

শুধু এই নয়। এই প্রথম নভচররা পৃথিবীর সঙ্গে কথা বললেন ল্যাজারের সাহায্যে। এই ব্যবস্থায় সাধারণ আলোক রশ্মিকে বিশুদ্ধ এবং জোরাল করে বেতার তরঙ্গের সাহায্যে যেমন কণ্ঠস্বর আদান প্রদান করা হয় ঠিক অনুরূপভাবে তাঁদের কণ্ঠস্বর প্রেরণ করেন তাঁরা।

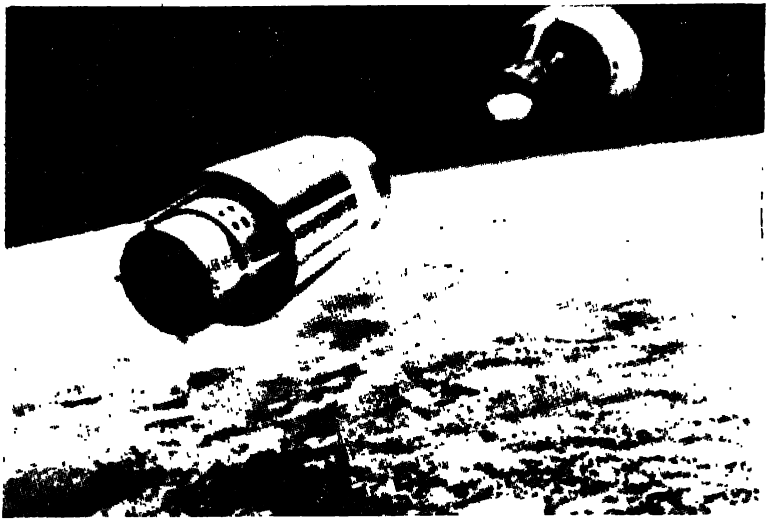
ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হল প্রায় বারোদিন। এখনও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাটি বাকি। প্রস্তুত হয়ে নিলেন বোরম্যান এবং লোভেল। তখনও বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছেন তাঁরা। ডিসেম্বর ১৫। পৃথিবী থেকে খবর গেল জেমিনি-৬ এইমাত্র কেপ কেনেডির উনিশ নম্বর উৎক্ষেপ-মঞ্চ ত্যাগ করে তাঁদের দিকে যাত্রা করেছে। এতে রয়েছেন নভচর ওয়ালটার শিরা এবং টমাস স্ট্যাফোর্ড। হ্যাঁ, ওঁরা যা চেয়েছিলেন সেটাও সম্পন্ন হয়ে গেল। উৎক্ষেপের মাত্র পাঁচঘণ্টা সাতচল্লিশ মিনিট পর যে পথ ধরে ভেসে চলেছিল জেমিনি-৭ সেই একই পথে এসে মিলিত হল জেমিনি-৬। এই প্রথম নভচররা নিজেদের চেষ্টায় দুটি মহাকাশযান একই কক্ষপথে চালিত করতে সমর্থ হলেন। এর পরদিন অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৬ জেমিনি-৬কে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। জেমিনি-৭ পৃথিবীতে অবতরণ করে ডিসেম্বর ১৮।

মার্চ ১৬, ১৯৬৬। জেমিনি-৮। অধিনায়ক নীল আরমস্ট্রং।

সহকারী ডেভিড স্কট। এবার 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা যথেষ্ট সতর্ক। তাই মূল মহাকাশযানটির উৎক্ষেপের কাঁটায় কাঁটায় এক শ মিনিট আগে তাঁরা আকাশে পাঠালেন অ্যাজেনাকে। তারপর তোলা হল জেমিনি-৮। পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করতে করতে ক্রমেই এটি সরে যেতে লাগল অ্যাজেনার পরিক্রমণপথের দিকে। ঠিক পাঁচবার পরিক্রমণ করা যখন শেষ হয়ে গেছে তখন অ্যাজেনার ঠিক কাছে এসে দাঁড়াল জেমিনি-৮। আর পরক্ষণেই সেটি ভিড়ে গেল অ্যাজেনার একেবারে গা ঘেঁষে। এই পরীক্ষায় আরমস্ট্রং নিজের চেষ্টাকে অবলম্বন করেই এমন দুঃসাধ্য কাজটি সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। এমন কি অ্যাজেনার সঙ্গে বৈদ্যুতিক সংযোগও স্থাপন করেন তিনি। তবে হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি লেগে জেমিনির নিজস্ব বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় কিছুটা গোলযোগ দেখা দেওয়ায় মাত্র সাড়ে ছ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে জেমিনি-৮ ফিরে আসে। এরপর জুন ৩, ১৯৬৬ টমাস পি, স্ট্যাফোর্ড এবং ইউজেন সারনান জেমিনি-৯ এ অনুরূপ পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন। তবে ব্যর্থ হন। সারনান এবার মহাকাশে দু ঘণ্টার কিছু বেশি সময় ভেসে বেড়িয়েছিলেন।

কিন্তু সবচাইতে চমকপ্রদ পরীক্ষা করলেন জেমিনি-১০ এর নভচর। জুলাই ১৮, ১৯৬৬। অধিনায়ক জন ডাব্লু. ইয়ং এবং সহকারী মাইকেল কলিনস ঐ দিন তাঁদের মহাকাশযানটি নিয়ে পৃথিবী থেকে এই প্রথম সবচাইতে দূরবর্তী কক্ষপথে পরিক্রমণ করতে সুরু করলেন। দূরত্ব প্রায় চার শ ছিয়াত্তর মাইল। শুধু এই নয়। পরপর দু বার দুটি মানব আরোহীহীন যানের সঙ্গে নিজেদের রথটিকে ভিড়িয়ে দিতেও সমর্থ হন। প্রথমে তাঁরা তাঁদের যাত্রার একশ মিনিট পূর্বে উৎক্ষেপ করা একটি অ্যাজেনাযানের সঙ্গে নিজেদের যানটিকে জুড়ে দেন। তারপর জেমিনি-১০ এর মধ্যে সংরক্ষিত জ্বালানি বাঁচানর জন্যে অ্যাজেনার জ্বালানি খরচ করতে সুরু করেন।

অ্যাজেনা তার জ্বালানি পুড়িয়ে যে ঘাত সৃষ্টি করে তারই সাহায্যে জোড়বাঁধা দুটি যান তখন মহাকাশের আরও দূরবর্তী অঞ্চলে সরে যায়। এখানে তাঁরা এই অ্যাজেনা থেকে নিজেদের যানটিকে পৃথক



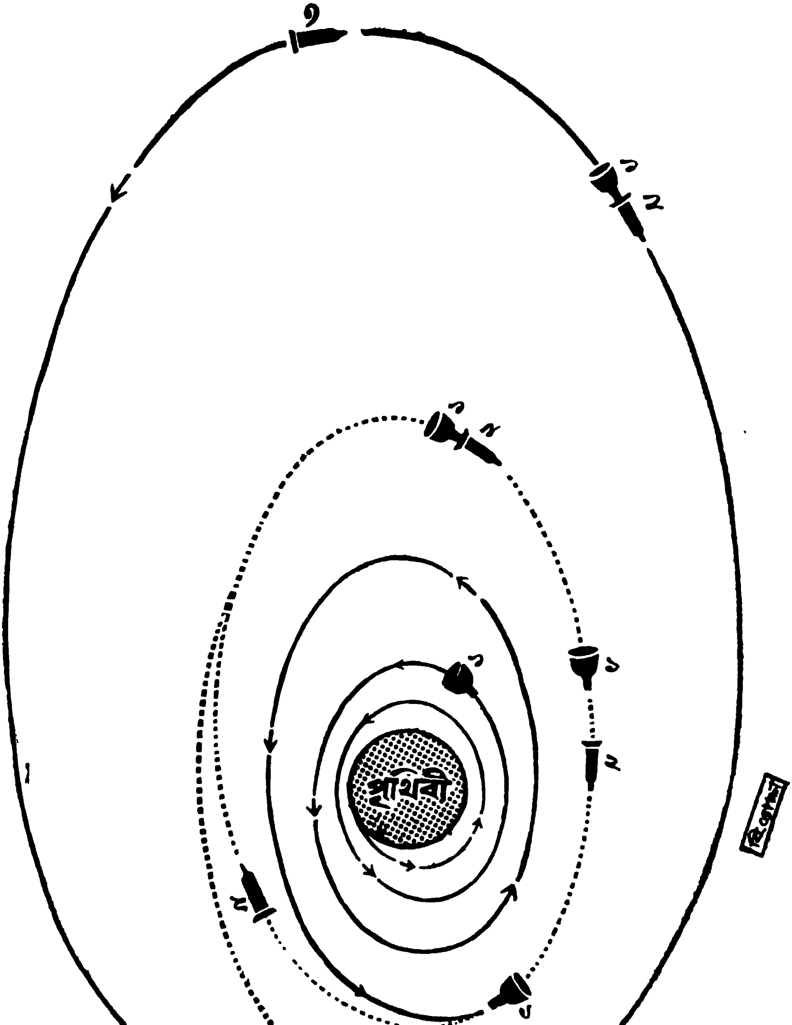
মহাকাশে একই কক্ষপথে জেমিনি এবং অ্যাজেনা জোড় বাঁধতে চলেছে

করে নেন এবং চারমাস আগে জেমিনি-৮ মহাকাশে যে অ্যাজেনাটিকে পরিক্রমণরত অবস্থায় ফেলে রেখে এসেছিল তার সঙ্গে আবার জোড় বাঁধেন। জোড় বাঁধার কিছু পূর্বে যখন অ্যাজেনাটি মাত্র কয়েক ফুট দূরত্ব রেখে এগিয়ে যাচ্ছিল, কলিনস তখন জেমিনি থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং প্রায় তিরিশ মিনিট মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় বিচরণ করেন। ঐ সময় একটি যন্ত্রের সাহায্যে দীর্ঘ এই চারমাস ধরে অ্যাজেনাটির গায়ে যে মহাকাশ ভস্ম জমে উঠেছিল, পরীক্ষার জন্যে তার কিছুটা সংগ্রহ করে নেন। ২১ জুলাই জেমিনি-১০ নিরাপদে অবতরণ করে। মহাকাশে এক কক্ষ পথ ছেড়ে অপর কক্ষ পথে গিয়ে এ ভাবে কাজ করার ইতিহাস এই প্রথম।

সেপ্টেম্বর ১২, ১৯৬৬। জেমিনি-১১! এবার আরও একটি রেকর্ড স্থাপন করলেন নভচর চার্লস কনরাড এবং রিচার্ড এফ. গর্ডন। এর আগে মহাকাশে পরিক্রমণরত অ্যাজেনার সঙ্গে ভেড়ার আগে জেমিনিকে কয়েকবার পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করাতে হয়েছিল। ব্যাপারটা করা হয় এই ভাবে।

ধরুন পৃথিবী থেকে একটি অ্যাজেনা মহাকাশযানকে পাঠান হল ছু শ মাইল দূরের কোন কক্ষপথে। অর্থাৎ অ্যাজেনা তখন পৃথিবীর চারপাশে ছু শ মাইল দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরতে লাগল। এবার তোলা হল জেমিনিকে মহাকাশে। জেমিনি আকাশে উঠেই প্রথমবার পাক খেয়ে ঘুরে নিল যেন একশ মাইল ঊর্দ্ধাকাশে থেকে। পরের বারে যখন পৃথিবীকে সে পরিক্রমণ করল তখন তার দূরত্ব গিয়ে দাঁড়াল হয়ত একশ ত্রিশ মাইল। তৃতীয় বার পাক খাবার পর এক শ পঞ্চাশ। অর্থাৎ প্রতিবার পরিক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তার কক্ষপথ বিস্তৃত হতে লাগল। সে সরে যেতে লাগল অ্যাজেনার কক্ষপথের দিকে। এবং অবশেষে তারও যখন কক্ষপথের দূরত্ব ছু শ মাইলে গিয়ে দাঁড়াল তখন সেও অ্যাজেনারই কক্ষপথ ধরে ভেসে বেড়াতে সুরু করল। এরই নাম কক্ষপথে মিলন। মিলনের পর রকেটের অতিরিক্ত ঘাতে জেমিনি এগিয়ে এসে ভিড়ে যায় অ্যাজেনার গা ঘেঁষে। এই ভাবেই আগের নভচররা কাজ করেছেন। এর জন্যে জ্বালানির প্রয়োজন হয় বেশি।

কিন্তু এবারকার পরীক্ষায় অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটিয়ে বসলেন জেমিনি-১১ র নভচররা। পৃথিবীর চারপাশে পুরোপুরি একটি পাক খাবার আগেই তাঁরা তাঁদের যানটিকে ভিড়িয়ে দিলেন মহাকাশে পরিক্রমণরত একটি অ্যাজেনার সঙ্গে। মহাকাশ গবেষণায় এ কৃতিত্বও মার্কিন নভচররা প্রথম অর্জন করলেন। আর অত্যন্ত জটিল এই কাজটি সারতে, পৃথিবীতে অবস্থিত নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের খুব কম সাহায্যই



জেমিনি-১০ প্রথমে গিয়ে ভিড়ল ২ চিহ্নিত অ্যাজেনার সঙ্গে। পরে অ্যাজেনার ঘাতের সাহায্য নিয়ে দ্বিতীয়বার গিয়ে ভিড়ল জেমিনি ৮ এর ফেলে আসা ২ চিহ্নিত অ্যাজেনার সঙ্গে

তাঁরা নিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টা এবং কিছুটা রেডার এবং যন্ত্রগণকের সাহায্যে এই দুঃসাধ্য কাজটি তাঁরা সম্পন্ন করেন।

অ্যাজেনার সঙ্গে ভেড়ার পর আগের মত এবারেও নভচররা অ্যাজেনার জ্বালানি ব্যবহার করে তারই ঘাতের সাহায্যে পৃথিবী থেকে আট শ পঞ্চাশ মাইল দূরের এক কক্ষ পথে চলে যান। এই প্রথম পৃথিবীর দুই মানুষ মহাকাশে এত দূরে যেতে সমর্থ হলেন। ঠিক হয় গর্ডন দুই ঘণ্টা ধরে এই কক্ষপথে মহাকাশে বিচরণ করবেন। কিন্তু মাত্র চুয়াল্লিশ মিনিট বিচরণ করার পর তিনি অসুস্থ হয়ে ওঠেন। প্রচণ্ডভাবে ঘামতে থাকেন তিনি। দু চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। মহাকাশ পোশাকের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নষ্ট হওয়ার মত অবস্থা দাঁড়ায়। ফলে গর্ডনকে যানের মধ্যে ফিরে আসতে হয়। তবে তার আগে তিনি এক শ ফুট লম্বা ডেকরনের একটি দড়ি দিয়ে জেমিনির সঙ্গে অ্যাজেনাকে বেঁধে ফেলেন। তারপর নিজেদের যানের দরজাটি বন্ধ করে তাঁরা দেখান চলমান দুটি বস্তু কিভাবে পরিক্রমণ পথে সাম্য অবস্থায় থাকতে পারে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেন জেমিনি-১১র নভচররা। বিশেষ ধরনের রকেটের সাহায্যে ঘাত সৃষ্টি করে কোন চাকা যেমন তার অক্ষের চারপাশে ঘোরে ঠিক তেমনি ভাবে জেমিনিকেও ঘোরাতে সুরু করেন। মহাকাশে আবর্তনগতি সৃষ্টি করে মহাকাশযানের ভারহীন পরিবেশে এই প্রথম কৃত্রিম উপায়ে অভিকর্ষ বল তৈরি করা হল। পরিমাণ পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের তিনের কুড়ি হাজার ভাগের এক ভাগের সমান। অর্থাৎ খুবই কম। তবু নিঃসন্দেহে এটি এক বিরাট সাফল্য। উল্লেখ্য, জেমিনি-১১ যে পদ্ধতিতে মহাকাশে পরিক্রমণরত অ্যাজেনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে অ্যাপলো-১১র চন্দ্রযাত্রার ক্ষেত্রে চাঁদের ভেলাও অনুরূপভাবে চাঁদের কক্ষে পরিক্রমণরত কলামবিয়ার সঙ্গে এসে মিলিত হয়। জেমিনি-১১

চুয়াল্লিশবার ভূ-প্রদক্ষিণ করার পর ডিসেম্বর ১৫ পৃথিবীতে অবতরণ করে।

অবশেষে এল জেমিনি পর্বের সমাপ্তি। শেষ জেমিনি জেমিনি-১২কে পাঠান হল নভেম্বর ১১, ১৯৬৬। এবারকার অধিনায়ক জেমস লোভেল। সহকারী এডুইন অলডরিন। জেমিনি-১২র উৎক্ষেপের পূর্বে যথারীতি অ্যাজেনাকে মহাকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী জেমিনি-১২ তার সঙ্গে গিয়ে ভেড়ে মিলিত ভাবে, পৃথিবীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করার পর। এর কিছু পরই অলডরিন মহাকাশযানের দরজাটি খুলে শরীরের অর্ধেক বাইরে বের করে বসে থাকেন প্রায় দু ঘণ্টা উনত্রিশ মিনিট। এই সময় তিনি অনেকগুলি মূল্যবান ছবি তোলেন। এদের মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ছবি হল পূর্ণগ্রাস সূর্য গ্রহণের। পৃথিবীর একশ পঁচাশি মাইল উর্দ্ধাকাশ থেকে সূর্যগ্রহণের ছবি তোলা এই প্রথম। এ ছাড়াও আরও বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জ, পৃথিবী এবং চাঁদের অন্তর্বর্তী মহাকাশে ভাসমান ধূলিকণা, মহাকাশের দিগন্ত বরাবর বিচিত্র আভা, এমন আরও অনেক কিছুরই ছবি তোলেন অলডরিন যা মহাকাশ এবং জ্যোতির্মণ্ডল সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনে বিজ্ঞানীদের সাহায্য করেছে।

এই সময় অ্যালজেরিয়া থেকে ফরাসী বিজ্ঞানীরা উর্দ্ধাকাশে একটি সেণ্টাউর রকেট উৎক্ষেপ করেছিলেন। এই রকেটটি আকাশে উঠেই সোডিয়াম বাষ্পের বিরাট একটি মেঘ সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর আবহাওয়া বিষয়ক গবেষণার জন্যে ফরাসী বিজ্ঞানীরা এ ধরনের পরীক্ষায় হাত দেন। মহাকাশে জেমিনি-১২র বাইরে গলা বাড়িয়ে উজ্জ্বল গোলাপী আভার সেই মেঘপুঞ্জও দেখেছিলেন অলডরিন, তার ছবিও তিনি তোলেন।

পরদিন অর্থাৎ নভেম্বর ১৩ অলডরিন পরীক্ষা করে দেখলেন মহা-

শূন্যে দীর্ঘ সময় ভেসে বেড়ানর সময় আগের অভিযাত্রীরা কেন অত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এরজন্যে আবার তিনি যানটির বাইরে বেরিয়ে এসে প্রথমে জেমিনির সঙ্গে আগের মত একশ ফুট লম্বা একটি ডেকরনের দড়ি আটকে নেন এবং জেমিনি-১১র মত ঐ ধরনের পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করেন। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে বিশ্রামের সাহায্যে ক্লান্তি দূর করে যানটির বাইরে বল্টু লাগানর কাজ, কোন গর্ত থেকে কোন বস্তুকে প্লাগের মত উপড়ে খোলা অথবা লাগান এমন অনেক কিছুই করলেন অলডরিন। ফিরে আসার দিন অর্থাৎ নভেম্বর ১৪, শেষ বারের মত আবার দরজার বাইরে প্রায় পঞ্চান্ন মিনিটের মত মুখ বের করে ছবি তুললেন। এই নিয়ে মহাকাশযানের বইরে ছিলেন তিনি প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। এই অভিযানে চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং মহাকাশ পরিচালনার ব্যাপারেও যথেষ্ট কাজ করা হয়েছিল।

নভেম্বর ১৪ জেমিনির নভচররা মহাকাশযাত্রার জটিলতম সমস্যাগুলি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে ফিরে এলেন। রীতিমত নিশ্চিত হয়ে। 'নাসা'র বিজ্ঞানীরা এর পরমুহূর্তে তাঁদের সমস্ত গবেষণার ফলাফল দেখে বুঝলেন ১৯৬৯এ চাঁদে মানুষ পাঠানর ব্যাপারে এ পর্যন্ত যে তোড়জোড় তাঁরা করে এসেছেন তা কখনই ব্যর্থ হবে না। অতএব মা ভৈঃ। এবার লক্ষ্য অ্যাপলো!

মার্কিন দেশের এই সাফল্যের অনতিকাল পরই সোভিয়েত দেশ আবার মহাকাশে নভচর পাঠাতে সুরু করেন। এবার যে যান তাঁরা ব্যাবহার করেন তার নাম সোয়ুজ। ভোস্খদের তুলনায় নতুন এই মহাকাশযান শুধু যে আয়তনেই বড় তা নয় যন্ত্রপাতি এবং বিভিন্ন কলাকৌশলে আরও অনেক বেশি উন্নত ধরনের ছিল এপ্রিল ১২, ১৯৬৭ সোয়ুজ-১ এ চড়ে মহাকাশে উঠলেন

ভ্লাদিমির কমোরভ। ঠিক কি ধরনের পরীক্ষার জন্যে এ যানটি পাঠান হয়েছিল সোভিয়েত দেশ সে কথা স্পষ্ট করে প্রচার করেন নি। দুর্ভাগ্যবশতঃ পৃথিবীতে অবতরণ করার সময় বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এই মহাকাশযানটিতে আগুন ধরে যায় এবং আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় সোভিয়েত দেশের অন্যতম বীর কমোরভ নিহত হন। অক্টোবর ২৬, ১৯৬৮ উৎক্ষেপ করা হয় সোয়ুজ-৩। এতেও ছিলেন একজন নভচর, বেরেগোভয়। ইনি মহাকাশে চারদিন বিচরণ করেন এবং এই সময়ে মহাকাশে মানব আরোহীহীন যান সোয়ুজ-২ এর সঙ্গে তাঁর যানটি ভিড়িয়ে দিতে সমর্থ হন।

আর এর পরই জানুয়ারী ১৪ এবং ১৫, ১৯৬৯ পর পর দুদিনে সোয়ুজ-৪ এবং ৫ কে মহাকাশে পাঠিয়ে নতুন রেকর্ড তৈরি করলেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা।

'তাস' সংবাদ প্রতিষ্ঠান থেকে জানান হয়, জানুয়ারী ১৪ মস্কো সময় সকাল দশটা বেজে উনচল্লিশ মিনিটে সোয়ুজ-৪ কে মহাকাশে পাঠান হল। এর নভচর লেফটেনাণ্ট কলোনাল ভ্লাদিমির আলেকজান্দ্রোভিচ সাটালভ। মহাকাশে উঠে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে বিচরণ করার সময় ইনি নিজের চেষ্টায় যানটিকে ঘুরিয়ে এমন ভাবে স্থাপন করেন যাতে যানটির সৌর কোষ নিয়মিত ভাবে সৌরশক্তির দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি সংগ্রহ করতে পারে। এ ছাড়াও কতকগুলি শরীরতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণাও চালান সাটালভ। পরদিন অর্থাৎ জানুয়ারী ১৫ সকাল দশটা বেজে চোদ্দ মিনিটে পাঠান হল সোয়ুজ-৫ কে। নভচর বোরিস ভলিনভ, আলেকসি ইলিসিয়েভ এবং ইভজেনি খ্রুনভ। মহাকাশে উঠে এই যানটি সোয়ুজ-৪ এর কাছ বরাবর থেকে পৃথিবী পরিক্রমণ করতে সুরু করে। জানুয়ারী ১৬ দুইটি যানকে পাশাপাশি ভিড়িয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। মহাকাশ-চারীরা এরপর উভয় যানের মোট চারটি ক্যাবিনের মধ্যে টেলিফোন

সংযোগ স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন ক্যাবিনের মধ্যে যাতায়াত করেন। মহাকাশ ইতিহাসে এই প্রথম তৈরি হল মহাকাশ ষ্টেশন। অবারিত হয়ে এই ষ্টেশনে অবস্থান করে নভচররা দূরাকাশের ছবি তোলেন। এবং সেই সঙ্গে পৃথিবীর আবহাওয়া বিষয়ক কিছু গবেষণারও। ঐ দিন উভয় যান যখন মিলিতভাবে পৃথিবীর চারপাশে তাদের পঁয়ত্রিশতম পরিক্রমণ শেষ করছিল তখন সোয়ুজ-৫ এর দুজন নভচর খ্রুনভ এবং ইলিসিয়েভ মহাকাশ পোশাক পরে বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং আরও কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালান। তাঁরা সকলেই নতুন এই মহাকাশ ষ্টেশনের খুঁটিনাটি সুবিধে অসুবিধে পরীক্ষা করে দেখেন। অয়নমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে বেতার তরঙ্গ যাবার সময় কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেটাও বাজিয়ে দেখেন তাঁরা। সোয়ুজ-৫ এর নভচর এই সময়ে তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা চিঠি, টেলিগ্রাম এবং খবরের কাগজ উপহার দেন সাটালভকে। তারপর খ্রুনভ এবং ইলিসিয়েভ সোয়ুজ-৪ এর মধ্যে প্রবেশ করে সাটালভের পাশের দুটি আসন গ্রহণ করেন। এক যান থেকে আর এক যানে এইভাবে আশ্রয় নেওয়ার নজির এই প্রথম। অবশেষে এই তিন নভচরকে নিয়ে জানুয়ারী ১৭ সোয়ুজ-৪ মস্কো সময় সকাল ৯টা বেজে তিপ্পান্ন মিনিটে নিরাপদে কারাগাণ্ডার চল্লিশ কিলোমিটার দূরে কাজাখস্তানে এসে অবতরণ করে। সোয়ুজ-৫ এর নভচর ভলিনভ এরপর নিঃসঙ্গ মহাকাশ জীবন যাপন করে পরদিন জানুয়ারী ১৮, মস্কো সময় দুপুর এগারটায় কুস্তানাই এর দু শ কিলোমিটার দূরে একটি স্থানে অবতরণ করেন।

অর্থাৎ মানুষের দূর মহাকাশে বিচরণের ব্যাপারে সোভিয়েত দেশ যে এরই মধ্যে যথেষ্ট এগিয়ে এসেছেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বোঝা গেল তাঁরাও বড় বড় এবং যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য যান তৈরি করে ফেলেছেন। সেইসঙ্গে আরও উন্নত এবং সহজ পদ্ধতিতে আরোহী

এবং আরোহীহীন মহাকাশযানের মধ্যে মিলন ঘটানর ক্ষমতাও অর্জন করেছেন।

আর এই সময় দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করলেন তাঁদের চন্দ্রযাত্রার সঠিক দিনক্ষণ। সোভিয়েত দেশ নীরব। একদিকে অ্যাপলো নিয়ে যখন পৃথিবী মুখরিত, আর এক দিকে তখন নিস্পন্দভাব।

সাধারণ মানুষের মনে তখন লক্ষ কল্কনার ভিড়। তাঁরা মনে করলেন, হয়ত সোভিয়েত দেশের এ নতুন কোন ভনিতা! অত সহজে কি তাঁরা ছাড়বেন? কে আগে চাঁদে পদার্পণ করে, এ চিন্তার পেছনে বিজ্ঞানের বাইরেও আর একটি প্রতিযোগিতামূলক মন যেন ক্রমেই দানা বেঁধে উঠতে লাগল। আবহাওয়াটা তখন সোভিয়েত দেশেরই অনুকূলে। বিশেষ করে সোয়ুজের এমন চকিত সাফল্যে তাঁদের প্রতিই আস্থাটা যেন শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। অনেকের ধারনা শেষ মুহূর্তে একটা কিছু ঘটবেই। মার্কিনীরা কখনই আগে চাঁদের দেশে যেতে পারবেন না!

তবু সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়ে গেল।

ইতিহাসে চন্দ্রযাত্রার প্রথম সারথীর গৌরব অর্জন করে বসল অ্যাপলো-১১!

ফ্রম দ্য আর্থ টু দ্য মুন। আজ থেকে প্রায় এক শ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল জুল ভার্ন-এর এই অনবদ্য গ্রন্থটি। মানুষের মহাকাশ অভিযান যখন ঠাকুরমার ঝুলির মধ্যেই শুধু আবদ্ধ, উষর কল্পনা বিলাসের একমাত্র খোরাক, ঠিক সেই মুহূর্তে এমন অদ্ভুত বিজ্ঞান নির্ভর রচনার প্রকাশ যে কি করে সম্ভব হয়েছিল আজকের এই সুনিশ্চিত সাফল্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে কথা ভাবতে গেলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। জুল ভার্ন-এর চন্দ্রযাত্রার নায়ক ছিলেন বারবিকান এবং আরদেন, কুকুর এবং মুরগী এবং চন্দ্রযানের অধিনায়ক ক্যাপটেন নিকোল। বিরাট এক কামানের ডগায় বসে মাটি থেকে মহাকাশের দিকে যাত্রা, ভারহীন অবস্থায় মহাকাশে তাঁদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রভৃতি যে কত বাস্তব কল্পনা তার প্রমাণ আমরা পেয়ে গেছি। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার, সেই দৈত্যাকার কামানের সাহায্যে যেখান থেকে জুল ভার্ন তাঁর নভচরদের চাঁদের দেশের উদ্দেশে উৎক্ষেপ করেছিলেন, অর্থাৎ তাঁর কাহিনীতে এই কাজের জন্যে যে জায়গাটি নির্বাচিত করা হয়েছিল তার নাম কেপ ক্যানাভেরাল। বর্তমানে যার পরিচয় কেপ কেনেডি।

মার্কিন দেশের আরও বিভিন্ন অঞ্চলের মত ফ্লোরিডাও একদিন ছিল পরাক্রান্ত স্পেন সরকারের অধিকৃত এলাকা। তখন ক্যানা-

ভেরালের এই অঞ্চলটিকে তারা বলত 'আখের ক্ষেত'। যদিও নোনা বালির এই দেশে কখনও আখের চাষ আদৌ হত কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে। দীর্ঘ সাড়ে চার শ বছর পর এই সেদিনও কেপ ক্যানাভেরালের পরিচয়, পশু এবং মাছ শিকারের ক্ষেত্র। ১৯৫০ এ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ এখানে স্থাপন করলেন তাঁদের আতলানতিক অঞ্চলের ক্ষেপনাস্ত্রের আড্ডা। সৌখিন মার্কিন শিকারীদের পীঠস্থান পরিণত হয়ে গেল রকেট উৎক্ষেপের ক্ষেত্র। মহাকাশ অভিযানের পাদপীঠ।

কেপ কেনেডির পশ্চিমে প্রবাহিত হয়ে চলেছে ব্যানানা নদী। আর জুল ভার্ন যেখানে তাঁর কল্প-কাহিনীর কামানটিকে মহাকাশের দিকে মুখ উঁচিয়ে স্থাপন করেছিলেন তারই কয়েক মাইল দূরে মেরিট দ্বীপ। এখানেই অবস্থিত সদা মুখরিত কমপ্লেকস-৩৯। মেরিট দ্বীপের পশ্চিমে ইনডিয়ান নদী। তার ওপারে দিগন্ত বিস্তৃত ফ্লোরিডার মূল ভূখণ্ড। আর মাথার উপর চাঁদ।

উৎক্ষেপ ক্ষেত্রের নাম কমপ্লেকস-৩৯। এখানে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম বাড়ী ভেহকল অ্যাসেমব্লি বিলডিং। ভেতরের আয়তন বারো কোটি নব্বই লক্ষ ঘনফুট। পাঁচ শ পঁচিশ ফুট উঁচু, পাঁচ শ আঠার ফুট চওড়া এবং সাত শ ষোল ফুট লম্বা। পাশাপাশি চারটে স্যাটার্ন রকেটকে এখানে একই সঙ্গে রেখে দেওয়া যেতে পারে। এই বাড়ীর মধ্যেই রকেটগুলির বিভিন্ন স্তর এবং মানুষবাহী ক্যাপস্যুলটি জোড়া লাগিয়ে মহাকাশযান তৈরি করা হয়। আর আছে রকেটকে উৎক্ষেপ মঞ্চের উপর দাঁড় করিয়া রাখার জন্যে তৈরি তিনটি ফ্রেমের স্তম্ভ। তার এক একটি প্রায় চল্লিশ তলা বাড়ীর মত উঁচু। ট্রাকটারের মত গাড়ীতে করে রকেটকে নিয়ে আসা হয় উৎক্ষেপ ক্ষেত্রে। গাড়ীর উপর একটি বড় ফুটবল মাঠের অর্ধেকের মত আকারের একটি সমতল ক্ষেত্র। দুটি ইঞ্জিন গাড়িটিকে ঠেলে নিয়ে চলে অত্যন্ত ধীরে, ঘণ্টায়

প্রায় দেড় মাইল গতিবেগে। এক একটি ইঞ্জিনের ক্ষমতা তিন হাজার অশ্বশক্তির সমান।

জেমিনির সাফল্যের পর কমপ্লেকস-৩৯ হয়ে উঠল আরও তৎপর। ইতিমধ্যে স্যাটার্ন-অ্যাপলো মহাকাশযান তৈরির সমস্ত কিছুই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ১৯৬৭র মধ্যেই চাঁদের ভেলারও কাজকর্ম প্রায় শেষ। চাঁদের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করে সেখানে তখন মহড়া চলছে। সেই সঙ্গে অ্যাপলো নভচরদের অনুশীলন।

তবু দ্বিধার যেন শেষ নেই। শত শত কুশলী যথেষ্ট সতর্কতা নিয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর সম্ভব অসম্ভব হাজারো প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করে চললেন। তৎপরতা, আত্মবিশ্বাস এবং উৎকণ্ঠার তেমন নজির মানব ইতিহাসে যেন দ্বিতীয়টি আর নেই। অ্যাপলো অভিযানের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ডঃ উইলিয়াম এ. লি। আশাবাদীর চেয়ে বাস্তব বুদ্ধিভাবাপন্ন এই মানুষটির মনে তখনও লক্ষ প্রশ্নের ভিড়। যা এ পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যে সাফল্যের চিহ্নই শতকরা নব্বই ভাগ। আর কয়েক মাসের মধ্যে বাকি অংশটুকু সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যাবে।

তবু ?

প্রশ্ন করলেন ডঃ লি। প্রশ্ন করলেন বিভিন্ন বিষয়ের কর্মকর্তাদের বারবার। প্রশ্ন করলেন, ধরুন, ঠিক যাত্রা মুহূর্তে উৎক্ষেপের সময়ই যদি কোন দুর্ঘটনা হয়, তখন ?

উত্তর : তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্যাটার্ন-এর ডগায় যে ক্যাপস্যুলটি রয়েছে তার নিচে আছে অনেকগুলি ছোট ছোট রকেট। তেমন কোন বিপদের চিহ্ন ধরা পড়লেই অত্যন্ত সংবেদনশীল যন্ত্রগণক আপনা থেকেই ঐ রকেট জ্বালিয়ে স্যাটার্নের ডগা থেকে ক্যাপস্যুল-টিকে ঠেলে উপরের দিকে ছুঁড়ে দেবে। পরে প্যারাস্যুটের সাহায্যে নভচররা নিরাপদে মাটির বুকে অবতরণ করতে পারবেন।

প্রশ্ন ঃ মনে করুন, ত্রি-স্তর রকেটটিও ভাল ভাবে কাজ করল, কিন্তু চাঁদের কক্ষে প্রবেশ করার পর ভেলাটিকে আর সচল করা সম্ভব হল না। তখন ?

উত্তর ঃ ওঁরা সরাসরি আবার ফিরে আসবেন।

প্রশ্ন ঃ ধরুন, চাঁদের ভেলা নভচরদের নিয়ে কিছুটা নিচে নেমেও গেল। কিন্তু যে রকেটটি বিপরীত দিকে ঘাত সৃষ্টি করে সেটি হঠাৎ অকেজো হয়ে গেল ?

উত্তর ঃ তখন কম্যাণ্ড মড্যুল অর্থাৎ মূল মহাকাশযানটি নিচে নেমে গিয়ে ওঁদের ভেলাটিকে যাতে ফিরিয়ে আনতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। যদি এমনও হয়, চাঁদের একেবারে কাছ বরাবর এসে যদি তাঁরা দেখেন আশপাশে নামার মত ভাল কোন জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না, তখন তাঁরা চাঁদের ভেলার অবতরণ করার ইঞ্জিন বা যন্ত্রপাতি সেখানে ফেলে দিয়ে ফিরে আসার যন্ত্রটি চালু করে দেবেন এবং কম্যাণ্ড মড্যুলে এসে হাজির হবেন। এর জন্যে নভচরদের তুটি বোতম টিপলেই হল।

প্রশ্ন ঃ যদি এমন হয়, চাঁদের ভেলা চাঁদের পিঠ থেকে উঠেও এল এবং কম্যাণ্ড মড্যুলের কক্ষপথে তাকে স্থাপনও করা গেল। আর তারপরই যদি সেটিকে সরিয়ে এনে মড্যুলটির সঙ্গে আর ভেড়ান না যায় ?

উত্তর ঃ এ ধরনের কোন পরিস্থিতি হলে নভচররা ভেলা থেকে বেরিয়ে এসে সাঁতার কেটে কম্যাণ্ড মড্যুলে এসে হাজির হবেন। যতটা অক্সিজেন তখনও তাঁদের পেছনের ঝুলির মধ্যে জমা থাকবে তাতে ঐ সময়টুকু বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট। ওঁরা বাইরে থেকে কম্যাণ্ড মড্যুলের দরজা খুলে নিজেদের চেষ্টাতেই হামাগুড়ি দিয়ে মড্যুলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবেন।

তবু সংশয় গেল না। যদি চাঁদে নামার সময় আঘাত লেগে বা

অজ্ঞাত কোন কারণে ফিরিয়ে আনার ইঞ্জিনটি বিগড়ে যায় বা জ্বালানির আধারটি ফেটে যায় তখন একেবারে চাঁদের বুক থেকে নভচরদের রক্ষা করার কি হবে ?

উত্তর ঃ দিস ইজ এ চানস ফ্যাকটর।

কথাটা সত্যি বৈকি ? আমাদের সমস্ত ভাবনা চিন্তার সবটাই একেবারে কড়ায় গণ্ডায় মিলে যাবে, বর্তমানের চোখ দিয়ে ভবিষ্যতের সবটাই আমরা দেখে নেব, প্রয়োজনে সেই মত কাজ করব, এমন গ্যারান্টি কে-ই বা কবে দিতে পারে ? কিছু অভিজ্ঞতা, কিছু অনুমান, আর তার সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ, যার আর এক নাম চানস এই নিয়েই তো সাফল্যের চরমতার দিকে মানুষের যাত্রা। কিছুটা ঝক্কি নিতে হবে বৈকি।

জানুয়ারী, ১৯৬৭। কেপ কেনেডির উৎক্ষেপক মঞ্চে অ্যাপলো-১ তখন চন্দ্রযাত্রার প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করার উদ্যোগ স্বরূপ দাঁড়িয়ে। এই প্রথম তিনজন মার্কিন নভচর একই সঙ্গে মহাকাশে বিচরণ করবেন একেবারে নতুন ধরনের মহাকাশযান অ্যাপলোতে। খুঁটিয়ে দেখবেন প্রচণ্ড শক্তিশালী স্যাটার্ন রকেটের যথাযথ যোগ্যতা। ভার্জিল গ্রিসম, এডোয়ার্ড হোয়াইট এবং রোজার শেফি। অ্যাপলো যাত্রার এঁরা হলেন প্রথম তিন নাবিক।

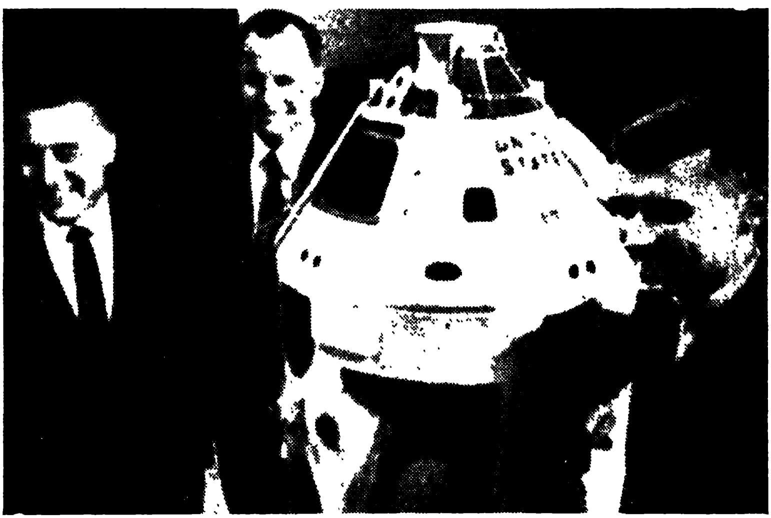
যাত্রার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে এক সাক্ষাৎকারে এই দলের অধিনায়ক গ্রিসম বলেছিলেন, এই যাত্রার প্রতিমুহূর্তে যে কোন রকমের বিপর্যয় বা সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। যে কোন অভিযানেই এটা হতে পারে। প্রথম বা শেষ, যে কোনটিতেই। আপাততঃ যা দেখে নেওয়া দরকার তা হল, যে কোন পরিকল্পনাই আমরা করিনা কেন, সেটা যতদূর সম্ভব শ্রেষ্ঠতম করে তৈরি করা দরকার। আর চাই যথেষ্ট পারদর্শী নভচর। তারপর এসো, আমরা ভেসে চলি। গ্রিসমের এই উক্তি

আজও টেপ রেকর্ডারের মধ্যে ধরা পড়ে আছে।

অথচ কি দারুন ভাগ্যের পরিহাস! যিনি মুহূর্তে একটি সাংঘাতিক ঘটনার আভাস উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, কে জানত, সেটা তাঁর নিজস্ব নিয়তিরই ললাট লিখন ?

জানুয়ারী ২৭, ১৯৬৭। ঐ দিন কেপ কেনেডির উৎক্ষেপ মঞ্চের উপর দাঁড় করান অ্যাপলো-১ ক্যাপস্যুলের মধ্যে উঠে তিন নভচর গ্রিসম, শেফি এবং হোয়াইট নানা রকম যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করছিলেন। অদূরে গ্রাউণ্ড কনট্রোল থেকে ওঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছিল। ২১ শে ফেব্রুয়ারী চৌদ্দ দিনের জন্যে মহাকাশে সফরের আগে এটা প্রস্তুতির প্রথম সোপান।

হঠাৎ! যেন মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কিছু ঘটে গেল।



বাঁ দিক থেকে ভার্জিল গ্রিসম, এডোয়ার্ড হোয়াইট, রোজার শেফি

হেল্প! আমরা জ্বলে যাচ্ছি! গ্রাউণ্ড কনট্রোলে শুধু এইটুকু শব্দই ভেসে এল। তারপর সমস্ত নীরব। ওঁরা দেখলেন অ্যাপলোর

ডগায় ধুঁয়ো। কোন কিছু ভাবার আগেই তিনজন নভচর আকস্মিক এক অগ্নিকাণ্ডে জীবন হারালেন! চন্দ্রযাত্রার প্রথম শহিদ হয়ে গেলেন গ্রিসম, হোয়াইট এবং শেফি।

অ্যাপলো প্রকল্পের একেবারে প্রথমেই এমন একটি দুর্ঘটনা সাময়িক ভাবে মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীদের রীতিমত বিহ্বল করে তোলে। রকেটের তরফ থেকে কোন গোলযোগ হয় নি। ডঃ ওয়ারনহার ফন ব্রাউন যিনি এযাবৎ প্রায় সমস্ত রকেট ব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছিলেন তাঁর মতে গোলযোগের কারণ অন্যত্র ছিল। স্যাটার্ন রকেট তৈরির সময় পুরো ব্যাপারটা তিনি খুঁটিয়েই লক্ষ্য করেছেন। অনেকের মতে বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থার কোন ত্রুটির দরুন হয়ত এটা ঘটে থাকতে পারে।

অতএব পরবর্তী কয়েক মাস খুবই সতর্কতার সঙ্গে এগোতে লাগলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। চাঁদের ভেলা থেকে সুরু করে নভচরদের মূল চালন কক্ষ বা কম্যাণ্ড মড্যুল, মহাকাশে ভেসে চলার সময় চাঁদের ভেলা এবং আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি বহন করার কক্ষ বা সার্ভিস মড্যুল প্রভৃতি বার বার পরীক্ষা করে নেওয়া হল। ঠিক হল প্রথম ছয়টি অ্যাপলো তাঁরা মহাকাশে পাঠাবেন যাবতীয় যন্ত্রপাতি এবং কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করে দেখে নিতে। এর জন্যে তাঁরা জানুয়ারী ১০ এবং এপ্রিল ৬, ১৯৬৮তে যথাক্রমে অ্যাপলো-৫ এবং অ্যাপলো-৬ কে পাঠালেন মহাকাশে। শক্তিশালী রকেট ইঞ্জিন কতটা নির্ভরযোগ্য এবং চাঁদের কক্ষপথে গিয়ে চাঁদের ভেলার নিচে নামা বা ওপরে উঠে আসার ইঞ্জিনটি ঠিক মত কাজ করতে পারবে কিনা তাও খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে। অর্থাৎ কোন রকম ঝক্কি না নিয়েই প্রথম ছয়টি অ্যাপলোকে তাঁরা বার বার পরীক্ষা করে দেখলেন, নভচরের সাহায্য ছাড়াই।

সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পুরনো আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। গত বছর ২৭ শে জানুয়ারীর সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সাময়িকভাবে তাঁদের মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল, এখন আর সেটা নেই।

অক্টোবর ১১, ১৯৬৮। ঐ দিন কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষেপ করা হল অ্যাপলো-৭ কে। দীর্ঘ বিরতির পর আবার মার্কিন নভচররা দেখতে পেলেন মহাকাশের মুখ। ওয়ালটার শিরা, ডন ইজেল এবং ওয়ালটার কানিংহাম এই তিন নভচর এই প্রথম চাঁদে পাড়ি দেবার জাহাজ অ্যাপলো নিয়ে যাত্রা করলেন মহাকাশে। মার্কিন মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এই প্রথম এক সঙ্গে তিনজন নভচর একটি যানের আরোহী হয়ে গগন বিহারের সুযোগ পেল। চাঁদের দেশে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার দিকে এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। সাফল্য ! অক্টোবর ২২ পর্যন্ত দীর্ঘ এগারো দিন আকাশে বিচরণ করে মাটির পৃথিবীতে ফিরে আসেন তাঁরা।

অ্যাপলো-৮। ডিসেম্বর ২১, ১৯৬৮। নভচর ফ্রাঙ্ক বোরম্যান, জেমস লোভেল এবং উইলিয়াম অ্যানডারস। এই প্রথম তিন জন মানুষ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছেদ করে চাঁদের চারপাশে এক উপবৃত্তীয় কক্ষপথে বিচরণ করতে সমর্থ হলেন। বিচরণের সময় চাঁদ থেকে তাঁদের নিকটতম দূরত্ব ছিল প্রায় সত্তর মাইল। যানের দুটি অংশ। কম্যাণ্ড মড্যুল এবং সারভিস মড্যুল।

অ্যাপলো-৯। ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৬৯। এবারকার অধিনায়ক জেমস এ. ম্যাকডিভিট। আর দু জন নভচর ছিলেন ডেভিড স্কট এবং রাসেল এল. সোয়েকারট। স্কটের উপর ভার ছিল চন্দ্রযান বা কম্যাণ্ড মড্যুলটিকে পরীক্ষা করার, রাসেলের উপর চাঁদের ভেলার। চাঁদে নামার পূর্ব মুহূর্তে কি ভাবে চন্দ্রযান থেকে চাঁদের ভেলাটিকে পৃথক করা হবে, চাঁদের পিঠ থেকে চন্দ্রযানে ফিরে আসার পর কি ভাবে সেই ভেলা থেকে চন্দ্রচারীরা চন্দ্রযানে প্রবেশ করবেন এ

ধরনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষা চালান এবারকার নভচররা, পৃথিবীর চারপাশের কক্ষপথে প্রায় দশ দিনের মত মহাকাশে অবস্থান করে। এই অভিযানটিকে বলা যেতে পারে পৃথিবীর বুকে চাঁদে যাওয়ার শেষ পরিপূর্ণ মহড়া।

অ্যাপলো-১০। অধিনায়ক টমাস পি. স্ট্যাফোর্ড। তার দু জন নভচর জন ডব্লু. ইয়ং এবং ইউজেন এ. সারনান। চন্দ্রযাত্রার এই শেষ মহড়াটির ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। কেপ কেনেডি ত্যাগ করার পর প্রায় একশ মিনিট পর প্রথমে এবারকার নভচররা পৃথিবীর চারপাশের একটি কক্ষপথে পরিক্রমণ করেন। এই সময়ে তাঁদের সমস্ত যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। এবং তারপরই মহাকাশযানটির মুখটিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় চাঁদের লক্ষ্যপথে। যাত্রা মুহূর্ত থেকে পুরো অভিযানের প্রায় সব সময় নভচররা অবস্থান করেন কম্যাণ্ড মড্যুলের মধ্যে। শঙ্কুর মত দেখতে এই মড্যুলটিই সারা পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র। কম্যাণ্ড মড্যুলের পেছনে জোড়া ছিল সারভিস মড্যুল। চোঙের মত দেখতে এই অংশটির মধ্যে ছিল বিভিন্ন সরবরাহ এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদক তড়িৎ-কোষ, যানটির মূল ইঞ্জিন এবং বিভিন্ন কাজকর্ম সারার জন্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি। তৃতীয় অংশে ছিল চাঁদের ভেলা। পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করার সময় যাতে ঘর্ষণের ফলে এটি নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্যে গোড়ার দিকে ভেলাটিকে একটি ধাতব আধারের মধ্যে ঢেকে রাখা হয়েছিল। চাঁদের দেশে গিয়ে মূল যানটি যখন একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণ সুরু করে তখন কম্যাণ্ড মড্যুল বা মূল যান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে স্ট্যাফোর্ড এবং সারনান চাঁদের ভেলায় প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে চাঁদের চারপাশের উপবৃত্তীয় পরিক্রমণ পথকে গুটিয়ে ইয়ং একটি বৃত্তীয় পরিক্রমণ পথ তৈরি করে ফেলেছেন। এই সময়ে চাঁদ থেকে মূল মহাকাশযানটির দূরত্ব ছিল

প্রায় সত্তর মাইল। এর পর চাঁদের ভেলায় চড়ে স্ট্যাফোর্ড এবং সার-নান চাঁদের পিঠের একেবারে কাছাকাছি একটি কক্ষপথে পরিক্রমণ করতে থাকেন। সেখান থেকে চাঁদের দূরত্ব ছিল মাত্র পনের মিটার। এই দূরত্ব বজায় রেখে পরিক্রমণ করার সময় তাঁরা চাঁদের পিঠের ছবি তোলেন এবং তন্দ্রা সাগরের যে অঞ্চলটিতে পরবর্তী অভিযাত্রীদের নামার কথা সেই অঞ্চলটিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেন। দেখে নেন সে অঞ্চলে বড় বড় পাথর আছে কিনা, মাটি শক্ত কিনা এবং আরও কিছু খুঁটিনাটি বিষয়। দেখা গেল ভয়ের কোন কারণ নেই। চাঁদের বুক থেকে উঠে আসার সময় যে রকেটটি চাঁদের ভেলাকে ঠেলে তুলবে তার প্রতিক্রিয়া জনিত ঘাত সহ্য করার মত ক্ষমতা চাঁদের ভূ-ত্বকের আছে। নরম মাটি হলে এটা কখনই সম্ভব হত না।

চন্দ্রযাত্রার সমস্ত মহরৎ শেষবারের মত সাফল্যের সঙ্গেই সমাপ্ত হয়ে গেল। অতএব মা ভৈঃ! মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই মুহূর্তেই যেন শুনতে পেলেন চাঁদের বুকে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ!

এবার তাঁরা নিঃসংশয়, এবার তাঁরা নিশ্চিত।

জুলাই ১৬, ১৯৬৯। ঐ দিন পৃথিবীর প্রথম তিন নভচর মানুষের হাজার বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে এগিয়ে এলেন। আরমস্ট্রং, অলডরিন এবং কলিনস তখন বিংশ শতাব্দীর সংবাদ ইতিহাসের শিরোনাম। অ্যাপলো-১১ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের একমাত্র চিন্তা, একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে সেতুবন্ধনের যে এগার কিলোমিটার পথ অ্যাপলো-১০ এর নভচররা অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে এসেছিলেন তাকে সমাপ্ত করতে এগিয়ে গেলেন এবারকার তিন নভচর। কি ভাবে তাঁদের যাত্রার শেষ অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল, কি ভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী পাঁচটি রকেট ইঞ্জিন এফ-১ পৃথিবীর বন্দর থেকে চাঁদের জাহাজকে বিচ্ছিন্ন করে যাত্রা সুরু করল তার ধারা বিবরণী আমাদের এই কাহিনীর সূচনাতেই আপনারা লক্ষ করেছেন। এবার আসুন, চাঁদের সেই জাহাজটির সঙ্গে আমরাও এগিয়ে যাই। তাঁদের যাত্রাপথের নাটকীয় মুহূর্তগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত হই।

প্রচণ্ড গর্জন। লক্ষ মানুষের রুদ্ধশ্বাসের মাঝখানে মনে হল যেন শতেকবজ্র একসঙ্গে ধ্বনিত হয়ে উঠল। তারপরই বিরাট স্ফুলিঙ্গ এবং পাঁজা মেঘের মতো ধুঁয়োর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বিরাট স্তম্ভের

মত অ্যাপলো-১১। প্রথমে বেশ কিছুটা পথ উঠে গেল সোজা উপরের দিকে। ক্রমে আতলানতিক মহাসাগরের বুকের উপর এসে একটু ঝুঁকে গেল পূব দিক বরাবর। এই সময়ে প্রথম স্তর রকেটের প্রতিটি এফ-১ ইঞ্জিন যে ঘাত সৃষ্টি করে তার পরিমাণ প্রায় পনের লক্ষ পাউণ্ড। মোট পাঁচটি ইঞ্জিনের ঘাতের পরিমাণ পঁচাত্তর লক্ষ পাউণ্ড। আর এই কাজটি সারার জন্যে প্রতি সেকেণ্ডে পুড়ছিল পনের টন করে জ্বালানি।

যাত্রার একশ পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করতে করতে অ্যাপলো-১১ সাগরের তল থেকে প্রায় আটত্রিশ মাইল পথ দূরে সরে গেল। গতিবেগ ঘণ্টায় ছ হাজার মাইল, জ্বালানি খরচ হল দু হাজার দু শ টন, অর্থাৎ একশ আটত্রিশ ফুট লম্বা প্রথম স্তর রকেটটির সমস্ত জ্বালানি নিঃশেষ। সঙ্গে সঙ্গে সয়ংক্রিয় যন্ত্র অপ্রয়োজনীয় এই অংশটিকে মূল যান থেকে পৃথক করে দিল, আকাশ থেকে নেমে এসে সেটি গিয়ে পড়ল আতলানতিক মহাসাগরের বুকে।

প্রথম স্তর রকেটটির কাজ শেষ হবার পর জ্বলে উঠল দ্বিতীয় স্তর রকেটের পাঁচটি জে-২ ইঞ্জিন, যার প্রত্যেকটি ঘাত সৃষ্টি করার ক্ষমতা দু লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড। ইঞ্জিনগুলিকে প্রায় ছয় মিনিটের মত সময় চালু রাখা হয়। এই সময়ে অ্যাপলো-১১ পৃথিবী থেকে একশ চোদ্দ মাইল দূরে সরে যায় এবং তার গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ঘণ্টায় চোদ্দ হাজার মাইল। প্রায় পঁচিশ টনের মত জ্বালানি নিঃশেষ করে সাড়ে একাশি ফুট লম্বা দ্বিতীয় স্তরের এই রকেটটিও আগের মত এক সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

নভচররা দেখলেন অ্যাপলো-১১র যাবতীয় যন্ত্রপাতি ঠিক মতই কাজ করে চলেছে। এ পর্যন্ত কোন রকম ত্রুটিও ধরা পড়ে নি। তাঁরা এখন বিচরণ করছেন পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলের হাল্কা

স্তরের মধ্যে দিয়ে। অতএব আপাততঃ কোন বিপদের কারণ নেই, মহাকাশে তাঁদের বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে তেত্রিশ ফুট লম্বা একটি রকেট তাঁদের যানের পেছনেই জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। বিপদের এতটুকু চিহ্ন দেখলে এই রকেটটির কাজ ছিল যাত্রী সহ অ্যাপলোকে ধাক্কা মেরে এমন ভাবে ঠেলে দেওয়া যাতে অ্যাপলো সহ নভচররা আপনা থেকেই আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে পারে। সুখের বিষয় সেটার আর প্রয়োজন হল না। কলিনস, অলডরিন এবং আরমস্ট্রং দেখলেন জীবন রক্ষাকারী ঐ রকেটটি নিজেকে অপ্রয়োজনীয় মনে করে নীরবে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে সরে গেল।

তিন শ তেষট্টি ফুট এবং প্রায় তিন হাজার এক শ টন ওজনের অ্যাপলো স্যাটার্ন-৫ এখন লম্বায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিন ভাগের এক ভাগে। ওজন সাত ভাগের এক ভাগ। যা অবশিষ্ট রয়েছে তা হল সাড়ে আটান্ন ফুট লম্বা একটি জে-২ ইঞ্জিনের ত্রি-স্তর রকেট যার ওজন একশ একত্রিশ টন। তার ডগায় বসান পঞ্চাশ টন ওজনের ছাপ্পান্ন ফুট লম্বা অ্যাপলো। চালু হয়ে গেছে ত্রি-স্তর রকেটের ইঞ্জিনও। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে গতিবেগ গিয়ে দাঁড়াল ঘণ্টায় সতের হাজার পাঁচশ মাইল। অর্থাৎ সেকেণ্ডে পঁচিশ হাজার পাঁচ শ ফুট। এর ধাক্কায় মহাকাশযানটি পৃথিবী থেকে একশ পনের মাইল দূরে একটি বৃত্তীয় কক্ষপথে গিয়ে উপস্থিত হল।

উই হ্যাভ কাট অফ্! আরমস্ট্রং কথা বললেন হিউসটনের পর্যবেক্ষকের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে ত্রি-স্তর রকেটের ইঞ্জিন সাময়িক ভাবে থামিয়ে দেওয়া হল।

ও. কে! হিউসটন থেকে উত্তর।

এতক্ষণ তিনজন নভচর অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নানারকম কাজ

কর্ম করে যাচ্ছিলেন। এবার কয়েক সেকেণ্ড যেন একটু বিশ্রাম করে নিলেন তাঁরা। রকেট ঠিক মত কাজ করছে কিনা, মহাকাশযানের কক্ষের বায়ুচাপ, তাপমাত্রা প্রভৃতির উপর সমস্ত খবর পাঠিয়ে দিয়ে এবার কিছুটা নিশ্চিন্দি। ধকলটা বড় কম গেল না। যানটির মধ্যে আছে বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করার পাঁচশ তেষট্টিটি সুইচ, একাত্তরটি সাংকেতিক আলোক, চল্লিশটি যান্ত্রিক কাজকর্ম নির্দেশ-সূচক এবং চব্বিশটি নানা ধরনের যন্ত্র। এক নাগাড়ে এদের উপর নজর রেখে কাজ করা তো আর সামান্য ব্যাপার নয়, যথেষ্ঠ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এদের নিয়ে এতক্ষণ পাল্লা দিতে হয়েছে তাঁদের।

আর যখন দেখা গেল মহাকাশযানটি সত্যি সত্যিই পৃথিবীকে ঘিরে পরিক্রমণ করতে সুরু করে দিয়েছে আরও খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন আরমস্ট্রং। হ্যাঁ, প্রতি নব্বই মিনিটে পৃথিবীকে একবার করে পরিক্রমণ করে চলেছেন তাঁরা। এবার দেখে নিতে হবে মহাকাশের পরিবেশে এসে কোন যন্ত্রপাতি জখম হয়ে গেল কিনা। না, কিছুই হয় নি। দেখে নিলেন মহাকাশে দিক পরিবর্তনের যন্ত্রপাতি, যাকে পৃথিবীর বুকে ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয় সম্ভব নয়। না, সেটাও ঠিক মত কাজ করছে। নিতান্ত সুখের কথা। নইলে হয়ত সমস্ত কিছু অসমাপ্ত রেখে ফিরে আসতে হত পৃথিবীতে।

ইতিমধ্যে স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে যন্ত্রগণকে পৃথিবী, মহাকাশযান এবং চাঁদের পারস্পরিক অবস্থান জানা হয়ে গেল। অত্যন্ত জটিল এই গণনা। পৃথিবী ঘুরছে তার আপন অক্ষের চারপাশে। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে ছুটে চলেছে সূর্যের চারপাশে তার কক্ষপথ ধরে, চাঁদ পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করছে। তার মাঝে মহাকাশযানের এই পরিক্রমণ, এ যেন একটি ট্রেন ছুটে আসছে, আর একটি ট্রেন ছুটে চলেছে। তখন একটি ট্রেনের

জানলা থেকে অপর ট্রেনের নির্দিষ্ট কোন জানলা লক্ষ্য করে টুক করে একটি ঢিল ছুঁড়ে দেওয়া। সূক্ষ্ম গণনা চাই, চাই সূক্ষ্ম লক্ষ্যপথের নিশানা।

না। এটাও যেন ঠিক উদাহরণ নয়। ব্যাপারটা এই ভাবে চিন্তা করুন। অ্যাপলো ছুটে চলেছে। তার উপর কাজ করছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। যত সে দূরে চলে যাচ্ছে এই আকর্ষণও যাচ্ছে কমে। এক সময়ে সে চলে যাবে চাঁদের কাছাকাছি। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ তার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। অতএব কোন প্রকারে যদি অ্যাপলোকে সেই প্রভাবের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া যায়, চাঁদই তার নিজের মাধ্যাকর্ষণে তাকে টেনে নেবে তার চারপাশের কোন কক্ষপথে। তখন চাঁদের চারপাশ ঘিরে উপগ্রহের মত আবর্তন করা শক্ত হবে না।

কিন্তু বলতে যেমন সোজা কাজটি তেমন সহজ নয়। এমনভাবে তাঁদের পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমানা ত্যাগ করতে হবে যাতে ঝাঁপ দেওয়ার পর যখন তাঁরা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমণ করবেন তখন চাঁদটিও ঠিক এসে যাবে তাঁদের নাগালের মধ্যে। ঠিক কোন সময়ে এবং কোন পথে যাত্রা করতে হবে তা জানার ব্যাপারে যদি এতটুকু ত্রুটি হয় তাহলেই নিশ্চিত মৃত্যু। চাঁদকে সামনে ফেলে অথবা পেছনের দিক দিয়ে পাশ কাটিয়ে তাঁরা চলে যাবেন সূর্যের দিকে। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশে।

না। যন্ত্রগণক ঠিক মতই হিসেবটি বের করে ফেলল।

আরমস্ট্রং জানালেন, ও. কে।

গো! হিউসটন থেকে জবাব দিলেন মিশন কনট্রোল।

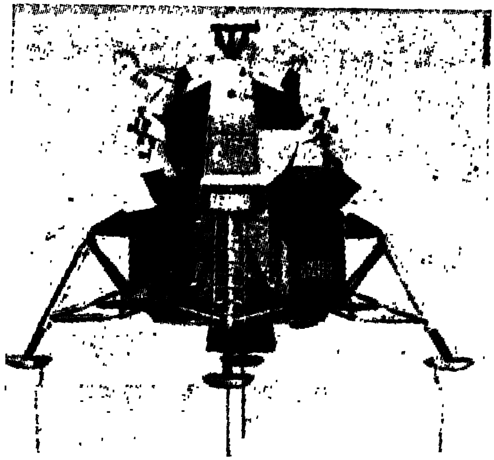
আর ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবী থেকে যাত্রা করার প্রায় দু ঘণ্টা পর অ্যাপলো-১১ যখন সবে দ্বিতীয়বারের মত পৃথিবী পরিক্রমণ করতে শুরু করেছে নভচররা চালু করে দিলেন ত্রি-স্তর রকেট।

প্রায় সাড়ে পাঁচ মিনিট ধরে সেই রকেট প্রচণ্ড ঘাত সৃষ্টি করে মহাকাশযানটির গতিবেগ বাড়িয়ে তুলল ঘণ্টায় চব্বিশ হাজার দু শ পঞ্চাশ মাইল এ। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচ শ পঁয়ত্রিশ ফুট। এটাই হল পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করার এসকেপ ভেলোসিটি বা মুক্তি-বেগ। মুহূর্তে পৃথিবীকে পেছনে ফেলে চাঁদের দিকে যাত্রা করল চান্দ্র-রথ। ছুটে চলল দু লক্ষ মাইল দূরে চাঁদের নিজস্ব কক্ষপথের উদ্দেশে।

চাঁদের দিকে নির্দ্দিষ্ট পথে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মানমন্দির থেকে সুরু হয়ে গেল পর্যবেক্ষণের কাজ। এঁরা নিয়মিত লক্ষ করতে লাগলেন অ্যাপলো-১১ র গতিবেগ এবং গতিপথ। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আপনা থেকেই যানটির অবস্থান এবং লক্ষ্যপথ সম্পর্কে নিয়ত সংবাদ দিয়ে যেতে লাগল। ত্রি-স্তর রকেটটির ইঞ্জিন আবার বন্ধ করা হল। পরবর্তী প্রায় দশ মিনিট কাটল যানটি যথাযথ পথে এগোচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে, তারপর সুরু হল বিভিন্ন যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নেওয়ার তোড়জোড়।

পৃথিবী থেকে যখন তিন জন নভচর যাত্রা করেন তখন তাঁদের আশ্রয় স্থলটি ছিল শঙ্কুর মত মূল মহাকাশযানটি। যার নাম কম্যাণ্ড মড্যুল। এই কম্যাণ্ড মড্যুলের নিচে ছিল সারভিস মড্যুল, যার মধ্যে রাখা হয় বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম। একথা আগেই বলেছি। তারই নিচে ছিল চাঁদের ভেলার কক্ষ। বিশেষ আচ্ছাদনের এই কক্ষটির মধ্যে ঢেকে রাখা হয়েছিল ভেলাটিকে। যাতে করে বাতাসের মধ্যে দিয়ে এগোনর সময় ঘর্ষণের ফলে তার ক্ষতি না হয়। এবং এই কক্ষটির নিচেই পর্যায়ক্রমে জোড়া ছিল তৃতীয়, দ্বিতীয় এবং প্রথম স্তরের তিনটি রকেট। এ তিনটি রকেটই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

চাঁদের ভেলায় গিয়ে উঠতে হবে মূল যানটির শঙ্কুর মত ডগার সামনে লাগান দরজা দিয়ে। অতএব ভেলাটিকে সেখানে ভেড়াতে হবে



চাঁদের ভেলা

আগে। এর জন্যে সারভিস মড্যুল সহ মূল যানটিকে বিচ্ছিন্ন করা হল, ত্রি-স্তর রকেট সহ চাঁদের ভেলাকে যে অংশ কঠিন আবরণী দিয়ে ঢেকে রেখেছিল সেখান থেকে। একটি হাতল ঘুরিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতেই ভেলার সেই মোড়ক টুকরো হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল। অর্থাৎ ভেলাটি এবার মুক্ত আকাশের মধ্যে দেখা গেল। খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে আরমস্ট্রং তাঁর যানটিকে একশ আশি ডিগ্রি কোণ করে ঘুরিয়ে নিলেন। ফলে কম্যাণ্ড মড্যুলের শঙ্কুর মত ডগাটি উল্টে গিয়ে চাঁদের ভেলার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভেসে চলতে লাগল। স্বনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের সাহায্যে এবার কম্যাণ্ড মড্যুলকে সরিয়ে এনে তার শঙ্কুর মত মুখের ডগাটিকে ভিড়িয়ে দেওয়া হল চাঁদের ভেলার ডগার সঙ্গে। এটা করার উদ্দেশ্য চাঁদে নামার সময় কম্যাণ্ড মড্যুলের সামনের দরজা দিয়ে সুড়ঙ্গ পথে আরমস্ট্রং এবং অলডরিন যাতে হামাগুড়ি দিয়ে ভেলাটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন তার

জন্যে। যখন এই কাজটি সুসম্পন্ন হল দূর থেকে বেতারের সাহায্যে আবার ত্রি-স্তর রকেটটির ইঞ্জিনটিকে চালু করলেন আরমস্ট্রং। তারপর ভেলাবাহী কক্ষ সহ ত্রি-স্তর রকেটটিকে দূরাকাশের দিকে ঠেলে দিলেন এমন ভাবে যাতে ভবিষ্যতের চন্দ্রযাত্রীদের যাত্রাপথের সামনে এসে সেটি কোন বিপদ ঘটাতে না পারে।

পৃথিবী থেকে যাত্রার পর অতিক্রান্ত হল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। ইতিমধ্যে তাঁরা পৃথিবীকে ঘিরে থাকা ভ্যান-অ্যালেন বেল্ট-এর সব চাইতে জমাট অংশটি অতিক্রম করে এসেছেন। এই সময়ে অয়ন মণ্ডলের বিকিরণ মেপে নিলেন তাঁরা। সেই সঙ্গে চলতে লাগল দূরের পৃথিবী এবং মহাকাশের নক্ষত্র মণ্ডলের উপর পর্যবেক্ষণ। নক্ষত্রগুলি দেখে তাঁরা নিজেদের গমন পথ ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন! এর মাঝে মাঝে মহাকাশযানের পাশে লাগান ছোট ছোট জেট ইঞ্জিন চালিয়ে তাঁদের যানটিকে পাশ ফেরাতে হল। অবশ্য এর জন্যে পথ চলতে কোন অসুবিধে হয় নি।

জুলাই ১৭। গ্রিনিচ মিন টাইম বিকেল চারটে বেজে সতের মিনিট। হিউসটনের পর্যবেক্ষকরা দেখলেন অ্যাপলো-১১ যেন তার লক্ষ্যপথ থেকে কিছুটা সরে গেছে। ওঁরা জানালেন, ভয়ের কারণ নেই। এখান থেকে সব ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে। এবং হলও তাই। ওঁরা ত্রুটিটি সংশোধন করে দিলেন। শঙ্কুর মত ডগার সামনে চাঁদের ভেলাকে জোড় বেঁধে এবার ছুটে চলতে লাগল চন্দ্রযান। পৃথিবী। দূরে পৃথিবী। আরও দূরে সরে যাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত বিচ্ছিন্ন অনুভূতি।

আপাততঃ আর কোন ঝক্কির কাজ নেই। অন্ততঃ আগামী তিন দিন তো কিছুটা ফুরসৎ পাবেন তাঁরা। আরমস্ট্রং, অলডরিন এবং কলিনস এবার তাঁদের জবড়জং মহাকাশ পোশাকটি খুলে ফেলে একটু ঘরোয়া হয়ে নিলেন। পরলেন সাধারণ অন্তর্বাস এবং হাল্কা ধরনের

জামা কাপড়। সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার রয়েছে। প্রতেকটি খাবার প্যাকেট আলাদা। প্রত্যেকটির গায়ে লেখা আছে তার মধ্যে কোন কোন খাবার রয়েছে, কখন এবং কে খাবেন। ঠিক হয় তাঁরা পালা করে খাবেন যাতে করে অন্তুতঃ একজন নভচর নিয়মিত পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বা যন্ত্রপাতির উপর নজর রাখতে পারেন। কিন্তু ঘুমনোর ব্যাপারে নিয়মটা হল উল্টো। ওঁরা তিন জনই একসঙ্গে ঘুমবেন এবং একসঙ্গে জাগবেন। কারণ এর আগের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পালা করে ঘুমতে গিয়ে যাঁরা ঘুমন তাঁরা যানের মধ্যেকার কাজ কর্মে বিরক্ত হয়ে ওঠেন। আবার যাঁরা জেগে থাকেন তাঁদের ভয়, এই বুঝি ঘুমন্ত সঙ্গীদের তিনি কিছু অসুবিধে করে বসলেন। তাই এবার এই নতুন নিয়ম। নভচরদের যাবতীয় শারীরিক অবস্থার ব্যাপারে অবহিত হচ্ছিলেন হিউসটনের গ্রাউণ্ড কনট্রোল বিশেষ বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে।

ছুটে চলেছে কম্যাণ্ড মড্যুল। মার্কিন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এর নাম রেখেছেন কলামবিয়া। তার ডগায় চাঁদের ভেলা। নাম ঈগল। সম্মুখে ঈগল, পেছনে সার্ভিস মড্যুল, মাঝখানে কলামবিয়া। তার মধ্যে কখনও বসে, কখনও ব্যায়াম করে শরীরটাকে একটু চাঙা রেখে, কখনও বাইরের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে তাদের ছবি তুলে সময় কাটাচ্ছেন তিন নভচর। মাঝে মাঝে ওঁরা হিউসটনের মিশন কনট্রোলকে জিজ্ঞেস করছেন, বলুন আজ পৃথিবীর খবর কি? বলি, পৃথিবী গ্রহের নতুন কোন খবর আছে কিছু?

মিশন কনট্রোল তাই মাঝে মাঝে প্রাত্যহিক খবরের কাগজ থেকে প্রধান প্রধান খবর তাঁদের পড়ে শোনাতে লাগলেন বেতারের মাধ্যমে। কখনও তাঁরা নিজেদের স্ত্রী পুত্র পরিবাররা কেমন আছেন জানতে চান। তাও জানান হতে লাগল। পৃথিবী তার আপন

অক্ষের চারপাশে ঘোরার দরুন কোন বেতার স্টেশনকে সেখানে সব সময় অ্যাপলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তা ছাড়া অ্যাপলোও মহাকাশে কোন নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয় দাঁড়িয়ে নেই। তাই তার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্যে আরও কয়েকটি বেতার ঘাঁটির প্রয়োজন হয়। এরা হল স্পেনের মাদ্রিদ, ক্যালিফোর্নিয়ার গোল্ডস্টোন, এবং অস্ট্রেলিয়ার ক্যানবেরা। ক্যানবেরার সহরতলী অঞ্চলে অবস্থিত হনিসাকল-এর কেন্দ্রটিকেও এই কাজে লাগান হয়। ফলে পৃথিবী আবর্তন করলেও অ্যাপলো যেখানেই থাকুক এদের কোন না কোন স্টেশনের সঙ্গে তার বেতার সংযোগ স্থাপন করা শক্ত নয়। উল্লেখ্য, চাঁদের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় অ্যাপলোকেও পৃথিবীর মত তার অক্ষের চার পাশে প্রতি ঘণ্টায় একবার করে আবর্তন করান হচ্ছিল যাতে করে সূর্যের দিকে মুখ ফেরানর পর যে পিঠটি তার প্রচণ্ড ভাবে গরম হয়ে উঠছিল, ঘুরে বিপরীত দিকে গেলে সেটি আবার দারুন ঠাণ্ডার স্পর্শে শীতল হয়ে যায়।

পৃথিবীর বুকে অতিক্রান্ত হল আরও দু দিন। কিন্তু মহাকাশে দিবারাত্রির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সঙ্গের ঘড়ি দেখে তাঁরা মিলিয়ে নিচ্ছিলেন পৃথিবীর সঙ্গে নিজেদের সময়। শুক্রবার, জুলাই ১৮, অলডরিন এবং আরমস্ট্রং ঈগলটিকে একবার পরীক্ষা করে নিলেন।

অবশেষে শনিবার, জুলাই ১৯, আরমস্ট্রং জানালেন, এবার চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের প্রাবল্য যেন বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর পিছুটানে মহাকাশযানের গতিবেগ এবার কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ঘণ্টায় দু হাজার দু শ মাইলে। সেকেণ্ডে তিন হাজার দু শ পঞ্চাশ ফুট। এরই মধ্যে তাঁরা প্রায় দুই লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে এসেছেন। হিউসটনের মিশন কনট্রোল বুঝতে পারলেন ওঁদের উপর পৃথিবীর

মাধ্যাকর্ষণ অনেক কমে গেছে। চাঁদের আকর্ষণের প্রভাবে ওঁরা ছুটে চলেছেন চাঁদের দেশে।

পরিস্কার ফুটে উঠেছে এবার চাঁদের পিঠ। আর মাত্র পাঁচ হাজার মাইল পথ। চাঁদের আকর্ষণ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দেখতে দেখতে গতিবেগ বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল। সঙ্গে সঙ্গে সারভিস মড্যুল সহ মূলযানটিকে উল্টে নিয়ে তাদের জেট ইঞ্জিন চালু করে দেওয়া হল। ইঞ্জিনগুলি বিপরীত দিকে ঘাত সৃষ্টি করায় তাঁরা অল্পক্ষণের মধ্যে গতিবেগ কমিয়ে আনলেন ঘণ্টায় তিন হাজার ছ শ মাইলে। এই সময় একটি উপবৃত্তীয় পথে মহাকাশযানটি চাঁদের চারপাশে পরিক্রমণ করতে স্বুরু করে দেয়।

ঐ দিন গ্রিনিচ মিন টাইম বিকেল পাঁচটা তের মিনিটে তিনজন নভচরকে নিয়ে মহাকাশযানটি চলে গেল চাঁদের বিপরীত দিকে।



অ্যাপলো-১১র অধিনায়ক নীল আরমস্ট্রং

ফলে বেশ কিছু সময় তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর বেতার যোগাযোগ ব্যহত হয়। পাঁচটা বেজে বাইশ মিনিটে চাঁদের চারপাশের একটি বৃত্তীয়

কক্ষপথে স্থাপন করা হল অ্যাপলো-১১ কে এবং পাঁচটা বেজে ছেচল্লিশ মিনিটে আবার তাঁদের সঙ্গে বেতার সংযোগ স্থাপিত হয়।

কিছুক্ষণ বিরতি, তারপর কলামবিয়ার ডগার দরজা খুলে হামাগুড়ি দিয়ে প্রথমে আরমস্ট্রং পরে অলডরিন এসে ঢুকলেন



অ্যাপলো-১১র চালক মাইকেল কলিনস

চাঁদের ভেলায়। তারপর প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে চলল শেষবারের মত ভেলাটিকে পরীক্ষা করে নেওয়ার কাজ। দীর্ঘ এই যাত্রাপথের মাঝখানে সেটি অটুট আছে কিনা দেখে নিলেন তাঁরা।

হ্যাঁ, সমস্তই ঠিক রয়েছে।

মুহূর্তে পৃথিবী থেকে শেষ খবর এসে পৌঁছল। শেষ নির্দেশ : এবার কাজটা সুরু করুন।

আরমস্ট্রং এবং অলডরিন তখন দৃঢ় প্রত্যয় এবং কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন যন্ত্রগণকের দিকে। ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মানুষের মুখের প্রতিটি শিরা-উপশিরা

যেমন শক্ত হয়ে ওঠে ওঁদের অবস্থাও কতকটা তাই। এই তো চরম মুহূর্ত!

দুই নভচর মুহূর্তের জন্যে চালু করলেন চাঁদের ভেলার ইঞ্জিন। সঙ্গে সঙ্গে ভেলাটি কলামবিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে সরে গেল এবং কলামবিয়ার পরিক্রমণ পথ ধরে চলতে সুরু করল। এই সময় কলিনস জানলার ভেতর দিয়ে মূল যানটি থেকে দেখে নিলেন ভেলায় লাগান অবতরণ করার যন্ত্রটি ঠিক মত বেরিয়ে এসেছে কিনা। ভেলার আড়ালে পড়ায় আরমস্ট্রং এবং অলডরিন এদের ভাল করে দেখতে পান নি। কলিনস জানালেন, সব ঠিক হ্যায়।

আরমস্ট্রং আবার চালু করলেন ইঞ্জিনটি। একই বৃত্তীয় পথ ধরে ভেলাটি কলামবিয়া থেকে দু হাজার একশ ফুটের মত দূরে



চাঁদের ভেলার পরিচালক এডুইন অলডারিন

সরে গেল। এবার চালু করা হল নিচে নামার ইঞ্জিন। জেটের প্রবল ধাক্কায় বৃত্তীয় পথ থেকে চাঁদের ভেলা ছিটকে নেমে এল

একটা লম্বাটে ধরনের উপবৃত্তীয় পথে। এই উপবৃত্তের নিকটতম স্থানের দূরত্ব চাঁদ থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার ফুট। কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার পর আবার নিচে নামার ইঞ্জিনটি বন্ধ করে দেওয়া হল। ফলে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণে তাঁরা দ্রুত বেগে উপবৃত্তীয় পথ ধরে নেমে আসতে লাগলেন নিচে, আরও নিচে। ঐ পথ ধরে এক সময়ে আবার অনেক দূরে সরে গেলেন, না, এবার আর চন্দ্র প্রদক্ষিণ নয়। এবার নেমে আসার পালা।

ছোট্ট চাঁদের ভেলায় দুটি ত্রিভুজাকৃতি জানালার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে আরমস্ট্রং এবং অলডরিনের মুখ। সেখানে রীতিমত উত্তেজনা। ভেলার সঙ্কীর্ণ জায়গার মধ্যে বসার কোন ব্যবস্থা নেই। তাঁরা দাঁড়িয়ে রয়েছেন ট্রামগাড়ীর চালকের মত। একটা ঢালু পথ বেয়ে যেন এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। পরিস্কার ফুটে উঠেছে চাঁদের বুক। দূরবীন নয়, খালি চোখেই সব কিছু যেন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখা গেল লম্বা এবং সরু পাহাড়ের এবড়ো খেবড়ো আল। ঐ তো সাপের মত আঁকাবাঁকা আরও কয়েকটি পর্বতমালা। তারপরই ভেসে উঠল বিরাট সেনসরনিয়াম জ্বালামুখ যার চারপাশটা ঘিরে রেখেছে বড় বড় শিলাখণ্ড। কে জানে কত কোটি বছর আগে সেখানে এসে তারা ভিড় করেছিল। কালের বিধানে আজও একই জায়গায় অনড় হয়ে রয়ে গেছে।

ওদিকে আড়াই লক্ষ মাইল দূরে অন্য মাধ্যাকর্ষণ জগতের মধ্যে বসে হিউসটন মিশন কনট্রোল সেনটারের পর্যবেক্ষকরা রুদ্ধশ্বাসে সমস্ত কিছু দেখে চলেছেন। দীর্ঘদিনের মহাকাশ অভিযানের অভিজ্ঞতায় এর যেন কোন তুলনাই হয় না।

আর মাত্র চল্লিশ হাজার ফুট। চাঁদের ভেলা ঢালুপথে কুড়ি মাইল ব্যাসের মাসকে লাইন গহ্বরটি অতিক্রম করে গেল এই মাত্র। আরমস্ট্রং আবার চালু করলেন নিচের ইঞ্জিনটি। তার প্রবল

উর্দ্ধমুখী ধাক্কায় তার গতিবেগ এবার অনেক কমে এসেছে। ঘণ্টায় এক হাজার সাতশ মাইল।

দু মিনিট পর। আর মাত্র আঠারো হাজার ফুট। মনে হচ্ছে যত বেগে যানটি চাঁদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ঠিক তত জোরেই চাঁদের পিঠটি পায়ের নিচ থেকে এক পাশে সরে যাচ্ছে। বিমান বন্দরে নামার সময় প্লেনের জানালা দিয়ে নিচের মাটিকে যেমন সরে যেতে দেখা যায় ঠিক তেমন। সেখান থেকে একটা কোণ বরাবর এগিয়ে যেতে হবে ঠিক বারো মাইল দূরত্বে।

কিন্তু একি? এ কোথায় চলেছে ঈগল? দূরে ওটা যেন চাঁদের পাতালপুরীর মত মনে হচ্ছে না? রবটের সিগনালের দিকে চাইলেন আরমস্ট্রং। সর্বনাশ! রবটতো ঈগলকে ঐ দিকেই নিয়ে চলেছে? বিরাট একটি গর্ত যেন হাঁ বাড়িয়ে তাঁদের গেলার জন্যে বসে রয়েছে। ওর ভেতরে নামা মানেই তো সব শেষ!

হিউসটনের পর্যবেক্ষকরা আসন্ন বিপদে প্রমাদ গুণলেন। সঙ্গে সঙ্গে রবটকে আদেশ করা হল, ওখানে নয়, অন্য কোনখানে। রবট তাঁদের নির্দেশমত অবতরণের লক্ষ্যস্থলটি পালটে নিল। নির্বাচিত হল আর একটি নতুন স্থান।

কিন্তু তাই বা কেমন করে হয়? ওদিকটাতে তো আবার পাহাড়ের মত কি সব দেখা যাচ্ছে। বড় বড় পাথরের চাঁই। এবড়ো খেবড়ো জমি। পুরো অ্যাপলো-১১ অভিযানে সম্ভবতঃ এটাই একমাত্র দুঃসাহসিকতম মুহূর্ত!

না। শুধু যন্ত্রের ওপর আর নির্ভর করা চলে না। সাফ কথা জানিয়ে দিলেন আরমস্ট্রং হিউসটনের মিশন কনট্রোলকে। তারপরই একেবারে নিজেই এবার তিনি ঈগলের পুরো দায়িত্বটা নিয়ে নিলেন।

অবশেষে আরমস্ট্রং এবং অলডরিনই ঠিক করে নিলেন কোথায় নামবেন তাঁরা।

একবার ভেবে দেখুন কি দারুন ঝক্কিটা নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে নিলেন দুই মহাকাশচারী। একেবারে নতুন পরিবেশে, যাকে চোখের দেখাও কেউ একবার দেখে নি, যেখানকার বাস্তব অভিজ্ঞতা শুধু মাত্র যন্ত্রের মাধ্যম ছাড়া স্থূল মনুষ্য অনুভূতি কোনদিন অনুভব করে নি, সেখানে একেবারে নিজেদের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করে এত বড় ঝক্কিটা নেওয়া নিঃসন্দেহে এক বিরাট কীর্তি। বিশেষ করে সময় যেখানে একটি বড় সমস্যা।

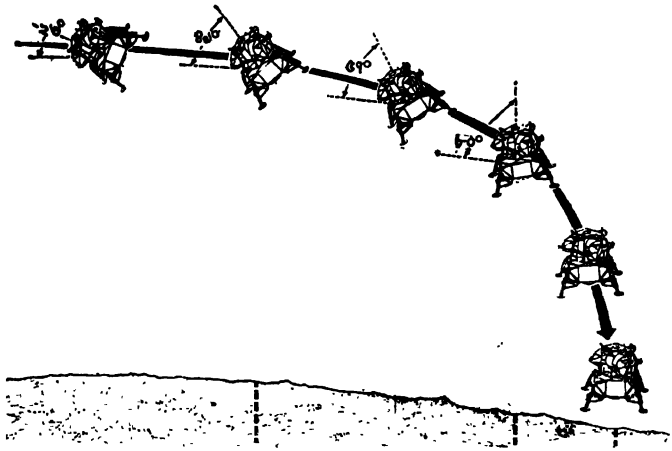
সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। দু' মিনিট। চাঁদের বুক থেকে এবার ঈগলের দূরত্ব সাত হাজার পাঁচ শ ফুট। যেখানে নামবেন সেখানকার দূরত্ব পাঁচ মাইলেরও কম। এবার সব কিছু আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিষুব রেখার পাশ বরাবর অ্যাপলো অঞ্চলটি অনেকটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। বাঁ দিকে বট পাহাড় এবং ডিউক দ্বীপ। ডান দিকে ওয়াস বেসিন। তার অদূরে মসৃন এক অনুচ্চ পাহাড়ের শ্রেণী। গভীর গহ্বর মলটকে।

চল্লিশ সেকেণ্ড বাকি। নিচের দিকে নামতে হবে আর মাত্র দু শ ফুট। নভচবরা এবার ঈগলের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি নিজেরা গ্রহণ করলেন যন্ত্রগণকের হাত থেকে, নিজেদের সুবিধে মত গতিবেগ কমিয়ে নেওয়া হল ঘণ্টায় পাঁচ মাইল। সেই সঙ্গে অবতরণ করার যথাযথ স্থানটি খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া হল।

সাবাস! হ্যাঁ। পেয়ে গেছেন তাঁরা তাঁদের মনের মত জায়গাটি। একটি বিস্তৃত ভূমি আর মাত্র পঞ্চাশ ফুট নিচে। সঙ্গে সঙ্গে গতি বেগ কমিয়ে করা হল ঘণ্টায় প্রায় সাড়ে তিন মাইল। অর্থাৎ মানুষ সাধারণতঃ যতটা গতিবেগে হাঁটে কতকটা তাই, এবার খাড়া নেমে চলেছেন তাঁরা।

যখন ঠিক পাঁচ ফুট ওপরে, ঈগলের মাকড়সার পায়ের পাতায় যে চারটে বৈদ্যুতিক সংকেত জ্ঞাপনকারী যন্ত্র সরু এবং লম্বা লাঠির

মত ঝুলে ছিল তারা চাঁদকে স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে নভচরদের কক্ষের ভেতরে জ্বলে উঠল লাল বাতির সংকেত।



ঈগল চাঁদের বুকে নামছে

হ্যাঁ! এই তো সেই আলোর সংকেত! এরই জন্যে তো মানুষ শত শতাব্দীর ইতিহাস ধরে অপেক্ষা করেছে। চাদ এবার মানুষের স্পর্শে। আলোর সংকেত জানিয়ে দিল, মা ভৈঃ। এসে গেছ তোমরা। সেই মুহূর্তে আরমস্ট্রং রকেট ইঞ্জিনটি বন্ধ করে দিলেন। আর তার পরই ঈগলের পা একটি মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে চাঁদের মাটি স্পর্শ করল।

পৃথিবীর মানুষ চাঁদের বুকে অবতরণ করল! বিকেল চারটে বেজে তেইশ মিনিট, ইস্টারন ডে লাইট সেভিং টাইম। রবিবার, ভারতীয় সময় জুলাই কুড়ি, সোমবার রাত একটা বেজে উনপঞ্চাশ মিনিট। তাঁরা নামলেন চাঁদের তন্দ্রা সাগরে। পূর্ব দিক বরাবর চাঁদের বিষুব রেখার গা ঘেঁষে।

'বাঃ! অপূর্ব!' আরমস্ট্রং-এর কণ্ঠস্বর।

চাঁদের দেশ থেকে এই প্রথম ভেসে এল পৃথিবীর মানুষের কণ্ঠস্বর।

ওদিকে চান্দ্রজগতের প্রায় একশ এগার মাইল ঊর্দ্ধাকাশে চাঁদকে ঘিরে ক্রমান্বয়ে প্রদক্ষিণ করে চলেছেন মাইকেল কলিনস। অ্যাপলো-১১ র এই খণ্ডযান কলামবিয়া যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে কলম্বাসের কথা। চাঁদের পিঠে হয়ত কলিনসকে নামতে হল না। কিন্তু তাঁরও ঝক্কি বড় কম নয়।

এখানে আবারও একটা পুরনো কথার আবৃত্তি না করে পারছি না। ফুটবল খেলায় গোলেতে শট মেরে যে খেলোয়াড়টি দলকে বিজয়ীর মুকুট পরতে সাহায্য করেন, দর্শকের মুহূর্ত দৃষ্টি তাঁর ওপর কেন্দ্রীভূত হলেও, যিনি ঐ শটটি করলেন, তিনি জানেন আসল কৃতিত্ব কার। একজন ঝানু খেলোয়াড়ের পক্ষে গোলের অব্যর্থ নিশানা ভুল হওয়া শক্ত, যদি ঐ মুহূর্তে পাসিংটি ঠিক হয়। কলিনস সেই পাসিং মাস্টার।

মুহূর্তের জন্যে চাঁদ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে একবার কলিনসের কথা ভাবুন। কিছুক্ষণ আগেও তাঁর সঙ্গী ছিলেন দুজন। শত বিপদ এবং ঝক্কির মাঝেও সেই দুই সঙ্গী নিশ্চয় তাঁকে অফুরন্ত মনোবল জুগিয়েছে। যুদ্ধভূমিতে পঞ্চাশ জন সতীর্থ সৈনিকের সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে এগিয়ে যাওয়া তেমন কঠিন নয়। কিন্তু একেবারে নিঃসঙ্গ একজন মানুষের পক্ষে প্রতিপক্ষ বিপুল বাহিনীর সঙ্গে মাথা ঠাণ্ডা রেখে লড়াই করা নিশ্চয় খুব শক্ত কাজ। মনোবলের পরীক্ষাটাই সেখানে সব চাইতে বড় সমস্যা।

কলামবিয়ায় সম্পূর্ণ একা বসে থেকে সেই পরীক্ষাই দিলেন কলিনস। মাথাটি ঠাণ্ডা রেখে তাঁকে নজর রাখতে হয়েছে সতীর্থ দুই মহাযাত্রীদের প্রতি। প্রতিমুহূর্তে দেখতে হয়েছে ঈগল ঠিকমত তার আরাধ্য লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছে কিনা। আরমস্ট্রং এবং

অলডরিন ঠিকমত নিজেদের শক্ত রাখতে পেরেছেন কিনা। সঙ্গে সঙ্গে হিউসটনের মিশন কনট্রোল সেনটারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা। তার মাঝে কলামবিয়ার ক্যাবিনের পাথরের নীরবতা যেন অসহায় করে তুলতে চায় মনের সমস্ত ক্ষমতাকে, স্নায়ুতন্ত্রের ওপর সে এক অদ্ভুত চাপ। সেই মানসিক চাপকে কাটিয়ে তুলে সম্পূর্ণ একা একের পর এক যন্ত্রের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যে কি কঠিন ব্যাপার, মাটির বুকে অবস্থানরত কোন মানুষের পক্ষে তা অনুভব করা অসম্ভব। অ্যাপলো-১১ র সাফল্যকে যাঁরা শুধু যান্ত্রিক বা প্রযুক্তিগত নৈপুণ্যের সাফল্য বলে খাটো করতে চান তাঁদের বলে রাখি, সম্পূর্ণ অজ্ঞাত পরিবেশে এবং অনভ্যস্থ অবস্থায় কয়েকজন মানুষকে অতখানি কর্মক্ষম রেখে কাজ করানটা বিজ্ঞান জগতের একটি যুগান্তকারী সাফল্য নয় কি ?

চাঁদকে বেষ্টন করে কলামবিয়া পরিক্রমণ শুরু করল।

তখন ঈগল চাঁদের বুকে পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

মনের ওপর দিয়ে ধকল অনেকটা গেছে। এবার বিশ্রাম চাই।

মিশন কনট্রোল জানালেন, এবার একটানা ঘুমিয়ে নিন কয়েক ঘণ্টা।

ওঁদের নির্দেশ মত ওঁরা ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। অবশ্য ঘুম বলতে শুধু চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাশ ফেরার সুযোগ কম। তেমন জায়গাও নেই। কথা ছিল, অসুবিধে হলে ওঁরা ঘুমের বড়ি খাবেন। তার দরকার হল না। ঈগলের ছাদের দিকে চেয়ে থকতে থাকতেই এক সময় চোখের পাতা ভারি হয়ে এল। ওঁরা ঘুমিয়ে পড়লেন।

অতিক্রান্ত হল আট ঘণ্টার কিছু বেশি সময়। একটা আরামের ঘুমের পর জেগে উঠলেন আরমস্ট্রং এবং অলডরিন। টুথ ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজলেন তাঁরা। লুনার মড্যুল বা চাঁদের ভেলার মধ্যে বসে

তাঁরা যা যা খাবেন, আগে থেকেই তা স্থির করা ছিল। খাবারের মধ্যে ছিল শুয়োরের মাংসের চাক, পিচ ফল, চিনির মিঠাই, কফি, আঙুর বা আনারসের রস। এ ছাড়া ছিল গরুর মাংসের ঝোল, মুরগীর মাংসের তরকারি, কমলা লেবুর রস। এতেও যদি ক্ষিধে না পায় তার জন্যে আরও নানা রকমের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। অমন পরিবেশে মনটার পক্ষে একটু অবুঝ হয়ে পড়া তখন বিচিত্র নয়। বাচ্চারা যেমন নানান খাবারের জন্যে বায়না করে কে জানে নতুন ঐ পরিবেশে হঠাৎ ওঁদের পেয়ে বসল, গরুর ঝোলটার কথা মনে না পড়লেই যেন সব ক্ষিধে ফুরিয়ে যাচ্ছে। এটা রীতিমত মনস্তত্ত্বের ব্যাপার। খাদ্য যে শুধু পেটের ক্ষিধে মেটান নয়, কিছুটা মানসিক তৃপ্তিরও ব্যাপার, মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সে কথা ভোলেন নি। আর এ ক্ষেত্রে এতটুকু মানসিক অস্বস্তি যে কতবড় অনর্থ ঘটাতে পারে এতো সকলেই বুঝতে পারেন। তাই অন্যান্য খাদ্যবস্তুর মধ্যে লুনার মড্যুলে রাখা ছিল বার্লির ঝোল মেশান টার্কি মোরগের মাংস, রুটি, শুখনো ফল, চিজ মাখান বিস্কুট, বারবাকিউ অর্থাৎ বিভিন্ন মাংসের পুর দেওয়া রুটি, চকোলেট, খুবানি ফল, শুয়োরের মাংস, টুনা মাছ, মুরগীর মাংসের কুচির স্যালাদ, চিংড়িমাছের ঝোল, সিমুই মেশান মাংস, মুরগীর মাংসের পোলাও, আরও অনেক কিছু।

প্রাতঃরাশ শেষ করলেন তাঁরা টুনা মাছের স্যালাদ, গরুর মাংসের টুকরো, ফলের রস এবং কফি দিয়ে। তারপর মার্কিন দেশের চির অভ্যাস অনুসারে এক টুকরো করে চুইংগাম মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে চাঁদে নামার পোশাক পরতে শুরু করলেন তাঁরা।

এও রীতিমত এক ধকলের মত ব্যাপার। পঁয়ষট্টি পাউণ্ড ওজনের পোশাকটি পরতে কিছুটা সময় গেল। এই পোশাকের মধ্যে বিশেষ ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে বাতাসের চাপ সংরক্ষিত করার ব্যবস্থা করা ছিল। এরপর পিঠের পেছন দিক দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হল আরও

একটি বড় প্যাকেট। ওজন পঁচাশি পাউণ্ড। এতে আছে শ্বাস প্রশ্বাস চালানর মত অক্সিজেন। কিছু বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি।



শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অন্তর্বাস

উল্কা-চূর্ণ বা বিষাক্ত বিকিরণের আঘাত যাতে দেহের ক্ষতি করতে না পারে তার জন্যে পোশাকটিকে শেষ বারের মত দেখে নেওয়া হল। এ সমস্ত করতে প্রায় দু ঘণ্টা কেটে গেল ভেলার কক্ষের মধ্যেই।

বেশ খাটুনি হচ্ছিল ওঁদের। কিন্তু উপায় নেই। চাঁদের বুকে বায়ুহীন পরিবেশে নিঃশ্বাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে যাতে ঠিক মত সরিয়ে ফেলা যায় সেটা দেখতে হল। সৌর-রশ্মির তাড়ন থেকে শরীরটি বাঁচাতে হবে। দেহটি ঠিক মত যাতে ঠাণ্ডা থাকে সেটাও দেখতে হবে। যদিও কথা আছে চাঁদের আকাশে সূর্য ওঠার সময়, অর্থাৎ চাঁদের প্রাতঃকালে বেশ ঠাণ্ডা থাকতে থাকতে কাজ কর্ম সেরে

ফেলতে হবে, কিন্তু এরই মধ্যে সেখানকার তাপমাত্রা প্রায় একশ ত্রিশ ডিগ্রি ফার্নহাইটে পৌঁছে গেছে।

অবশেষে প্রস্তুতি পর্ব শেষ হয়ে গেল। স্বচ্ছ মুখোশের মধ্যে দিয়ে আরমস্ট্রং চাইলেন অলডরিনের দিকে। মুখে মৃদু হাসি। অজ্ঞাত একটা অনুভূতি উভয়কেই তখন বেশ নির্বিকল্প করে তুলেছে। হয়ত প্রশ্ন উঠল মনে, চাঁদের বুকে তাঁরা পা ফেলতে পারবেন তো? কে জানে, অজ্ঞাত কোন রশ্মি মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের গ্রাস করে ফেলতে পারে না? অথবা মাটিতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। যন্ত্র অবশ্য অনেক কিছুই খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে, তবু কে জানে তারা কতখানি নির্ভরযোগ্য।

ঠোঁট দুটি ফাঁক হল অলডরিনের, সম্ভবতঃ বললেন, গুড লাক!

আরমস্ট্রংও হাত নেড়ে তাঁকে যেন বরাভয় দিলেন। কম্যাণ্ডার নীল আরমস্ট্রং পদাধিকার এবং অভিজ্ঞতার জন্যে তিনিই অ্যাপলো-১১র অধিনায়ক। তাঁকেই এগিয়ে যেতে হবে আগে।

ঈগলের চাঁদে নামার প্রায় নয় ঘণ্টা পর। জুলাই ২১, ১৯৬৯। ভারতীয় সময় সকাল এগারটা একান্ন মিনিট। ঈগল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার দরজাটা খুললেন আরমস্ট্রং। ততক্ষণ প্রায় বারো ফুট লম্বা সিঁড়ি দরজার পাশ থেকে নেমে এসে প্রস্তুত হয়ে আছে। এই সিঁড়ি বেয়েই নেমে যেতে হবে আরমস্ট্রংকে।

আরমস্ট্রং একবার দরজা দিয়ে মুখ গলিয়ে বাইরেটা দেখে নিলেন। চাঁদের প্রকৃতি তখন তাঁকে বেশ উত্তেজিত করে তুলেছে।

এক মুহূর্ত! আরমস্ট্রং সোনালী রঙের ঢেউ খেলান একটি অংশের ওপর দিয়ে এগিয়ে এলেন সিঁড়ির মাথায়। তারপর আস্তে করে বাঁ পা টি রাখলেন সিঁড়ির প্রথম ধাপে।

না। সব ঠিক মতই কাজ করছে।

অবএব নির্দেশ মত দ্বিতীয় ধাপে নেমেই তিনি বাঁহাতে হাতল ধরে দাঁড়িয়েই একটি রিং ধরে টান মারলেন। সঙ্গে সঙ্গে লুনার মড্যুলের নিচের অর্দ্ধাংশ বরাবর একটি বোঁচকা এসে খুলে গেল। আর তা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটি টেলিভিশন ক্যামেরা। ক্যামেরাটি বেরিয়ে এসেই ঠিক আরমস্ট্রংকে লক্ষ্য করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার লক্ষ্য রইল পুরো সিঁড়িটা এবং মড্যুল থেকে আরও প্রায় কুড়ি ফুট দূরের বিস্তৃত অঞ্চল পর্যন্ত স্থান।

এবার মড্যুলের মধ্যে বসে বৈদ্যুতিক সংযোগটি চালু করে দিলেন অলডরিন। টেলিভিশন ক্যামেরা চালু হয়ে গেল, আর তার ছবি মুহূর্তের মধ্যে চলে আসতে লাগল পৃথিবীর বুকে। প্রথমে মিশন কনট্রোল। তারপর পৃথিবীর ঘরে ঘরে উৎসুক দর্শকের লক্ষ লক্ষ টেলিভিশনের পর্দার ওপর।

আরমস্ট্রং এবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলেন। অত্যন্ত সন্তর্পণে এক একটি ধাপ নামতে বেশ সময় লাগছিল। ক্যামেরায় তাঁর সেই নামার ছবি অদ্ভুত লাগছিল পৃথিবী থেকে।

এক মিনিট। সিঁড়ির শেষ ধাপ থেকে খানিকটা লাফ দেওয়ার ভঙ্গীতে পা ফেলতে হল আরমস্ট্রংকে। প্রায় তিন ফুটের মত। সিঁড়ির এই শেষ ধাপটিতে এতটা ফাঁক রাখার একটি কারণ ছিল। মড্যুলের যে চারটে পা, তার নিচে এক ধরনের নরম ফোম বা স্পঞ্জের মত জিনিস দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল আঘাত-সহ চারটে প্যাড। এগুলি এমন ভাবে তৈরি করা হয় যাতে জোরে আঘাতের ফলে এদের ক্ষতি হলেও মূল ভেলাটির তেমন কোন ক্ষতির আশঙ্কা ছিল না। আঘাতে ওগুলি ভেঙ্গে গেলে ভেলাটি সেক্ষেত্রে আরও নিচু হয়ে মাটির দিকে নেমে থাকত। তাহলে সিঁড়ির শেষ ধাপের দূরত্ব তখন আর তিন ফুটের মত হত না।

চাঁদের বুকে শেষ পর্যন্ত অবতরণ করলেন আরমস্ট্রং। পৃথিবীর

প্রথম মানুষ এই প্রথম মহাকাশের আর এক জগতের অধিবাসী হয়ে গেলেন।

মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধতা। চাঁদের জগতে পৃথিবীর মত কোন বাতাস নেই। অতএব সেখানে চীৎকার করে ডাকলেও কেউ কারুর কথা শুনতে পায় না। আরমস্ট্রং তাই হেডফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছিলেন অলডরিনের সঙ্গে।

মাটিতে নেমেই প্রথম কাজ নিজেকে সেখানে সহজভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার চেষ্টা। এটাও তেমন সহজ কিছু নয়। প্রথমতঃ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ। এত কম মাধ্যাকর্ষণের ম'ধ্য মানুষের অনভ্যস্থ দেহের পক্ষে শ্বাস চালান, হাত পা নাড়া এবং হেঁটে বেড়ান খুবই শ্রমসাপেক্ষ। চাঁদে হেঁটে বেড়ানর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক মহাকাশ বিজ্ঞানী মন্তব্য করেছেন: চাঁদের বুকে হেঁটে বেড়ানর অভিজ্ঞতা যদি পেতে চান, সাঁতারের মুখোশ পরে পিঠের ওপর অক্সিজেনের ট্যাঙ্ক নিয়ে কোন বড় পুকুর বা হ্রদের নিচে ডুব দিন। দেখবেন অল্পক্ষণের মধ্যে হাত পা গুলো কেমন অবাধ্য হয়ে উঠল। ডান পা খানা যেন বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে। হাত দুটি নামানর চেষ্টা করলেও তারা আবার ভেসে উঠতে চাইছে। পরিস্কার বুঝতে পারছেন, জলের নিচেকার মাটি পায়ে ঠেকল। এবার হাঁটার চেষ্টা করুন। না। অত সহজে এটা করা সম্ভব হবে না। কারণ মাটিতে শক্ত করে পা রাখার চেষ্টা করলেও দেহটি দুলে উঠছে। যেন সে ভেসে থাকতে চায়। অথবা পড়ে যেতে চায় মাটির বুকে।

কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে খুব একটা কসরতের প্রয়োজন হল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আরমস্ট্রং বুঝতে পারলেন চাঁদের বুকে তাঁর অনিচ্ছাকৃত ডিগবাজি খাবার কোন আশঙ্কা নেই। শরীরটাকে কিছুটা হাল্কা হাল্কা মনে হলেও হেঁটে বেড়ান খুব শক্ত

হবে না। মুখের ওপর আঁটা স্বচ্ছ মুখোশটার মধ্যে দিয়ে চারপাশটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে চাঁদের আকাশে সূর্যটা যেন একটা বিরাট আগুনের গোলার মত বেশ জোরেই এগিয়ে যাচ্ছে। আরমস্ট্রংএর পক্ষে বলা কঠিন সেই সূর্যকে দেখে সময়টা কত বুঝে নেওয়া। তবে বেলা বাড়ছে। সেই সঙ্গে চারপাশের পাথর আর শুকনো ধুলোও তেতে উঠছে ভীষণ ভাবে। চক চক করছে চোখ ধাঁধান প্রতিফলন।

তবে তার জন্যে চিন্তার কোন কারণ অবশ্য নেই। যে মহাকাশ পোশাক পরে চাঁদে অবতরণ করেছেন তার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠার কারণ নেই। এর আগে জেমিনি প্রকল্পের সময় যখন হোয়াইট মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে এসে শূন্যের মধ্যে ভেসে বেড়ান তখন তাঁকেও কতকটা একই ধরনের পোশাক পরতে হয়েছিল। তখনই এর পুরোপুরি কার্যকারিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা নিঃসংশয় হতে পেরেছিলেন।

তবু অত্যন্ত জটিল এবং অদ্ভুত এই পোশাকের পরিকল্পনা করতে এবং তার উপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরিক্ষা চালাতে শত শত বিজ্ঞানীকে বছরের পর বছর রীতিমত হিমশিম খেতে হয়েছে। মহাকাশ সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাঁরা যত কিছু তথ্য-ভিত্তিক সংবাদ জানতে পেরেছিলেন, প্রথম দিকে সংশয়ের সেটাই মূল কারণ ছিল। পৃথিবীর বায়ুস্তর ফুঁড়ে মানুষ যখন চাঁদ বা সুদূরবর্তী কোন অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হবে অনেক কিছুই ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা করেছিলেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। সেখানে হয়ত বাতাস নেই। থাকলেও তার পরিমাণ নগণ্য এবং পৃথিবীর প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যতটা অক্সিজেনের দরকার ততটা নেই। অতএব মহাকাশ যাত্রীর সঙ্গেই বয়ে নিয়ে যেতে হবে অক্সিজেন। আর সেই অক্সিজেন থাকবে তার পোশাকেরই কোন অংশে।

এর পর আছে বায়ুচাপের প্রশ্ন। পৃথিবীতে মানুষের দেহের প্রতি বর্গইঞ্চি স্থান জুড়ে সাড়ে সাত সের ওজনের মত যে চাপ পড়ছে সেই চাপ তার দেহের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। অথচ এমন ধরনের চাপ চাঁদের বুকে নেই। তাই সেই পোশাকটির মধ্যেই বায়বীয় পদার্থ পুরে নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে যাতে দেহের উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে পৃথিবীর অনুরূপ চাপ সৃষ্টি করা যায় তার কথাটাও ভাবা দরকার। এ কাজটিও সারলেন বিজ্ঞানীরা। বলা চলে সাফল্যের সঙ্গেই সারলেন।

কিন্তু সব চাইতে বড় প্রশ্ন তখনও থেকে গেল। দুটি মোক্ষম প্রশ্ন। যা বিশেষজ্ঞদের রীতিমত চিন্তিত করে তুলেছিল। এক, মহাকাশে যে উল্কাপিণ্ড ছুটে বেড়াচ্ছে তার থেকে রেহাই পাবার কি হবে? এই সমস্ত উল্কার গতিবেগ প্রচণ্ড। সেই প্রচণ্ড গতির একটি পাথরের চাঁই যদি মহাকাশচারীর গা'টা একটু স্পর্শ করে যায় তাহলেই তো যথেষ্ট। মুহূর্তে সমস্ত কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আশার কথা বড় বড় উল্কাপিণ্ডের আঘাতটার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানর খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করলেন না। কারণ, মহাকাশে বৃহৎ-আকারের উল্কাপিণ্ডের যাতায়াতের পথটি মোটামুটি ভাবে বিশেষজ্ঞদের জানা আছে। অতএব সেই পথটি এড়িয়ে চললেই হল।

কিন্তু মাইক্রো মেটিওরাইটস? সোজা বাংলায় যাকে আমরা বলতে পারি উল্কা-চূর্ণ, তার থেকে রক্ষা পাওয়ার কি হবে। আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও মহাকাশে বর্ষার বড় বড় ফোঁটার মত এরা ঝরে পড়ছে যত্র তত্র। এদেরও গতিবেগ বড় কম নয়। বিশেষ করে ১৯৬০-৬২ সালে কতকগুলি মহাকাশ যানের প্লাষ্টিকের প্রতিফলকের ওপর আঘাত করে তাদের রীতিমত ফুটো করে দিয়েছিল এই উল্কা-চূর্ণগুলি। এমন কি একসপ্লোরার বেলুনেও প্রচুর উল্কা-চূর্ণের

আঘাতের চিহ্ন ধরা পড়ে। পোশাক তৈরির ব্যাপারে একথাটাও ভাবতে হয়েছে পরিকল্পনাকারীদের। তাছাড়া আরও দেখতে হয়েছে, পোশাকটি এমনভাবে যাতে তৈরি হয় যাতে করে মহাজাগতিক রশ্মি বা অন্যান্য ক্ষতিকর রশ্মি সেই পোশাক ভেদ করে মানুষের দেহের কোন ক্ষতি না করতে পারে।

একথাও ঠিক, মানুষকে মিশরের মমীর মত আঁটোসাঁটো আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়ে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে না। পোশাকের আবরণ শুধু দেহের আচ্ছাদন নয়; সেই পোশাক যদি তার দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যকে ব্যহত করে তাহলে তা মূল্যহীন। বিশেষ করে চাঁদে গিয়ে যাঁরা নামবেন তাঁরা একটি রবট বা নিশ্চল পুতুলের মত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। চলাফেরা তো করতেই হবে। তার সঙ্গে করতে হবে খুঁটিনাটি কতকগুলি প্রযুক্তিগত কাজ। অর্থাৎ নভচরের স্বাচ্ছন্দ্যকে কোন ক্রমেই ব্যহত করা চলবে না।

প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তৈরি হয়ে গেল অ্যাপলো নভচরদের পোশাক। দু রকমের। কম্যাণ্ড মড্যুল পাইলট কাজ করবেন মহাকাশযানের স-চাপ কক্ষের মধ্যে। তাঁর পোশাকটি হল এক রকমের। আর চন্দ্রাভিযানের নেতা এবং চাঁদের ভেলার চালকের জন্যে তৈরি হল একটু ভিন্ন ধরনের পোশাক। ভেলার বাইরে এসে কাজ করার সময় উল্কা-চূর্ণ যাতে তাদের ক্ষতি করতে না পারে, ক্ষতিকর রশ্মি যাতে দৈহিক সুস্থতায় না ব্যাঘাত ঘটায় তার ওপর দৃষ্টি রেখেই পরিকল্পনাকারীরা এই পোশাক তৈরি করলেন। সেই সঙ্গে অভিযাত্রীরা এই পোশাক পরে যাতে সহজে কাজকর্ম চালাতে পারেন সেটাও তাঁদের দৃষ্টিতে এড়িয়ে গেল না।

বিশেষ ধরনের পাতলা কাপড়কে পরপর জুড়ে মূল আবরণটি তৈরি করা হল। এর ভেতরে রইল নিওপ্রেন নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগের প্রলেপ লাগান নাইলনের তৈরি চাপসহ আস্তরণ।

সেই সঙ্গে নাইলনের আবরণী, যাতে দেহের চলাচলের সময় পোশাকটি ছিঁড়ে না যায়। কম্যাণ্ড মড্যালে কাজ করার পোশাকের ভেতরকার আস্তরণ তৈরি করা হল নোমেক্স নামে এক ধরনের রাসায়নিক সুতোর কাপড়ে। এবং নোমেক্সের পর জুড়ে দেওয়া হল দু প্রস্থ টেফলনের প্রলেপ মাখান বিটা-কাপড়। আর চাঁদে চলাফেরার ব্যাপারে আরমস্ট্রং এবং কলিনসের জন্যে যে পোশাক তৈরি করা হয় সেটা চাঁদের বুকের তাপমাত্রাকে ব্যহত করে তাঁদের শরীরের উত্তাপ যথাযথ যাতে বজায় রাখতে পারে তার ওপর বিশেষ দৃষ্টি রেখেই করা হয়। সেই সঙ্গে উল্কা-চূর্ণের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতাও। এতে ছিল দু প্রস্থ নিওপ্রেন নামে এক ধরনের রাসায়নিক যৌগের প্রলেপ মাখান নাইলন। তার ওপর রইল সাতপ্রস্থ আর এক ধরনের কাপড় এবং সব শেষের আস্তরণে এক প্রস্থ টেফলনের প্রলেপ মাখান কৃত্রিম উপায়ে তৈরি বিটা সূতোর কাপড়।

চাঁদের বুকে ঘুরে বেড়ানর পোশাকটির সঙ্গে লাগান ছিল তরল পদার্থের সাহায্যে ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা। এর জন্যে নাইলন দিয়ে জালির মত যে জামাটি তৈরি করা হয় তার মধ্যে অসংখ্য প্লাস্টিকের নল বসান হয়। এই নলের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা জলের নিয়মিত প্রবাহ চালিয়ে মহাকাশ পোশাকটিতে স্বাভাবিক তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ঠাণ্ডা অক্সিজেনকেও অংশত এই কাজে লাগান হয়েছিল।

এ ছাড়াও পোশাকের বিভিন্ন জায়গায় ঝোলান হয় বার্তা বিনিময়ের বিভিন্ন যন্ত্র, শরীরকে ঠিকমত চালনা করার যন্ত্র, অক্সিজেন কক্ষ এবং আরও টুকি-টাকি ব্যবস্থাপক। আর অতিরিক্ত [illegible]প এরা যাতে অকেজো হয়ে না পড়ে তার জন্যে সমস্ত কিছুতেই তা[illegible]য়ন্ত্রক ব্যবস্থাও লাগান হয়। ফলে পোশাকটির ওজন গিয়ে দাঁড়া[illegible]য় সাড়ে পঁয়ত্রিশ পাউণ্ড। আর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিদের

ধরলে মোট ওজন দাঁড়াল একশ তিরাশি পাউণ্ড।

সব চাইতে লক্ষ্যণীয়, বিশেষজ্ঞরা নভচরদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে দূষিত অক্সিজেনকে বিশোধন করার কথাটাও ভুললেন না। শ্বাস কার্যের ফলে নির্গত বাতাসকে লিথিয়াম হাইড্রোকসাইডের মধ্যে প্রবাহিত করে তার মধ্যেকার কার্বন ডাই-অক্সাইড বা অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অংশকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয়।

এরপর আছে দেখার সমস্যা। চাঁদের বুকে বায়ুমুক্ত পরিবেশে সূর্যের আলো অনেক বেশি উজ্জ্বল। বিশেষ করে চকচকে পাথরের ওপর সেই আলো যখন ঠিকরে পড়ে তখন সে ঔজ্জ্বল্য যেন আরও শতগুণ বেড়ে যায়। এ ছাড়া উত্তাপের বিকিরণ, যার আর এক নাম অবলোহিত রশ্মি, সেটাও চোখের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাই বিশেষ ধরনের শিরোস্ত্রাণের মধ্যে যথাযথ চাপ বজায় রেখে মুখের সম্মুখ ভাগটায় পলিকার্বনেটের কাচের ঢাকনা লাগান হল। আর চোখের সামনে চশমার মত দুটি অংশে বিশেষ ধরনের রাসায়নিক প্রলেপ মাখিয়ে অতিরিক্ত উত্তাপ বা আলোর তীব্রতা থেকে চোখকে বাঁচানর ব্যবস্থাও।

বিশেষ ধরনের দস্তানার ওপর ক্রোমেল-আর এর সুতো এবং তাপপ্রতিহতকারী আস্তরণ লাগিয়ে অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা কোন কিছুকে যাতে সহজেই নভচররা নাড়াচাড়া করতে পারেন সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। সেই সঙ্গে সাঁড়াশি, পাথর কুচি করার ছোট্ট হাতুড়িও।

অর্থাৎ চাঁদের বুকে পদচারণা করার সময় যাতে কোন রকমের বিপদের মুখে আরমস্ট্রং এবং অলডরিন না পড়েন তার সমস্ত খুঁটিনাটির দিকে বিশেষজ্ঞরা নজর রেখেছিলেন।

এক নাগাড়ে কথা বলে চলেছেন আরমস্ট্রং। পৃথিবীর কোটি

কোটি মানুষ টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর কণ্ঠস্বর শুনছে। সেই সঙ্গে দেখে চলেছে তাঁর গতিবিধি। আরমস্ট্রং এগিয়ে গেলেন চাঁদের ভেলার দিকে। সেখান থেকে প্লাস্টিকে ঢাকা মোড়ক খুলে ফেললেন তিনি। সেখান থেকে বের করে নিলেন চামচের মত মাটি খোঁড়ার যন্ত্র, ছোট বাক্স এবং কয়েকটি প্লাস্টিকের থলে। তারপর চাঁদের ভূমি থেকে ধুলো এবং ছোট ছোট পাথর ভরতে সুরু করলেন থলের মধ্যে। একটি করে থলে বোঝাই করার পর তাঁর পোশাকের সঙ্গে লাগান পকেটের মধ্যে সেটিকে তুলে রাখলেন। এ কাজটি সারার পর চারপাশের ছবি তুলতে লাগলেন তিনি। চাঁদের ভেলাটিরও ছবি তুললেন কাছ থেকে। আর যতক্ষণ এই কাজগুলি করছিলেন, সমানে বলে চলেছেন তার ধারাবিবরণী পৃথিবীর শ্রোতাদের উদ্দেশে।

প্রায় আধঘন্টা পর ভেলা থেকে নেমে এলেন অলডরিন। সঙ্গে কিছু সাজ-সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি। নামার পর একটি ছোট্ট তেপায়া এবং একটি টেলিভিশন ক্যামেরা নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেলেন প্রায় সত্তর ফুট দূরে। তেপায়াটি সেখানে স্থাপন করে তার উপর রাখলেন টেলিভিশন ক্যামেরা। ক্যামেরাটি মুখ ঘুরিয়ে তাঁদের কাজ কর্মের ছবি তুলতে লাগল। এরপর ভেলা থেকে তিনি নিয়ে এলেন একটি সৌর বিকিরণ পরিমাপক যন্ত্র। এটা একটি পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের চাদর। সৌর বিকিরণের সঙ্গে যে কণিকা বর্ষিত হয় তাদের সংগ্রহ করার জন্যে পর্দাটিকে কিছু দূরে মেলে রাখলেন।

হাতুড়ী, ছোট খন্তা এবং সাঁড়াশির সাহায্যে ওঁরা দুজন চাঁদের বুক থেকে পাথর, ভূত্বকের স্তর খুঁড়ে রাখলেন বিশেষ এক ধরনের বায়ুশূন্য বাক্সের মধ্যে। এরই ফাঁকে এক সময়ে পুঁতে ফেললেন চাঁদের ভূ-কম্পন পরিমাপক যন্ত্র। যন্ত্রটির সঙ্গে জোড়া রয়েছে সৌর তড়িৎ-কোষ যা ওঁরা ফিরে আসার পর এক বছর পর্যন্ত সমানে বিদ্যুৎ

শক্তি সরবরাহ করে যন্ত্রটিকে পৃথিবীতে নিয়মিত তথ্য পাঠাতে সাহায্য করতে পারে। আর রাখলেন একটি লেজার-দর্পণ। ঠিক হয়, পৃথিবী থেকে লেজার রশ্মি পাঠাবেন বিজ্ঞানীরা। সেই রশ্মি এই দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে যাবে, এবং তার সাহায্যে মাপা হবে চাঁদের নিখুঁত দূরত্ব।

কাজ সেরে অলডরিন চাঁদের ভেলার চারপাশটা ঘুরে ছবি তুলে নিলেন। এই অবসরে আরমস্ট্রং এক বাক্স নুড়ি, মাটি প্রভৃতি বোঝাই করলেন। যে সমস্ত নমুনা পাথর তাঁর কাছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছিল তাদের ভরে নিলে ছোট ছোট প্লাস্টিকের থলেয়। এর জন্যে তিনি পনেরটি থলে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

অতিক্রান্ত হল প্রায় দু ঘণ্টা। মোটামুটি যে উদ্দেশে তাঁরা চাঁদের দেশে এসেছিলেন সেগুলি সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করলেন দুই নভচর। পিঠের ওপর অক্সিজেনের পাত্র তখন তেমন খালি হয়ে যায় নি। তবু আর বেশিক্ষণ সেখানে থাকার ঝক্কিটা তাঁরা নিতে চান না। কলামবিয়া থেকে কলিনস জানালেন, আর কেন? আপাততঃ এই পর্যন্তই থাক না।

অতএব ঘরে ফেরার পালা। সূর্য রশ্মির কণিকা মাপার ধাতব চাদরটি গুটিয়ে তুলে আনলেন অলডরিন। তারপর উঠে গেলেন সাত ফুট উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে। সিঁড়ির নিচে থেকে পাথর মাটির বোঝা তুলে ধরলেন আরমস্ট্রং। কপিকলের সাহায্যে সেগুলি তুলে নিলেন অলডরিন। অনাবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম সেখানেই পড়ে রইল।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাইরে থাকার পর আরমস্ট্রংও উঠে এলেন চাঁদের ভেলায়। দরজা বন্ধ করলেন। কাঁধের এবং পিঠের বোঝা জড়ো করে রাখলেন এক পাশে। ক্যাবিনের মধ্যে বাতাস ভরে স্বাভাবিক চাপ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম। আসলে যেন মূল জাহাজ কলামবিয়ার জন্যে প্রতীক্ষা।

সেকেণ্ড, মিনিট, আরও কয়েক ঘণ্টা। ক্যাবিনের মধ্যে জ্বলে উঠল আলোর সংকেত। কলামবিয়া এগিয়ে আসছে। এগিয়ে আসছেন কলিনস সতীর্থদের ফিরিয়ে নেবার উদ্দেশে। এবার তাঁরা নিশ্চিন্ত।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চাঁদের ভেলার নিচের অংশটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। জ্বলে উঠল ওপরের অংশের নিচে লাগান জেট ইঞ্জিন। নিচের অংশটিকে উৎক্ষেপ মঞ্চের মত ব্যবহার করে তার উপর ধাক্কা মেরে তুজন নভচরকে নিয়ে উপরে উঠে গেল চাঁদের ভেলা। ঢালু পথে সত্তর মাইল উর্দ্ধাকাশের দিকে এক নির্দ্দিষ্ট বৃত্তীয় কক্ষপথে তাঁরা উড়ে চললেন এমন ভাবে যে, যে-মুহূর্তে তাঁদের ভেলা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবে ঠিক সেই মুহূর্তেই কলিনস কলামবিয়াকে নিয়ে এসে পড়বেন তাঁদের কাছে।

না। অব্যর্থ তাঁদের গণনা। অব্যর্থ হিউসটনের মিশন কনট্রোল সেণ্টারের নির্দেশ বার্তা। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি মিলিয়ে যথাসময়ে কলামবিয়ার সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল চাঁদের ভেলা ঈগল। ভিড়ল কলামবিয়ার শঙ্কুর মত ডগার সামনে এসে।

সাফল্যের আনন্দে চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কলিনস, অলডরিন এবং আরমস্ট্রং এর। ঈগলকে সঙ্গে করে কলামবিয়া তখনও চাঁদের কক্ষপথে পরিক্রমণ করে চলেছে। এক সময়ে তাঁরা চলে গেলেন চাঁদের বিপরীত দিকে। দীর্ঘ ত্রিশ মিনিটের জন্যে পৃথিবীর বেতার সংকেত আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এই অবসরে চাঁদ থেকে নিয়ে আসা ধূলো-মাটির বোঝাগুলি নভচররা ঈগল থেকে পার করে রেখে দিলেন কলামবিয়ার মধ্যে। তারপর নিজেরাও তার মধ্যে প্রবেশ করে ঈগলটিকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে দিলেন। ভিন্ন একটি কক্ষপথে সরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি চোখের বাইরে চলে গেল।

যথাসময়ে চালু করা হল সারভিস মড্যুলের জেট ইঞ্জিন, সঙ্গে সঙ্গে একটি ঝাঁকুনি দিয়ে গতিবেগ বেড়ে গেল আপলো-১১র। চাঁদের কক্ষপথে ঘোরার সময় তার গতি ছিল ঘণ্টায় তিন হাজার ছ শ মাইল। মাত্র তু শ সেকেণ্ডের মধ্যে সেই গতিবেগ বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল পাঁচ হাজার পাঁচ শ মাইলে। এটাই হল চাঁদের দেশের মাধ্যাকর্ষণকে বিচ্ছিন্ন করে বাইরে বেরিয়ে আসার মুক্তি-বেগ। মুক্তি-বেগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলামবিয়া মুখ ঘুরিয়ে নিল পৃথিবীর কক্ষপথের দিকে। জয়স্তু! হে চাঁদ, বিদায়! চাঁদকে পিছনে ফেলে পৃথিবীর তিন অভিযাত্রীর মনে তখন ঘরে ফেরার স্বপ্ন। ছ'টা দিন যে কি ভাবে কেটে গেল যেন বুঝতেই পারেন না তাঁরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। অবশেষে গতিবেগ গিয়ে দাঁড়াল ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইলের মত। অতিক্রান্ত হল আরও তু দিন। তারপর ওঁরা যখন পৃথিবীর আবহাওয়া মণ্ডলেব কাছে এসে পেঁাছলেন তখন কলামবিয়ার পেছন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল চোঙের মত সেই সার্ভিস মড্যুলকেও। সেটা মুহূর্তের মধ্যে চলে গেল মহাকাশের ভিন্ন পথে। আর তার পরক্ষণেই কম্যাণ্ড মড্যুল, যার আর এক নাম কলামবিয়া, বায়ুস্তরের সঙ্গে একটি বিশেষ কোণ সৃষ্টি করে প্রবেশ করল অবতরণ ক্ষেত্রের লক্ষ্য পথে। বাতাসের সঙ্গে ঘর্ষণে তার সম্মুখের ডগার তাপমাত্রা উঠে গেল প্রায় পাঁচ হাজার ডিগ্রি ফার্নহাইটে। ডগাটি বিশেষ এক ধরনের তাপ-সহ চাদরে মোড়া থাকায় এই প্রচণ্ড উত্তাপ অবশ্য নভচরদের কোন ক্ষতি করতে পারল না।

যখন তাঁরা প্রায় চব্বিশ হাজার ফুট ঊর্দ্ধাকাশে তখন আপনা থেকেই খুলে গেল বিরাট তুটি প্যারাস্যুট। প্যারাস্যুটের প্রবল টানে গতিবেগ সেই সঙ্গে তাঁদেরও অনেক কমে গেল। দশ হাজার ফুট উঁচুতে এসে এই প্যারাস্যুট তুটি খুলে পড়ে গেল।

তাদের বদলে বের হয়ে এল এবার আরও তিনটি প্যারাস্যুট। এবার গতিবেগ কমছে। দ্রুত, আরও দ্রুত কমছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘণ্টায় একশ পঁচাত্তর মাইল থেকে কমে গিয়ে দাঁড়াল বাইশ মাইলে।

জুলাই ২৪, ১৯৬৯। চন্দ্র-বিজয়ীরা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে অবতরণ করলেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে কয়েক মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে।

আরমস্ট্রং, অলডরিন এবং কলিনস! শতাব্দীর ইতিহাসে এঁরা এখন শিরোনাম।

আজ থেকে উনত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্বখ্যাত কল্পকাহিনীকার অর্থার সি. ক্লার্কের দিনলিপি। ক্লার্ক সেদিন লিখেছিলেন: ১৯৮০ র মধ্যে মানুষ অন্য গ্রহে অবতরণ করবে এবং ২০০০ খৃস্টাব্দের আগেই সেখানে আমরা উপনিবেশ স্থাপন করতে পারব। কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি হবে ২০৬০-এর মধ্যে। অমরত্ব লাভ ২০৯০। আর চাঁদে অবতরণ? উত্তর: ১৯৬৯-তেই সম্ভাবনাটা বেশি। অদ্ভুত এই ভবিষ্যৎবাণী। কে জানে, হয়ত বাকিগুলিও এমনি করে ফলে যাবে।

অপ্রত্যয়, অবিশ্বাস এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়েই বিজ্ঞানের যে কোন যুগান্তকারী সন্ধানের সূচনা। বিজ্ঞান কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না, দেয় জীবনকে অনুভব করার নিত্য নতুন নির্দেশ। আজকের এই সাফল্যের মধ্যেও হয়ত এই সত্যই একদিন বিশ্ববাসীর মনে প্রতিফলিত হয়ে উঠবে। অষ্টাদশের বিজ্ঞান সারা ইউরোপীয় চিন্তাধারায় একটা নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফল তার খারাপ হয় নি। আজকের মহাকাশযাত্রার এই সাফল্যও কি তেমন কোন প্রতিশ্রুতি বহন করবে?